অন্তর্বর্ত্তি বিষয় গুলিকে এক একটি অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা যায়। সমস্ত গ্রন্থে এরূপ দশটি ভণিতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু শেষ ভণিতাস্থলে "ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ" লিখা আছে *।

অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে সর্ব্বত্র একভাবে যেমন স্বীয় গুরু অথবা ভজনীয় দেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক ভণিতাগুলি লিখিত হইয়াছে, সীতাচরিত্রে সেরূপ একনিষ্ঠ ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কখন অদ্বৈতের নাম, কখন চৈতন্যপ্রভুর, কখন বা সীতাদেবীর নাম স্মরণ করা হইয়াছে। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামস্মরণের কারণ ইহাই বোধ হয় যে, লোকনাথ শ্রীনন্দাপ্রভু ও অদ্বৈত, এই উভয় গুরুর নাম গ্রহণই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ও নিতাই অভিন্ন বলিয়া উক্ত, † তাই নিত্যানন্দের নাম গ্রহণও উচিত বিবেচিত হইয়া থাকিবে ‡। এ স্থলে কএকটি ভণিতা উদ্ধৃত হইল—

১ম ভণিতা— "কহে লোকনাথ দাস,
অদ্বৈত চরণে আশ,
সীতার চরিত্র রসধ্বনি।"

২য় ভণিতা— "অদ্বৈত চৈতন্য পাদপদ্মে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥"

৩য় ভণিতা— "কহে লোকনাথ দাস, শ্রীচৈতন্যপদে আশ,
কৃপা করি দেহ ব্রজবাস॥"

৩য় ভণিতা হইতে আমরা তাঁহার ব্রজবাসে আশক্তির পরিচয় পাইতেছি। "দেহ ব্রজবাস" হইতে আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিয়ত ব্রজবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকেও এইরূপই প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ব্রজবাস হইতে যেন বিচ্যুত না হন, ইহাতে এই ভাবই বোধ হইয়া থাকে।

বলিয়াছি, লোকনাথের রচনাপ্রণালী সরল ও অপেক্ষাকৃত দোষবিবর্জ্জিত। সীতাচরিত্র হইতে যে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দুই পাঁচটি অপ্রচলিত শব্দ যে ইহাতে মিলিবে না, ইহার কোন কারণ নাই। হইতে পারে তখনকার কালে ঐ সকলই পরিশুদ্ধ শব্দ ছিল। দুই চারিটা উদাহরণ দেওয়া অনুচিত হইবে না। যথা—

"না ভাণ্ড"—প্রতারণা করিও না। "চাহিল"—চাহিল।
"নাম্বিল"—নামিল। "খেদাড়িয়া"—তাড়াইয়া।

---

* হইতে পারে আমরা যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ। এই সন্দেহে, বিশেষ অনুসন্ধানে, সীতাচরিত্রে এই দশটি ভণিতার অধিক নাই, ইহা জ্ঞাত হইয়াছি।

† "অভিন্ন চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ।"—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

‡ পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা দ্রষ্টব্য।

"বিস্তর" = অনেক। "বাজ্‌জন্য" = বাঙ্গালা।

"যৈছে" = যেমন। "তৈন" = তৈল।

"ধাউতের" (অর্থ বোধ হইল না।) ইত্যাদি।

মুসলমানী দুই চারিটি শব্দের সমাবেশও ইহাতে আছে; যথা—

"মোকাম।" "সুবা।"

"লস্কর।" "জাহির।" "তাকিত" ইত্যাদি।

সীতাচরিত্রে কোন কোন স্থানে পয়ারের চতুর্দ্দশাক্ষরী রীতি রক্ষিত হয় নাই।

(ক) "আচার্য্য বলেন তোমরা আইলে কোথা হৈতে।"

(খ) "নইতে আইলাম তাঁর পাদপদ্মের ছায়া।"

(গ) "পুমলিদের শিষ্ট মোরা কোন কালে নহি।"

(ঘ) "আমাদের মূল পত্তিজাত নাহি আর।" ইত্যাদি।

এ স্থলে দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োগ না করিয়া, লোকনাথের সুস্পষ্ট রচনা হইতে গৃহীত কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল;—

"হরি হরি কি হইল মরমের কায।

ছাড়ি মহীমণ্ডল, গোরাঙ্গ সে কোথা গেল,

আচার্য্যের মাথে দৈল বাজ॥

নীলাচলে ছিল গৌর, ভরসা আছিল মোর,

অনায়াসে হৈত দরশন।

কি বুঝিয়া কিবা হৈল, কেনে পত্র পাঠাইল,

যৈছে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন॥

মনে ছিল বড় সাধ, যদি প্রভুর শ্রীপাদ,

নীলাচলে ছাড়িব জীবন।

ইহাতে বিপাক হৈল, আগে লীলা সম্বরিল,

এই সব বিধির ঘটন॥

অদ্বৈত ঘরণী কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,

ছাড়ি গেলা গৌরগুণমণি।

আর না দেখিব গৌর, শ্রীমুখাম্বুজ সুন্দর,

না শুনিব ও মুখের বাণী॥

নটবর বেশ ধরি, নাচিবেন গৌরহরি,

নয়নেতে না হেরিব আর।

আমি সীতা অভাগিনী, ছাড়ি গেল গোরমণি,

অবনী হইল অন্ধকার॥

মুড়ে এলাইয়া কেশ, হইলেন যোগী বেশ,
দু নয়নে বহে সুরধুনী।
সোণার বরণ তনু, ভূতলে হইল রেণু,
মূরছিতে লোটায় অবনী॥
সীতা বলে নবদ্বীপে, শচী আছে কোন্‌রূপে,
হেন বুঝি ছাড়িল জীবন।
কৃষ্ণ মধুপুরে গেল, ব্রজপুর শূন্য হৈল,
তৈছে ভেল নদীয়া ভুবন॥
মুরারি চৈতন্যদাস, করে লঞা তনুবাস,
মুছাইছে শ্রীমুখ সুন্দরে।
কহে লোকনাথ দাস, সীতার চরণে আশ,
মিলিবে চৈতন্য ব্রজপুরে॥" সীতাচরিত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান-কাহিনী সীতাচরিত্রে আছে। সেই বিবরণ শ্রবণে অদ্বৈত ও সীতার বিলাপের পদটি উদ্ধৃত হইল। চৈতন্যমহাপ্রভুর জননী শচীদেবীর তিরোধান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে স্পষ্ট কিছু লিখিত নাই,* কিন্তু উদ্ধৃত পদে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি সেই নিদারুণ সংবাদও শুনিবার জন্য জীবিতা ছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবের প্রসঙ্গও ইহাতে আছে। অতএব সীতাচরিত্র ইহারও পরে রচিত হয়।

লোকনাথ বৃন্দাবন হইতে এদেশে আসিয়া আর বাস করেন নাই, কিন্তু সীতাচরিত্রে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী, সুতরাং সে সমুদায়ই গ্রন্থকার অপরের নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া থাকিবেন; গ্রন্থখানি বৃন্দাবনেই রচিত হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থকার অনেক ঘটনা স্বয়ং না লিখিয়া কবি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উপর বরাত দিয়াছেন;—

"চৈতন্য ভাগবতে আছয়ে বর্ণন।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন॥" সীতাচরিত্র।

সম্মান গৌরবে ও কুলমর্য্যাদায় কৃষ্ণদাসের গুরুস্থানীয় হইলেও উদারহৃদয়, বিনীত স্বভাব লোকনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপরও কোন কোন বিষয়ের বরাত আছে;—

"ইহার বিশেষ যত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিল প্রচুর॥" সীতাচরিত্র।

* অদ্বৈতের পত্র-প্রেরণের পূর্ব্বে জগদানন্দের নবদ্বীপ আগমন প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের অল্পপূর্ব্ব পর্য্যন্ত শচীর বিদ্যমানতার কথা চরিতামৃতের লিখার ভাবে বোধ হয়।

সীতাচরিত্র যে অনেক পরে বিরচিত হয়, এমন কি, চৈতন্যচরিতামৃতেরও * পরে রচিত, এই কথায় তাহা জানা যাইতেছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

১ম অধ্যায়—সীতা ও তাঁহার পঞ্চপুত্রের বিবরণ।

২য় অধ্যায়—গৌরাঙ্গের জন্ম ও সীতার নবদ্বীপগমন প্রসঙ্গ।

৩য় অধ্যায়—গৌরাঙ্গের শান্তিপুরে গমন; সীতার স্নেহ ও ভক্তি বিবরণ।

৪র্থ অধ্যায়—গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা, তাঁহার অন্তর্দ্ধান বার্ত্তা, শান্তিপুরে শোকতরঙ্গ; নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বরের আখ্যান।

৫ম অধ্যায়—ঐ (নন্দরাম, যজ্ঞেশ্বরের কথা।)

৬ষ্ঠ অধ্যায়—সীতার শিষ্যদ্বয়ের কথা; নীতিশিক্ষা; সীতার অদ্ভুত চরিত; শিষ্যদ্বয়ের স্ত্রীভাব ও স্ত্রীবেশ-ধারণ।

৭ম অধ্যায়—শ্রীচৈতন্য ভৃত্য ঈশানদাসের বিস্তারিত বিবরণ।

৮ম অধ্যায়—বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহত্যাগ; ঈশানদাসের শান্তিপুরে গমন।

৯ম অধ্যায়—জাহ্নবাদেবীর বিস্তারিত কথা।

১০ম অধ্যায়—সীতার দুই অদ্ভুত শিষ্য,—নন্দিনী ও জঙ্গলীর কথা। ইহাদের প্রস্তাব, ইহাদের অদ্ভুত কাণ্ড; পাণ্ডুয়ার প্রতাপশালী ফকিরের আগমন ও পরীক্ষা, পরীক্ষায় নন্দিনী ও জঙ্গলীর জয়লাভ; সীতাদেবীর প্রস্তাব ও মাহাত্ম্য।

এই সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু আছে বলিতে হইবে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

---

* ছাপার চরিতামৃতে গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ ১৫৩৭ শক লিখিত। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থকার অনুমান করেন, ১৫০৪ শকের মধ্যে চরিতামৃত রচিত হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে যে মূলগ্রন্থ আনয়ন করেন, তাহার প্রতিলিপি বিষ্ণুপুরের রাজবাটীতে আছে, লেখক শ্রীনিবাসশিষ্য স্বয়ং ব্যাসাচার্য্য। সে চরিতামৃতের শেষে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়——

"শাকেঽগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

ইহাতে চরিতামৃত ১৫০৩ শকে পূর্ণ হয় জানা যাইতেছে। সীতাচরিত্র ইহার পর রচিত হয়।

ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর।

সম্প্রতি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হস্তলিপি খানির বয়স একশত বৎসরেরও উপরে। উহার কোন কোন স্থান কীটদষ্ট ও গলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সমগ্র অংশ উত্তমরূপে পাঠ করা যায়। লেখকের নাম গোপীমোহন গুহ, নিবাস আটীয়া পরগণার বাসাইল গ্রামে।

ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, উক্ত প্রসিদ্ধ গীতকাব্যের পঞ্চম মঙ্গলের শেষাংশে আরম্ভ হইয়া সপ্তম মঙ্গলের প্রথমাংশে শেষ হইয়াছে। মানসিংহের নিকট বর্দ্ধমানের পরিচয় প্রসঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার উক্ত উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

"দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুমদারে,
হয়েছে প্রসন্ন গোঁসাই তায়।
সেবা হেতু দ্রুত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালি লয়ে,
বর্দ্ধমানে গেলা মজুমদার॥
দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
প্রসঙ্গত শুনিলা সেথানে। *
গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া,
মজুমদারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুমদার, বিশেষ কহেন তার,
সেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল॥"

গ্রন্থ শেষে অষ্টমঙ্গলায় দেবী মজুমদারকে কহিতেছেন—

পঞ্চমে শাপের ছলে, * * * *

* * * * *

এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়,
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে।
মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
জিজ্ঞাসিল বিশেষ তোমায়।
ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিল তোমার মুখে,
আদ্য রস সুন্দর-বিদ্যায়।
পূজি মোর কালীরূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ,
উপনীত হেল বর্দ্ধমান॥

হীরা নাম মালিনীর,　　ঘরে উত্তরিল বীর,
　　শুনিল বিদ্যার রূপগান॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা,　　ভুলে বিদ্যা রাজবালা,
　　দোঁহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি হৈল,　　গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল,
　　বাসর বঞ্চিল অকপটে॥
　　শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্ট মঙ্গলায়,　　অমঙ্গল দূরে যায়,
　　শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
যতেতে সুন্দর কবি,　　বিদ্যা পদ্মিনীর রবি,
　　অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপট সন্ন্যাসী হৈল,　　রাজার সাক্ষাৎ কৈল,
　　নানা মতে বিচার করিল॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী,　　ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি,
　　কোটাল ধরিতে গেল চোর।
নারীবেশে চোর ধরে,　　রাজার সাক্ষাৎ করে,
　　সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোর॥
মশানেতে আসি গিয়া,　　কালীরূপে দেখা দিয়া,
　　বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল,　　মোর অনুগ্রহ হৈল,
　　বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে॥"

মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের এই সকল অংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই এক অংশ। কিন্তু আমরা বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে বিদ্যাসুন্দরকে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। এক সময় পণ্ডিত ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ অন্নদা-মঙ্গলের পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। "অন্নদা-মঙ্গল" রচনার সময় কৌশলক্রমে উক্ত উপাখ্যান উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেন। পণ্ডিতবর অবশ্যই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের এই হস্ত-লিপি পাঠে তাঁহার সেই অনুমান অকাট্য সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে।

আমরা যে হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, ভারতচন্দ্র প্রথমে এই বিদ্যাসুন্দরই রচনা করেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদা-মঙ্গল রচনার সময় রাজার বা সাধারণের আগ্রহবশতঃ প্রথম লিখিত বিদ্যাসুন্দর মাজিয়া ঘষিয়া এবং স্থলবিশেষে

সংক্ষিপ্ত করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের সহিত যোগ করিয়া দেন। উভয় বিদ্যাসুন্দরের ভাষা ও বিষয়াদি বিচার করিলে এ বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। আমাদের অবলম্বিত হস্তলিখিত "বিদ্যাসুন্দর" প্রথমে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে উহাকে আদি বিদ্যাসুন্দর শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভারতচন্দ্রের এই আদি বিদ্যাসুন্দরে গণেশ ও কালিকার বন্দনা করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রবণের জন্য বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছে। গণেশ-বন্দনাটী ঠিক অন্নদা-মঙ্গলের গণেশ বন্দনার সহিত মেলে। কেবল একটি চরণে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়—

মুদ্রিত অন্নদা-মঙ্গলে—

"আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর,
ইথে পার তবে সে পাইবে॥"

আদি বিদ্যাসুন্দরে—

"আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
নায়কের আশা পূর্ণ কর।
বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর, মোর বিঘ্ন দূর কর,
ইথে পার পাইব সত্বর॥"

গণেশ বন্দনাটী প্রথমে বিদ্যাসুন্দরেই ছিল, অন্নদা-মঙ্গল রচনার সময় কবি উহা অন্নদা-মঙ্গলের প্রারম্ভে স্থাপন করিয়া "নায়কের আশা পূর্ণ কর" স্থলে "অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিব" এই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরে যে কালিকা বন্দনা ছিল, কবি অন্নদা-মঙ্গলে তাহা গ্রহণ করেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে কৌষিকীবন্দনা লিখিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের কালিকা-বন্দনা এইরূপ—

"জয় জয় কালিকা তারা, কল্যাণি কলুষহরা,
করুণা-সাগর-নারায়ণী।
মহাবিদ্যা মহামায়া, মহেশ্বর অর্দ্ধকায়া,
মহেশ্বরী মহিষ-মর্দ্দিনী।
স্তম্ভিত জনের গতি, মহালক্ষ্মী মহামতী,
মুক্তকেশী দৈত্যবিনাশিনী॥
বিজয়া বিমলা বিদ্যা, বিধিবিষ্ণু-বন্দিতা সিদ্ধা,
বিশালাক্ষী বিপদতারিণী।

অময়া অপরাজিতা, অভয়া অসিতা সীতা,
অম্বিকা অসুর বিনাশিনী।
কালী গো করুণা-করা, কলির কলুষহরা,
কহিতে করুণা শক্তি কার।
অতি হীন মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কি বলিব চরিত্র তোমার॥"

পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসুন্দরের সেই কালিকা বন্দনায় ভাষা উত্তরকালে কিরূপে রসালঙ্কারভূষিত কৌষিকী প্রভৃতির বন্দনায় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। হস্ত-লিখিত বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সহিত মুদ্রিত বিদ্যাসুন্দরের ভাষার তুলনা করিলে সর্ব্বত্রই কবির এই ক্রমোন্নতি দেখা যায়। কাব্যকুতূহলী বাঙ্গালীর ইহা দেখিবার ও যত্নে রক্ষা করিবার সামগ্রী বটে।

কালিকা বন্দনার পর এইরূপে বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ হইয়াছে —

"শুন রাজা মহামতি, নবদ্বীপ অধিপতি,
যদি ইচ্ছা করিলা আপনে।
কালীপদ * * সুন্দপদ বিবরণ,
শোন রাজা সুন্দর উপাখ্যানে॥
কালীভক্ত সাধুগণে, প্রস্তাব যে জনে শুনে,
কালী তারে হবেন সদয়।
বিশেষ সুন্দর কথা, * আদিরস গাথা,
বিদ্বানের সন্তোষ বাড়ায়॥
জ্ঞানীজনের জ্ঞানবৃদ্ধি, রসিকের রস বৃদ্ধি,
মূর্খের মূর্খতা নাহি রয়।
কালিকামঙ্গল পোতা, বিচিত্র পয়ার গাঁথা,
শ্রবণে বিনাশে যমভয়॥
সুজন * বন্ধু, মহারাজ গুণসিন্ধু,
বসতি বেহার কাঞ্চীপুর।
কর্ণাট দেশের রাজা, সুত সম পালে প্রজা,
ভুবন-শাসন মহাশূর॥
রসরঙ্গ সুখভোগ, পূজা হোম ক্রিয়াযোগ,
ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি কথা।
উত্তম পাঠক মুখে, শ্রবণ করয়ে সুখে,
ভারতপুরাণ মহা পোতা॥

আদিপর্ব্ব উপাখ্যান, শুনিলেন বিবরণ,
কুরুপাণ্ডবের উৎপত্তি।
মৃগ হেতু অরণ্যেতে, শাপবিদ্ধ হেন বনে,
হৈয়াছিল পাণ্ডু নরপতি॥
* * শৃঙ্গার রসে, মুনি-পত্নী মৃগীবেশে,
তাহাকে মারিলা রাজা বাণ।
শাপ দিলা মুনিবরে, এ মতি ঘটিবে তোরে,
কামিনী সংযোগে যাবে প্রাণ॥
দুঃখ ভাবি পরস্পরে, কাননে প্রবেশ করে,
সঙ্গে লৈয়া কামিনী যুবতী।
সশরীরে স্বর্গ চায়, অপুত্রের হেতু তায়,
নিষেধ করিলা সুরপতি।
শুন রাজা মহাজন, তনয় পরম ধন,
অপুত্রের স্বর্গে নাহি স্থিতি।
অতএব নিজ স্থানে, রহ * পত্নীসনে,
স্বর্গপাবা জন্মিলে সন্ততি।
দেবঋষি বাক্য শুনি, শোকাকুল নৃপমণি,
কহিলেন সব বিবরণ॥
রাজার কাতর ভাবে, * * উপহাসে,
জন্ম হবে ক্ষেত্রজ নন্দন।
তবে রাজা কুন্তীস্থানে, জিজ্ঞাসিল দুঃখমনে,
বল দেখি কি হবে ইহার॥
রাজার আদেশে রাণী, * অর্চ্চিয়া আনি,
জন্মাইল সুত আপনার।
গুণসিন্ধু নরপতি, শুনিয়া আকুল মতি,
অপুত্রের হেতু ভাবে দুঃখ॥
কি মোর সংসার বন্ধ, অপত্য পরম রঙ্গ,
নাহি দিল বিধাতা বিমুখ।
দেখিয়া রাজার শোক, বিষাদিত সব লোক,
পাত্রগণ করয়ে সান্ত্বনা॥
পুরোহিত বলে রাজা, করহ দেবীর পূজা,
পুত্র হবে তোমার কামনা।

কালিকা অখিল মাতা, চতুর্ব্বর্গ ফল-দাত্রী,
সুখ-মোক্ষ-সম্পদ-দায়িনী।
রূপ-গুণ-শীল-যুত, উত্তম পাইবা সুত,
পূজ তুমি ত্রৈলোক্য-তারিণী॥
এত শুনি মহারাজা, আরম্ভে কালীর পূজা,
নানা দ্রব্য করিলা সম্ভার।
মৃণ্ময়ী কালী মূর্ত্তি, নির্ম্মাইলা নরপতি,
হেরিলে ভুবন চমৎকার॥
বিবসনা এলোকেশী,
নরশির গলায় ভূষণ।
নব জলদের ঘটা, জিনিয়া অঙ্গের ছটা,
অট্টহাস করাল বদন॥
কটি তটে নরকর, দেখি অতি ভয়ঙ্কর,
শ্রবণে কুণ্ডল কাটি নর।
রতন কিরীট শিরে, কেবল তিমির হরে,
আরোহণ শিবের উপর॥
আগম তন্ত্রের মতে, নির্ম্মাইলা নরনাথে,
প্রকাশিলা অবনী মণ্ডলে।
কালিকা-মঙ্গল গোতা, বিচিত্র পয়ার গাথা,
কবিতা ভারতচন্দ্রে বলে॥"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহারই ইচ্ছামত কালিকা মাহাত্ম্য বর্ণনোদ্দেশে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনা করেন। কালিকা মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া কবি স্বয়ংই এই গ্রন্থকে কালিকা-মঙ্গল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। গীতিকাব্যে রচনায় ভারতচন্দ্রের ইহাই প্রথম উদ্যম। প্রথম রচনা বলিয়াই ইহাতে অনেক দোষ, অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু যেমন অঙ্কুরেই বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনিই এই প্রথম উদ্যমের রচনাতেও ভারতের পরবর্ত্তী রসাল ভাবার বীণা-ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তরকালে যখন ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নপূর্ণা পূজার কীর্ত্তনের জন্য অন্নদা-মঙ্গল রচনা করেন, তখন সাধারণে আগ্রহবশতঃই হউক বা নিজের অভিপ্রায়েই হউক এই কালিকা-মঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান) কাটিয়া ছাটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া অনেক পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দর পাঠ না করিয়া কেবল অন্নদা-মঙ্গল পাঠ করিলেও একথা যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। কবি

কালিকা-মঙ্গলকে জোর করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেও উহা ভাল মিশ খায় নাই। তৈলে জল মিশ্রণের ন্যায় পৃথক্ই রহিয়াছে। অন্নদামঙ্গলের সকল উপাখ্যানেই অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেই অন্নদা নামের পরিবর্ত্তে কালী নাম রহিয়াছে। কবি স্বয়ং এ ত্রুটি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক সংশোধন করিতে পারেন নাই। তবে কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য দেবীর মুখে একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন—

"মশানেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।"

অন্নদা মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের শেষভাগে দেবী, বিদ্যা ও সুন্দরকে বলিতেছেন,

"তোরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি,
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ভক্ত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস,
নানা মতে আমারে তুষিলা॥"

কে কাহাকে কি জন্য কি শাপ দিল, তাহার কোন কথাই অন্নদা-মঙ্গলে নাই। হরি হোড়, ভবানন্দ ইহারাও শাপেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, অন্নদা-মঙ্গলে আছে, নাই কেবল বিদ্যা ও সুন্দরের শাপের কথা। হঠাৎ প্রস্তাব শেষে শাপের নাম করায় কেমন অসংলগ্ন হইয়াছে। কবি যেন নিতান্ত অনুরোধে ঠেকিয়া বা দায়ে পড়িয়া একটী অঙ্গহীন উপাখ্যান অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছেন। ভবানন্দের মুখে ইতিহাস-রূপে বর্ণনা করায় উহা যে অন্নদা-মঙ্গলের অঙ্গ নহে, তাহা স্পষ্টই দেখান হইয়াছে। অথচ আবার অষ্টমঙ্গলার তালিকায় ধরিয়া কবি একটা গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন।

হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ অসামঞ্জস্য বা অঙ্গহানি নাই। উহাতে বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্ববিবরণ শাপবৃত্তান্ত উত্তমরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বেহারান্তর্গত কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু, সন্তান লাভের জন্য কালীপূজা করিলে, দেবী সন্তুষ্ট হইয়া সন্তানলাভের বর দিলেন। কিন্তু দেবী রাজাকে বর দিয়া কাহাকে তাঁহার সন্তান করিয়া দিবেন সেজন্য বড় চিন্তিত হইলেন——

"রাজাকে সন্তান দিতে, ভাবে কালী নিজ চিতে,
হেনকালে দেবীর বিদিত।
বসন্ত সামন্ত সাথে, মদনিক এক রথে,
আসিয়া হইল উপস্থিত॥
যায় দেখি উচ্চাসনে, ভৈরব ভৈরবীগণে,
সম্ভ্রমে করিল অবস্থান।

প্রণমি দেবীর পায়, চলিল মন্মথ রায়,
কালান্তরে গেল নিজস্থান।
যোগানন্দ নামে এক, নরদেহ আছিলেক,
যোগবতী তাহার * * *
কঠোর তপের ফলে, কালীপদ কৃপাবলে,
হৈল দুই ভৈরব ভৈরবী॥
সে সোঁহে আছিল তথি, বসে আইল রতি পতি,
অহঙ্কারে না কৈল উত্থান।
পুত্র হেতু নৃপবর, মাগিয়া লৈয়াছে বর,
ছল পাইয়া দেবী করে মান॥
দেবীবলে যোগানন্দ, এ কর্ম্ম করিলা মন্দ,
কামকে না করিলা আদর।
শুনি যোগানন্দ বলে, তব পাদপদ্ম বলে,
মন্মথকে নাহি মোর ডর॥

* * * * *

দেবী বলে নরাধম, না জান দেবের মর্ম্ম,
কামকে করিলা অপমান।
জন্ম যাইয়া মহীতলে, কামকে যে দোষ দিলে,
সেহি মত পাইবা অপমান॥
এত শুনি যোগানন্দ, বলে কর্ম্ম হইল মন্দ,
কেন মাতা হইলা নিঠুর।
কাম দোষে হৈল শাপ, মনে অতি পরিতাপ,
দেব সভা হৈতে হৈল দূর॥
অনেক তপের ফলে, যোগ আরাধনা বলে,
পেয়েছিলাম অভয়চরণ।
জননী জঠর বাসে, বন্দী হৈলাম মায়াপাশে,
পুনঃ দুঃখ সংসারে পতন॥
ভৈরবের বাক্য শুনি, হাস্যমুখে নারায়ণী,
বলে পুত্র না ভাবিয় শোক।
মহীতলে বিহরিয়া, আমা পূজা প্রকাশিয়া,
পুনশ্চ আসিবা শিবলোক॥

ভৈরব বলেন মাতা, সুখমোক্ষপদ-দাতা,
কেমনে চরণ ছাড়ি যাব।
যদি আজ্ঞা কৈলা মোকে, যাইতে নরলোকে,
বল আমি কোথায় জন্মিব॥
অগজ্জা তোমার বাণী, এ তিন ভুবনে জানি,
তাতে আমি অধম দুর্ম্মতি।
যদি মোরা যাব ক্ষিতি, চরণে রাখিবা ভক্তি,
অধমের আর নাহি গতি॥
নির্ম্মল ভকতি দানে, কাটি পাশ যতনে,
রাতুল চরণে দেহ স্থান।
দেবী বলে বাছা শুন, যাও গুণসিন্ধুঘরে,
পাবা ভক্তি মুকতি কল্যাণ॥
যোগবতী ধরাতলে, বীরসিংহ নৃপ ঘরে,
জন্ম লইয়া ভজ ভগবতী।
আমার কৃপায় রামা, ভুবনমণ্ডলে তোমা,
ঘুষিবেক রসের খেয়াতি॥
যোগানন্দ পতি হবে, মর্ত্ত্যে সুখে বিহারিবে,
ভক্তি লোহে আমার পাইবা।
ক্রোধে তোমা শাপ দিল, তাহে ভাল বর হৈল,
রাজপুত্র রাজকন্যা হবা॥"

এই যোগানন্দ ও যোগবতীর মর্ত্ত্যে সুন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ, কালিকার পূজা প্রকাশ ও পুনরায় স্বর্গে গমন বর্ণনাই বিদ্যাসুন্দর বা কালিকা-মঙ্গল। অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্ভূত করিবার জন্য কবি এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত ছাড়িয়া দিয়া উপাখ্যানটীকে অঙ্গহীন করিয়াছেন।

অন্নদা-মঙ্গলে মিশাইবার জন্য কালিকা-মঙ্গলকে বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই গুণসিন্ধু রাজার কালীপূজা, বরলাভ, সুন্দরের জন্ম, বিদ্যার জন্ম, যোগানন্দ ও যোগবতীর মর্ত্ত্যে আগমন প্রভৃতি বহু বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেক কথা মাজিয়া ঘসিয়া চাকচিক্যশালী ও রসাল করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের প্রথম লিখিত কালিকামঙ্গলের এক অঙ্গহীন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। সংক্ষিপ্ত ও অঙ্গহীন হইলেও ইহা রচনার পারিপাট্যে, শব্দবিন্যাসে ও রসালতায় বড়ই সুদৃশ্য হইয়াছে। পাঠক বিদ্যাসুন্দরের মধুর ভাষাবৈচিত্র্যে বিহ্বল হইয়া ইহার অঙ্গহীনতা বা সংক্ষিপ্ততার কথা ভাবিতে অবসর পান না।

অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের মধ্যাহ্ন জ্যোতিঃ দর্শন করিলে তৃপ্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধালোকের ন্যায় তাঁহার প্রাথমিক কবিত্ব-বিভা কাব্যামোদীর নিকট এক অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। উহা কেবল প্রথম রচিত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেই পাওয়া যায়। সহৃদয় কাব্যকৌতুকী বাঙ্গালীর ইহা সযত্নে রক্ষণীয় বটে।

কালিকামঙ্গল রচয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর নির্দ্দেশানুসারে দেখা যায় যে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গতঃ অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।　　বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই।　　রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।　　রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

ভারতচন্দ্র স্বতন্ত্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন এ কথা প্রাণরাম বলেন না। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে প্রথম রচিত বিদ্যাসুন্দরের (কালিকামঙ্গল) অতি অল্প পরেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর পূর্ব্বরচিত বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা রসাল হওয়াতে আদি বিদ্যাসুন্দর সাধারণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমে লোকে উহার কথা এক প্রকার বিস্মৃতই হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী কবি উহার উল্লেখ করেন নাই।

পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা আদি বিদ্যাসুন্দরে যে যে বিষয় অধিক আছে, তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

বিদ্যা ও রাজার বিবাহবিষয়ক কথোপকথন।

"রাজা বলে শুন কন্যা আমার বচন।　তুমি কন্যা হৈতে মোর দুঃখ বিমোচন॥
বিবাহের হেতু মাতা বলহ আপনি।　দেশে দেশে আছে বহু　*　*
যথায় তোমার ইচ্ছা বরে হয় মন।　ধরিয়া আনিব সেহি রাজার নন্দন॥
এই মতে বিদ্যারে জিজ্ঞাসে নরপতি।　বিচার করয়ে মনে বিদ্যা গুণবতী॥
ভারত কহিছে রাজা আছে নিরূপণ।　অলঙ্ঘ্য কালীর বাক্য না যায় খণ্ডন॥

বীর সিংহ রাজকন্যা,　রূপে লক্ষ্মী গুণে ধন্যা,
গুণবতী যেন সরস্বতী।
ভাবে বিদ্যা মনে মন,　কি বলিব নিরূপণ,
যে হেতু পুছেন নরপতি॥
শাস্ত্রের বিচার করি,　বোলে বিদ্যাসুন্দরী,
পিতা মোর শুনহ বচন।
হেট মুখে বিদ্যা কয়,　শোন শোন মহাশয়,
আছে যে বিধির নিরূপণ॥

ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রমত, বিচার করিলাম সত,
বিচার করিয়া কৈলাম সার।
প্রতিজ্ঞা করিলাম মনে, পণ্ডিত সকল সনে,
বিচারে যে জিনিবে আমার॥
শুন রাজা নরপতি, বিদ্বান্ করিব পতি,
অবিদ্বানে নাহি প্রয়োজন।
দেখিল শাস্ত্রের নীত, শাস্ত্রে যার নাহি *
সেহি অন্ধ থাকিতে লোচন॥
মূর্খ জীব যার পতি, সে নারীর অধোগতি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় পতিযোগে।
পতি পাপে হয় পাপ, জীবনে না ঘুচে তাপ,
অন্তেতে নরক ভোগ ভোগে।
পণ্ডিত যাহার পতি, সতত ধর্ম্মেতে মতি,
মূর্খের শরীরে সর্ব্ব দোষ।
মূর্খের জীবন জরা, কেবল * ভরা,
যাবত জীবন অসন্তোষ॥
প্রতিজ্ঞার কথা জানি, পণ্ডিত সকলে *
লাজে রহে না কহে বচন॥
কন্যার বচন শুনি, চিন্তাযুক্ত নৃপমণি,
আসিয়া মিলিল ভট্টগণ॥"

প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এজন্য আমরা আর উদ্ধৃত না করিয়া, সংশোধন করাতে কালিকামঙ্গলের (আদি-বিদ্যাসুন্দরের) সহিত অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরের যে পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহার একটু আদর্শ দেখাইয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

হস্তলিখিত গ্রন্থের পাঠ।

"মালিনী বলিছে বাপু তোরে সেই খোটা। যত টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোটা॥
তবে সে প্রত্যয় হয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইলাম দুইকাহন ভাগ্যে বেটা ভাঙ্গী॥
সেরের কাহন দরে কিনিল সন্দেশ। আনিয়াছি আধসের পাইয়া বড় ক্লেশ॥
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি জানি॥
অগোর চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। জরিত্রী এলাচ তাহা না মিলে সকল॥
দুই পণে আনিয়াছি একপণ পান। আমি যাহা পাই তাহা নাহি পাও আন॥
অবাক হইলাম হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনে দোকানীর নাহি সরে বাক্॥
কত কষ্টে আনিয়াছি আর গোটা নয়। ফিরিয়া না কহে মূল যে কহে সে নয়॥

দুঃখেতে আনিল দুগ্ধ গিয়া নদীপার। আমি বিনা কাহার শকতি আনিবার॥
খুন হৈয়াছিলাম বাছা চুণ চাহিয়া। শেষে না হইল কড়ি আনিল চাহিয়া॥
লেখাবুঝ আমে বাপু! তুমে পাতি খড়ি। শেষে নাকি বল মাসি চুরি করে চুরী॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। এমনি বাড়িবে দেখি উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি মহাভাগবত। এত না দেখিয়াছি চাহিয়া ভাগবত॥"

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ।

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝায় বাছনি। মাসী ভাল মন্দ কিবা কহহ বাছনি॥
পাছে বল বুনপোরে মাসী দেয় খোটা। যদি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়। এ টাকা উচিত দেওয়া কেবল জুয়ায়॥
তবে সে প্রত্যয় হয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু ত কাহণে ভাগ্যে বেটা ভাঙ্গী॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ॥ আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ॥
আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা। যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ আনিয়াছি পান। আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনা দোকানীর না সরে গো বাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে। আমা বিনা কাহার শকতি আনিবারে॥
আটপণে আনিয়াছি কাঠ আট আঁটি। নষ্টলোকে কাঠ বেচে তাহে নাহি আঁটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে। শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভুনে খড়ি পাতি। পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি পাতি॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। বুঝিবা বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে কবিরায় ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥"

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল।

নবদ্বীপচন্দ্রের অভ্যুদয়ে তাঁহার অনুগৃহীত শত শত ভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব প্রেম-তরঙ্গে যে সময় বঙ্গভূমি নবীনভাব ধারণ করিয়াছিল, বৈষ্ণবগণের সেই সুখের দিনে কবি জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন অনেকেই এই সুকবির নাম অভিনব বলিয়া মনে করিবেন, বাস্তবিক কীটদষ্ট পুরাতন পুথির মধ্যে এই মহাত্মার নাম গুপ্ত থাকায়, আমরা অনেকেই পূর্ব্বে এই বৈষ্ণব কবির নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই; কিন্তু এমন এক দিন গিয়াছে, যে দিন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে পল্লিতে পল্লিতে জয়ানন্দের সুললিত সঙ্গীতাবলী শ্রুত হইত, শত শত ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া সেই মধুর গাথা শ্রবণ করিতেন। জয়ানন্দের সেই গীত-পুস্তকের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল"।

সম্প্রতি এই চৈতন্য-মঙ্গলের একখণ্ড পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় পুথিখানি খণ্ডিত। পুথির মধ্যে ১, ১৭ হইতে ৩৬ এবং ৩৮ হইতে ৪০ সংখ্যক পত্র নাই, আর সকল পত্র আছে। শেষ পত্রের সংখ্যা ৭৬। দেখা যাইতেছে, গ্রন্থের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

পুথির শেষে নকল হইবার সন, তারিখ ও লিপিকারের নামাদি এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল নবখণ্ড সমাপ্তঃ ॥ ৹ ॥ যথা দৃষ্টতাদি ॥ শ্রীধর্ম্মদাস আচার্য্যকস্য লিখনমিতি ॥ শকাব্দা ॥ ১৬০১ ॥ মাহ চৈত্র বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী দিবসে বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীনা॰রণ দাসের পুস্তক সাঙ্গ হৈল ॥ ৹ ॥ ইতি ২স ৯মং তারিখ ১৩ চৈত্র ॥"

গ্রন্থের উক্ত সমাপ্তি বাক্য অনুসারে আমাদের আলোচ্য পুথিখানি ২১৮ বর্ষের পুরাতন হইতেছে। পুথির অবস্থা ও লিখন ভঙ্গী অনুসারেও তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

সম্পূর্ণ পুথিখানির শ্লোক সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারি হাজার হইবে; কিন্তু আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহারই আলোচনা করিব। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যে পুথির এক তৃতীয়াংশ পাওয়া যাইতেছে না, সেই খণ্ডিত পুথির আলোচনায় প্রয়োজন কি? যখন সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যাইবে, তখন আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। এখন এই

১। লেখা অস্পষ্ট।

২। '২ স ৯ ম' এই চারিটি অক্ষরও কোন অঙ্কজ্ঞাপক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপস্থিত আমরা ইহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিলাম না।

খণ্ডিত পুথি হইতে যে সকল বিষয় অপরিষ্কার বা অভাব দৃষ্ট হইবে, হয়ত সম্পূর্ণ পুথি পাইলে তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারিবে।

কিন্তু আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে সাধারণের নিকট সেই অতি প্রয়োজনীয় কথা গুলি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হয়ত অনেকের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যানুরাগী, বৈষ্ণবতত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং পুরাতত্ত্বপ্রিয় সুহৃদ্‌বৃন্দের কতকটা রুচিকর হইবে ভাবিয়াই আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি।

পুথিখানি যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই কএকটী বিষয় জানিতে পারিব।

১। গ্রন্থকারের পরিচয়।

২। কবির পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষায় রচিত কতকগুলি প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকা।

৩। তখনকার শ্রীহট্ট ও নবদ্বীপের অবস্থা।

৪। চৈতন্য-চরিতাধ্যায়কগণ যে সকল বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, তাহার কতক কতক পরিস্ফুট বর্ণনা।

৫। তৎকালীন বঙ্গভাষার অবস্থা।

৬। কবির কবিত্বের পরিচয়।

এই কএটী মুখ্য বিষয় ব্যতীত ছোটখাট আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই খণ্ডিত পুস্তকে দেখিতে পাই। সেই জন্যই এই পুথিখানি আমাদের আলোচ্য।

কবির পরিচয়।

কবি জয়ানন্দ গ্রন্থের নানা স্থানে* এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ;—

১। "শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ গৃহবাসে॥
গুহিআ নাম ছিল বাএর মড়াছিআ বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে॥
জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি। পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি॥
পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তক লিখনে। আপনে চিন্তাএ পাঠ যত শিষ্যগণে॥
বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে। জয়ানন্দ জন্ম হৈল চৈতন্যমঙ্গলে॥"

(২য় পত্র। ২ পৃষ্ঠা। ৩-৪ পংক্তি)

২। "শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জনম হৈল সে দিবসে॥
গুহিআ নাম ছিল বাপের মড়াছিআ বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে॥
মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী। তার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি॥

---

* পুথিখানিতে তেমন বেশী বর্ণাশুদ্ধি নাই, বঙ্গভাষার সেই সাবেক রূপ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্য আমরা অধিকাংশ স্থলেই আদর্শের অনুরূপ উদ্ধৃত করিব।

খুড়া জেঠা পায় ও চৈতন্তে অতি ভক্তি।"

বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাসি। দুর্ব্বাসা ভারতী ব্যাস জগৎ প্রকাশে॥
যার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতে। অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে॥
জেঠা বৈকুণ্ঠমিশ্র সর্ব্বতীর্থ পূত। ছোট ভাই রামানন্দমিশ্র ভাগবত॥
বন্দ্যঘটিবংশে রঘুনাথ উপাসক। তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্তভাবক॥
এত দূরে বৈরাগ্যখণ্ড সাঙ্গ হৈল। গাইব সন্ন্যাস খণ্ড মন প্রকাশিল॥
চিন্তিঞা চৈতন্ত গদাধর পাদদ্বন্দ্ব। বৈরাগ্যখণ্ড সাঙ্গ হৈল গাএ জয়ানন্দ" ॥ ৪৩।২।২-৮।

৩। "জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞি। চৈতন্তচরণ ধ্যান ইহা বই নাঞি॥
চিন্তিয়া চৈতন্ত গদাধর পাদদ্বন্দ্ব। আনন্দেতে তীর্থখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥" ৫৪।১।৬-৭।

৪। "চৈতন্য চলিল গৌড়দেশে। শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞাবিশেষে॥

"তুঙ্গনা ভক্রথ পাড়া, ছাড়িয়া অম্বুরপাড়া,
নরো নগরে বাসা করি।
রেমুণা বাসনা দিঞা, রাতিনে রহিল গিঞা,
জলেশ্বরে রহিলা শর্ব্বরী।
ছাড়িঞা দেবশরণ, প্রবেশিলা মান্দারণ,
বর্দ্ধমানে দিল দরশন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে,* তপ্ত সিকতাপথে,
তরুতলে করিল শয়ন॥
বর্দ্ধমান সন্নিকটে, ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে সুবুদ্ধিমিশ্র, গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য,
তার ঘরে করিল বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুআ, জয়ানন্দ নাম থুঞা,
রোদনী রাখিল তার লঞা।
রোদনী ভোজন করি, চলিলা নদিয়াপুরী,
বায়ড়া উত্তরিলা গিঞা॥
আশ্চর্য্য বিজয়খণ্ড, কেবল অমৃত কুণ্ড,
কর্ণরন্ধ্রে জগজন পিএ।
চৈতন্ত পদারবিন্দ, সুধাময় মকরন্দ,
জয়ানন্দ সেই আসে জীএ॥" ৭০।২।১৫, ৭১।১।১-৩।

---

* এখানে বোধহয় লেখকের দোষে দুই একটী কবিতা পড়িয়া গিয়াছে।

৫। শ্রীশ্রীবড়ঠাকুর গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বর পাঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল কিছু গীত প্রচরি॥ ২।২।২।

৬। অভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদে।
পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা চৈতন্য আশীর্ব্বাদে॥
বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্য-মঙ্গলে॥ ৪৩।২।১-২।

উপরে উদ্ধৃত কবিতাগুলি হইতে আমরা কবির এইরূপ পরিচয় পাইতেছি ;—

যে সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে তখনকার খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বন্দ্যঘটীয় কুলে কবি জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বৈশাখ মাস শুক্লদ্বাদশী তিথি। মাতামহ-গৃহেই কবির জন্ম। কবির মাতার নাম রোদনী, পিতার নাম শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র। *

কবির জ্যেঠার নাম বৈকুণ্ঠ মিশ্র ও খুড়ার নাম রামানন্দ মিশ্র। বাণীনাথ মিশ্র নামে তাঁহার এক আত্মীয় ছিলেন, ইনি কবির খুড়া কি জ্যেঠা ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই বাণীনাথের পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র।

উপরের পরিচয় হইতে মোটা মুটী বুঝা যায়, যে ব্রাহ্মণকুলে জয়ানন্দ জন্মিয়াছিলেন, সেই বংশে বিদ্বান্ সৎপণ্ডিতের অভাব ছিল না। জয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষ রাজযজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা চৈতন্যের শিষ্য ও মাতা নিত্যানন্দের ভক্তা হইলেও কবির খুড়া জ্যেঠারা চৈতন্যকে ভক্তি করিতেন না। এইরূপ এক পরিবার মধ্যেই তখন মতবৈলক্ষণ্য ছিল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চৈতন্যশাখায় বর্দ্ধমানবাসী সুবুদ্ধিমিশ্রের নাম আছে। কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতে মূল শাখা বর্ণনে "সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কোমল নয়ান।" এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়ানন্দ-জননীর সন্তান হইয়া বাঁচিত না। সুবুদ্ধিমিশ্রের অনেক সাধ্যসাধনার পর কবির জন্ম হইল। প্রথমে পিতা মাতা ভাবেন নাই যে এ সন্তান বাঁচিবে, তাঁহাদের কুলোজ্জ্বল করিবে। কাজেই এরূপ স্থলে যাহা হয় তাহাই হইল। যে কারণে চৈতন্যদেবের 'নিমাই' নাম রাখা হইয়াছিল, সেই কারণে কবির প্রথম 'গুইয়া' নাম রাখা হইল। গুইয়া কিরূপে জয়ানন্দ হইল? তাহা কবি নিজেই বলিয়াছেন।

---

* এখনকার কালে হইলে কবি 'শ্রীসুবুদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়' এইরূপে আপনার পিতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু সে সময়ে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়' ইত্যাদি অভিনব উপাধির সৃষ্টি হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণসমাজে 'মিশ্র' 'ওঝা' এইরূপ উপাধিই সচরাচর প্রচলিত ছিল। জয়ানন্দ তৎকালের নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে নদীয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধমান হইয়া তিনি আমাইপুরা গ্রামে পিতা সুবুদ্ধিমিশ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।[১] কবির মাতা রোদনী রন্ধন করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক চৈতন্যদেবকে ভোজন করাইলেন। এই অবস্থান কালে গৌরাঙ্গদেব কবির 'গুইয়া' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'জয়ানন্দ' নাম রাখিলেন। জয়ানন্দ চৈতন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু কে? তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। তবে "অভিরাম গোসাঞির পাদোদকপ্রসাদে" এই ভণিতা অনুসারে যেন অভিরাম গোস্বামীকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া বোধ হয়। কবি নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের প্রসাদে এবং গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন।

কোন্ শকে জয়ানন্দের জন্ম ও কোন্ শকে চৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়, এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান পুথিতে কোন কথা লিখিত নাই। তবে গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাবলী ও তখনকার বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহায্যে আমরা মোটামুটী কালনির্ণয় করিতে পারিব।

চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎপূর্ব্বেই জয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল, তাহা কবির নিজ রচনা হইতেই জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিঞা সন্ন্যাস। আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে। কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসাল সকলে॥"

চৈ-চরি ১ম খ° ১৩ পরি°।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত বচনানুসারে জানা যাইতেছে, ১৪৩১ শকে মহাপ্রভু গৃহ ত্যাগ করেন, তৎপরে তিনি ৬ বর্ষ অর্থাৎ ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত একবার নীলাচল, একবার গৌড়, একবার বৃন্দাবন, একবার দক্ষিণাপথ, এইরূপে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। এরূপ স্থলে তিনি ১৪৩৭ শকের পূর্ব্বে জয়ানন্দের পিতৃনিবাস আমাইপুরা গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে জয়ানন্দের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রভু প্রথম জয়ানন্দকে দর্শন করেন, তখনও তাঁহার জয়ানন্দ নাম হয় নাই, পিতামাতা 'গুইয়া' বলিয়া ডাকিতেন। তখনও

১। "শচীসুতী নদী সুবুদ্ধিমিশ্র জানি।
চৈতন্যের শাখা বাস অম্বিকাতে শুনি॥" (বৈষ্ণবাচারদর্পণ)

বৈষ্ণবাচারদর্পণ বেশী প্রাচীন গ্রন্থ নয়। বোধ হয় আমাইপুরা স্থানে নামকরণে অম্বিকা নাম সৃষ্টি হইয়াছে।

বোধ হয় কবি শৈশব অতিক্রম করেন নাই, বড় হইলে তাহার নামটী পাকা হইয়া যাইত, তখন বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত আর নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত না। সাধারণতঃ শৈশবকালেই নামকরণ হইয়া থাকে। চৈতন্যপ্রভুর "গুইয়া" নামটী ভাল লাগে নাই, তাই তিনি 'জয়ানন্দ' নাম রাখিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে অনুমান ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শকের মধ্যে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। কবি স্বচক্ষে চৈতন্যদেবের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই তাহার আভাস দিয়াছেন—

"নদীয়ার লোক যত তার তুমি আঁখি।
এ বোল স্মরণ তাহে জয়ানন্দ সাখি॥" (৯।১।৭)

কবি কোন্ সময়ে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন, তাহাই এখন বিবেচ্য।

কবি গ্রন্থের প্রথমাংশেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি বঙ্গীয় বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকাটী উদ্ধৃত করিলাম—

"চৈতন্য অনন্ত রূপ অনন্তাবতার।　অনন্ত কবীন্দ্রে গাএ মহিমা তাহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মীক মহাকবি।　পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়।　গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।　শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।　চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্যসহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।　সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে।　সংক্ষেপ করিল তিঁহি গোবিন্দবিজয়ে॥
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।　শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।　সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহি পরমানন্দগুপ্ত।　গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।　চৈতন্য-মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।　জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাএ শেষে॥
আর শত শত কবি জন্মিব অপার।　চৈতন্যমঙ্গল তাঁরা করিব প্রচার॥
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব।　আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥"

(২।২।৯—১২, ৩।১১—৩)

উপরে যে কয়টী কবিতা উদ্ধৃত হইল, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যানুরাগীর নিকট সেই কবিতা কয়টীর মূল্য অধিক। ঐ কবিতা প্রমাণ করিতেছে, কবি জয়ানন্দের পূর্ব্বে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী, বৃন্দাবন-দাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপালবসু নামক কবিগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ভক্ত বৈষ্ণবগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের

পরিচয় এখানে নিষ্প্রয়োজন, তাঁহাদের অনেকের গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিতেছে, ঐ সকল কবির পরিচয়ও অনেকে অবগত হইয়াছেন ; কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "চৈতন্যচরিত্র" পরমানন্দপুরীর "গোবিন্দবিজয়," গৌরীদাস পণ্ডিতের "চৈতন্য-সঙ্গীত," পরমানন্দ গুপ্তের "গৌরাঙ্গ-বিজয়," এবং গোপাল বসুর "চৈতন্যমঙ্গল" এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ কয়জন দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ? আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গসাহিত্য সমুদ্রমন্থন করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বর্ণিত শত শত বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের মধ্যে আমরা এই কয়খানি গ্রন্থের নামোল্লেখও পাইলাম না। পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় এখন যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের সন্ধান করা বড়ই দুষ্কর। ঐ সকল গ্রন্থ বাহির হইলে চৈতন্য-জীবনের অনেক সমস্যা পূরণ হইতে পারে। বড়ই সুখের বিষয়, কৃত্তিবাসকে আমরা যেমন বঙ্গের বাল্মীকি বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, কবি জয়ানন্দও তাঁহাকে যেন সেইরূপ ভাবিয়াই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, ১৪৫৭ শকে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। ১৪৯২ শকে লোচনদাসের সহিত বিরোধভঞ্জনার্থ বৃন্দাবনদাসের সেই চৈতন্য-মঙ্গল একটু রূপান্তরিত হইয়া 'চৈতন্যভাগবত' নামে প্রচারিত হয়। ১৪৫৭শকের পরে অর্থাৎ বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইবার পরে যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, তৎপূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না ? বোধ হয় তখনও চৈতন্যভাগবত নাম হয় নাই। তাহা হইলে কবি জয়ানন্দ বিশেষ করিয়া বৃন্দাবনের ভাগবত নাম অথবা ভাগবত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের গ্রন্থগত নাম লইয়া বিরোধ, তখনও বৈষ্ণব-সমাজ একেবারে বিস্মৃত হন নাই। এদিকে দেখা যায় (অচ্যুত বাবুর মতে) লোচনদাস ১৪৫৯ শকে নরহরি সরকারের আদেশে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কিন্তু কবি জয়ানন্দ লোচনদাসের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। এরূপ স্থলে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে, জয়ানন্দ লোচনদাসের পূর্ব্বে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সন্দেহ জয়ানন্দের লেখাতেই ভঞ্জন হইবে। তিনি গ্রন্থের উপসংহারে অদ্বৈত প্রভুর দেহত্যাগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ১৪৮০ শকে অদ্বৈতাচার্য্য অপ্রকট হন। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ১৪৮০ শকের পরে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করেন। তবে এখন কথা হইতেছে, অদ্বৈতপ্রভু অপ্রকট হইবার বহুপূর্ব্বে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইলেও জয়ানন্দ তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন ? তাহার দুইটী কারণ হইতে পারে, ১ম জয়ানন্দ একে লোচনদাস অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাতে

আবার লোচনের গ্রন্থ (অচ্যুত বাবুর মতে) চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের রচনা, ইহাতে বালক কবির কবিত্ব-নৈপুণ্য ও অনাবশ্যকীয় বর্ণনা ব্যতীত চৈতন্য-জীবনের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বর্ণিত না থাকায়, তাঁহার নাম ও গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া জয়ানন্দ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ—কবি জয়ানন্দ নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের একজন গোড়া ছিলেন, কবির রচনাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ঠাকুর নরহরি চৈতন্যকে যে চক্ষে দেখিতেন, নিত্যানন্দকে তেমনটী মনে করিতেন না। এই কারণে নিত্যানন্দশিষ্য বৃন্দাবন নিজ গ্রন্থে ঠাকুর নরহরির নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তবে নরহরি চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন, তিনিই মহাপ্রভুকে চামরব্যজন করিতেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ চামর ঢুলায়॥"

যে কারণে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নরহরির নাম করেন নাই, সেই কারণে নিত্যানন্দের শিষ্যপুত্র জয়ানন্দ নরহরির প্রিয় শিষ্য লোচনদাসের নামটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনিও বৃন্দাবনদাসের ন্যায়—

"আর আর শত কবি জন্মিব অপার।
চৈতন্যমঙ্গল তারা করিব প্রচার॥" (৩।১।২)

এই 'চৈতন্য-মঙ্গল' প্রসঙ্গে বোধ হয় লোচনদাসের আভাস দিয়াছেন।[১]

যাহা হউক—এখন আমরা মোটামুটি আমাদের আলোচ্য চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ধরিয়া লইতে পারি। অদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকট হইবার পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্ব্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্ত কবি নিজে চামর হস্তে দেশে দেশে চৈতন্যমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

কবি চৈতন্য-জীবন ও গান পালা বিশেষে বিভক্ত করিবার জন্য ৯ খণ্ডে স্বীয় গ্রন্থের বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই ৯ খণ্ডের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রথমেত আদিখণ্ড যুগ ধর্ম্ম কর্ম্ম।　　দ্বিতীয় নদীয়াখণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম॥
তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ড ছাড়ি গৃহবাস॥　　চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস॥
পঞ্চমে উৎকলখণ্ড গেলা নীলাচল।　　ষষ্ঠে প্রকাশখণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল॥
সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি।　　অষ্টমে বিজয়খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী॥
নবমে উত্তরখণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।　　যুগাবতার যত করিল গৌরাঙ্গ॥
এই নবখণ্ড গীত চৈতন্যমঙ্গল।　　শুনিলে সকল পাপ যাএ রসাতল॥" (৩।১।৩-৬)

১। "শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনরহরি দাস। যাহার সঙ্গেতে নিত্যানন্দের বিলাস॥" জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে এরূপ প্রমাণ আছে, তাহাতে বোধ হয় নিত্যানন্দের সহিত নরহরির বেশ সদ্ভাব ছিল।

দেশের অবস্থা।

এই নবখণ্ড চৈতন্য-মঙ্গলে চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেবের নবদ্বীপে আগমন-কারণ ও তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা কবি জয়ানন্দ অতি সুললিত ভাষায় অকপটে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

"শ্রীহট্টদেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল। ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা। নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র পুরন্দর। সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল সত্বর॥
কোন দেশে রহিব সভার অনুমান। এ দেশে না পাব রক্ষা চল অন্য স্থান॥
যোগভার বসতিযোগ্য গঙ্গার কূলে। নন্দ যেন ছাড়িলেন উৎপাতে গোকুলে॥
পূর্ব্বে মোরে কহিঞাছিল এক যতিরাজ। এ দেশ ছাড়িঞা আছ নদীয়া-সমাজ॥
অনাচার দেশেতে বসতযোগ্য নহে। শ্রীহট্টে উত্তম লোক তিলার্দ্ধ না রহে॥
কৃষ্ণ আর্ত্তি রতি মতি সমাজে বসতি। তীর্থপূত জ্ঞানযুত জিতেন্দ্রিয় যতি
গঙ্গা বৈষ্ণব মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। অল্প ভাগ্যে নহে লোক এ সবে প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নান করিব বসিব নবদ্বীপে। বৈকুণ্ঠ নিবাস আর কিবা জপতপে॥
দিব্য দোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি। গঙ্গা নবদ্বীপ দেখি প্রেমানন্দে ভাসি॥
ভূমি স্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে। নানা বর্ণের লোক বসে জাহ্নবীর কূলে॥
চিন্তিঞা চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-কমল। জয়ানন্দানন্দে গাএ প্রভুর মঙ্গল॥

সুহইরাগ।

নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহরা নানা বর্ণে বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য নদীয়া-নগরী অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভাবিনী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুলশালে॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যানগরী বিজুরী ছটাক পড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
মঠমণ্ডপ সুবস্থিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপণ॥
প্রতিদ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতিগলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥
দ্বিজরূপ ধরি দেবতা গন্ধর্ব্ব জন্ম লভিলা নবদ্বীপে।
হইঞা দ্বিজনারী ইন্দ্র বিদ্যাধরী সঙ্গীত গঙ্গা সমীপে।
স্বর্গ ছাড়ি যত গন্ধর্ব্বমণ্ডলী জন্মিল বৈদ্যবনিতা।
দেবঋষি মুনি দ্বিজরূপ ধরি অধ্যয়ন শ্রুতি গীতা॥

গোধূলি সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খ ধ্বনি প্রতি ঘরে।
শ্বেত চামর ময়ূর পাখা তাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে ॥
ইষ্টকারচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত গৃহদ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচ চান্দ চৌখণ্ডি চৌকাঠসারে ॥
সারে রসাল বিশালক স্তম্ভ রাজিত চন্দ্রার্কতিলকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে ॥
খাট পাট সিংহাসন আসন চৌখণ্ডি ময়ূর পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥
ডাবর বাটা গুবাক সংপুট দর্পণ রসবাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তলকলস বারাণসীর ত্রিপদিকা ॥
শঙ্খ বাটা বাটি সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসখুরি।
তিরোহুত গাড়ু তাম্রমুখারমণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি ॥
পাষাণভাজন অতি সুগঠন খড়িকা রঙ্গিকাপড়া।
উড়িস্যা গৌড়ীআ চিরণী বিচিত্র সাঁপুড়া ॥
টাড় গাঁঠ্যা সড়ি হিরণ্যমাদলী কেয়ূরকঙ্কণ রত্নসুপুরে।
হেমকিয়া পাতা বিদ্রুম মুকুতা কাশ্মীরদেশের খুরে ॥
তবক সুরপান-বাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি।...
পাটনেত ভোট সকলাত কম্বল শ্রীরামথালি জমকা।
ভোভোট্টিদেশের ইন্দ্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাসতারকা ॥
দেখিতে না পারি যত দাস দাসী প্রেমের মন্দিরে থাটে।
যে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকাএ নদীয়ার হাটে ॥
চিন্তিঞা চৈতন্য গদাধর প্রাণনাথ পদপঙ্কজ মকরন্দে।
চৈতন্যমঙ্গল নিগম নিগূঢ় গাএ দ্বিজ জয়ানন্দে ॥

কাণাড়া রাগ।

শচী গর্ব্তে অষ্টকন্যা যথাকালে হৈল। দৈবনির্ব্বন্ধে দিন কথো কাল গেল ॥
জগন্নাথমিশ্র হৈল মিশ্র পুরন্দর। সৎকবি পণ্ডিত মহাতাত্ত্বিক সুন্দর ॥
উগ্রতপ দেখি সর্ব্ব লোকে চমৎকার। স্নান সন্ধ্যা নিত্য শ্রাদ্ধ ভূদেব আচার ॥
বলি হোম জপ যজ্ঞ পূজা ধূপ দীপে। শ্রীভাগবত পাঠ করেন গোবিন্দ সমীপে ॥
আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম। দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম ॥
নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা। নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পালাইঞা ॥
তবে জগন্নাথমিশ্র দেখিঞা কৌতুকে। বিশ্বরূপ দশকর্ম্ম করি একে একে ॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। দন্ড প্রাণ লয়ে তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্দে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপবিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা। রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ-নিবাস করিল বারাণসী॥
বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে। ভট্টাচার্য্য শিরোমণি সভার সমীপে॥
নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখে মহা ঘোরতর॥
কালী খড়্গখর্পরধারিণী দিগম্বরী। মুণ্ডমালা গলে কাটি কাটি শব্দ করি॥
ধরিঞা রাজার কেশে বুকে মারে শেল। কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল॥
আজি তোর গলাএ পেলিমু গৌড়পাট। সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
গৌড়েন্দ্র বলিল মাতা মোর দেহে শাক। নবদ্বীপ বসাইব যদি প্রাণ রাখ॥
নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে। মূর্চ্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণীতলে পড়ে॥
প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজার বিশ্বাসে। শুনিঞা আশ্চর্য্য স্বপ্ন সর্ব্বলোকে ত্রাসে॥
গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু। রাজকর নাহি সর্ব্ব লোক চাস চসু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে। রাজকর দণ্ডি হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে। ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈষ্ণ ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে। নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে। কলসে পতাকা উড়ু মন্দির উপরে॥
পুণ্যের রাজ্যাহ পড়ু, গঙ্গার উভার। শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয় কার॥
পূর্ব্বে যেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী। তার শতগুণ অধিক যেন শুনি॥
নবদ্বীপের সীমাএ যবন যবে দেখ। আপন ইচ্ছায় মার প্রাণ আর রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান। হাট ঘাট মানা নাহি কর গঙ্গাস্নান॥
নবদ্বীপের প্রজাএ কি মোর অধিকার। সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার॥
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পূর্ণ সৃষ্টি। শরৎকালে রাত্রিশেষে হৈল ধূপবৃষ্টি॥

যহাঁ যহাঁ জন যে ছাড়িঞাছিল গ্রাম।　　নবদ্বীপে আইল সভে পূর্ণ হৈল কাম॥
চিন্তিঞা চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব।　　আনন্দে নদীয়াখণ্ড রচে জয়ানন্দ॥"

উদ্ধৃত কবিতা কয়টী হইতে এইমাত্র জানিতে পারি, এক সময়ে শ্রীহট্টে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। সেই মহা মড়কের সময় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পুরন্দর মিশ্র সস্ত্রীক নবদ্বীপে পলাইয়া আসেন। যে নবদ্বীপ এক সময়ে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের প্রিয় রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, মিশ্র মহাশয়ের আগমনকালে সেই নবদ্বীপের পূর্ব্বসমৃদ্ধি তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও অসংখ্য মন্দির বিবিধ জাতির নিবাসভূত অট্টালিকাশ্রেণী নবদ্বীপের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপে যবনের ঘোরতর উপদ্রব বাড়িয়াছিল। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিরুলিয়া গ্রামের লোকেরা অনেকেই যবন হইয়া যায়। নবদ্বীপের উপর পিরুলিয়া[১] গ্রামীদেরই কিছু বেশী আক্রোশ, তাহারা সুলতান-রাজাকে জানাইল যে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন? নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া যবন করিবার আদেশ করিলেন। গৌড়াধিপের আজ্ঞায় পিরুলিয়া গ্রামীরা আসিয়া যাহাকে তাহাকে পারিল, যবন করিতে লাগিল। এই উৎপাতের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম একজন। এই দুঃসময়ে বিশ্বরূপের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণাদির করুণ আর্ত্তনাদে মহামায়ার দয়া হইল। উক্ত কবি লিখিয়াছেন, মহামায়া দিগম্বরী খড়্গখর্পরধারিণী ভীষণা কালী মূর্ত্তিতে নিদ্রিত যবনরাজের নেত্রপথে সমুদিত হইলেন। স্বপ্নে যবনরাজ অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার মতিগতি ফিরিল, তিনি নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিলেন না, নবদ্বীপবাসীকে অভয় দান [illegible]রিলেন। এখানে একটী কথা বলিবার আছে। কবি জয়ানন্দ একজন পরম [illegible] তাঁহার খুল্লতাত জ্যেঠা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ রামোপাসক ছিলেন। তিনি বিষ্ণু [illegible]গান কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছরাজের দর্পচূর্ণকাহিনী বর্ণনা করিলেন না কেন? আমাদের বোধ হয় কবির বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ঘটনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই শাক্তগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। শাক্তগণের কোনরূপ অনুষ্ঠানে দৈবশক্তিতে যবনরাজের মন ফিরিয়াছিল, তাই বোধ হয় ম্লেচ্ছাধিপ উত্যক্ত নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান করিয়া ছিলেন। বাস্তবিক মহাঝটিকার পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির ভাব ধারণ করে, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপ সেইরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

তৎকালে গৃহস্থের তৈজসাদি ও বিলাসদ্রব্যের মধ্যে ডাবর, বাটা, পানের ডিবা, দর্পণ, রসবাটিকা, তামার হাঁড়ি, পিত্তল কলস, বারাণসী তেপায়া, বাটা বাটী, রসময় থাল, রসখুরি, জিহুতের গাড়ু, পিত্তলের ঝারি, পাথরের বাসন, খড়িকারঙের কাপড়, উড়িয়া

১। বর্ত্তমান পিরালী সম্প্রদায়ের সহিত এই পিরুলিয়া গ্রামীদের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি?

গৌড়িয়া কুলুপ, বিচিত্র চিরুণী, গাঁপুড়া, টাড়, গেঁঠো কড়ি, সোণার মাদুলী; কাশ্মীর দেশের খুর (?), কারিদেশের বেণী, পাটের কাপড়, কোট কম্বল, শ্রীরামপানি জমকা, জোজোরিদেশের ইন্দ্রনীলমণি, লক্ষীবিলাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। এ ছাড়া কৃষ্ণকেলি বসন, নিকুটৈল, লক্ষীবিলাস খাট প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্যের কথাও জয়ানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়ানন্দ তখনকার খাদ্য সামগ্রীর এইরূপ একটী তালিকা দিয়াছেন—

"ব্যঞ্জনে পাঁকরা মুদগ সূপ ছানাবড়ি।
ওলভাজা খোল বড়া নারিকেলকোরা বড়ি॥
বড় আম্র কাঁঠিখণ্ড দধিবড়া ক্ষীর ছেনা।
অমৃতগুটিকা দুগ্ধ খোয়া চিনি পানা॥
মধুখণ্ডা ঘৃতখণ্ডা চিনিখণ্ডা পিঠা।
আর্না ডালিম্ব আর পর্জুর কাকরা॥
বোমবড়া কন্দবন সাতপুলি শর্করা।
দেউলিয়াকর মধু সাকবড়িয়া পুলি।
মরিচা ঝাঝরি মধুশ্রবা ঝিলিমিলি॥
দুঃখহরা মনোহরা খইচুর নবাত।
কৃষ্ণকেলি হংসকেলি ছাওয়া পারিজাত॥
হরিবল্লভ, নয়নসুখ আর সুধারি।
চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল অমৃপান শিকরি॥
এরতি শস্কুল ক্ষীরী ক্ষীরসা ক্ষীরড়া।
বোয়ারি সোমদণ্ডা হাতিগুণ্ডা দোহড়া॥" ইত্যাদি

বিশেষ কথা।

কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র হইলেও এই মঙ্গলাখ্য গীত পুস্তক হইতে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়, চৈতন্যভাগবতাদিতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

১ম। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, বঙ্গীয় চৈতন্যচরিতাখ্যায়কগণ কেবল এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহট্টদেশের কোন স্থানে তাঁহারা বসবাস করিতেন এবং শ্রীহট্টে বসবাসের পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা লেখেন নাই। কিন্তু কবি জয়ানন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"শ্রীহট্টদেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম। সর্ব্ব সুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী উত্তরদিগেতে গোমতী। পশ্চিমে ডোলসমুদ্র দক্ষিণে করাতি॥
জয়পুরে শত শত ব্রাহ্মণের ঘর। দিব্যমূর্ত্তি মহাবিদ্যা মহা ধনেশ্বর॥
ঋষির মহাকুল মহাবংশপ্রসূত। দিগ্বিজয়ী নিজ দর্শনব্যাখ্যাচতুর্ম্মুখ॥

যেন বংশে জগন্নাথমিশ্রের উৎপত্তি। শচী পিতা নিল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
বাসুদেব চক্রবর্ত্তী জন্মিলা শ্রীহট্টে। শচী জগন্নাথ নাম ধরিলা নিকটে॥" (৫।২।৫-৬)

এখন জানিলাম, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্ট প্রদেশের অন্তর্গত জয়পুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই জয়পুরের পূর্ব্ব সীমায় সরস্বতী, উত্তর সীমায় গোমতী, পশ্চিমে ঢোলসমুদ্র এবং দক্ষিণে করাতি।

এদিকে আবার শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ মধুকরমিশ্র শ্রীহট্টে আসিয়া বরগঙ্গা নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার অন্যতর মধ্যমপুত্র উপেন্দ্রমিশ্র কৈলাস পর্ব্বতের নিকট গুপ্ত-বৃন্দাবনে ইক্ষুনদীর পশ্চিম পারে অমৃত নামক গুপ্তকুণ্ডের সন্নিধানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তৎপুত্র জগন্নাথমিশ্র দেশে ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন[১]। এখানে জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন[২]।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্টে ভীষণ মারিভয় হওয়াতেই জগন্নাথমিশ্র পত্নী শচীদেবী ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে

১। "আসীৎ শ্রীহট্টমধ্যস্থো বিপ্রো মধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্যবৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
বরেন্দ্রাদ্বৈব তেনেহ কিয়দ্ভূমি করোৎকরা।
বরগঙ্গেতি যো দেশঃ সুজনৈঃ পরিগীয়তে ॥
তস্য মধ্যমৈকপুত্রো হিত্বা দেশঞ্চ পৈতৃকম্।
শ্রীমদুপেন্দ্রমিশ্রাখ্যঃ প্রধানঃ জ্ঞানসাগরঃ ॥
কৈলাসসন্নিধানে তু গুপ্তবৃন্দাবনং মহৎ।
ইক্ষু নাম্নী তত্র পূর্ব্বে কালিন্দী সদৃশী নদী ॥
বৃদ্ধাশ্রমেশ্বরস্তত্র দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
কৈলাসস্যোত্তরে কুণ্ডং গুপ্তং পরমশোভনম্ ॥
আস্তেঽমৃতাখ্যঃ লোকৈস্তৎ কদাচিদপি দৃশ্যতে।
বভূবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ ॥ (১ম সর্গ)।
ধীমন্তং সুতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্ণবম্।
কাতন্ত্রাদীনি শাস্ত্রাণি পাঠয়ামাস স দ্বিজঃ ॥
আবেদনং তস্য তত্রৈব বৃদ্ধো মিশ্রঃ প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে ॥"

২। "নিশম্য গুণরূপাণি শ্রীলবৈদিকসত্তমঃ।
নীলাম্বরো দ্বিজবরো হৃষ্টঃ তং প্রণতো মুদা ॥
বৃদ্ধো তং নরশার্দ্দূলং চক্রবর্ত্তী স্বধর্মবিৎ।
অদৈষ্ট কন্যাং প্রবাস্যাপি সুশীলায় মহাত্মনে ॥"

আসিয়া বাস করেন। এরূপ স্থলে শ্রীহট্টে বাল্যকালেই জগন্নাথের সহিত শচীর বিবাহ হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপেই শচীর সহিত জগন্নাথের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন দুই বিভিন্ন মত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহার মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু মীমাংসা করিবার আমরা যোগ্যপাত্র নহি। বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন কোন বহুদর্শী ব্যক্তি ইহার মীমাংসা করিলেই ভাল হয়।

আমাদের পরম সুহৃদ্ শ্রীহট্টবাসী অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় প্রদ্যুম্নমিশ্রকে চৈতন্যদেবের খুড়তাত ভাই ও তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অন্যদিকে কবি জয়ানন্দও চৈতন্যের সমসাময়িক হইতেছেন। এরূপ স্থলে কাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে? জয়ানন্দ তখনকার নবদ্বীপবাসী অধিকাংশ ভক্তেরই সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ নবদ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই বোধ হয় তিনি স্বচক্ষে নবদ্বীপ দর্শন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া সকল বৈষ্ণবই শচী ঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করিয়া যাইতেন। এরূপ স্থলে জয়ানন্দ যদি শচী ঠাকুরাণীকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্বপরিচয় পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে জয়ানন্দের কথাই অধিক বিশ্বাস করিতে হয়। বিশেষতঃ শচীদেবীর নবদ্বীপে বিবাহ হইলে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ আহ্লাদের সহিত এ কথার উত্থাপন করিতেন। আরও দেখা যাইতেছে, কবি জয়ানন্দ চৈতন্যপার্ষদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী, পরমানন্দগুপ্ত প্রভৃতির রচিত চৈতন্যচরিত ও তৎকালীন চৈতন্যদেবের প্রধান প্রধান ভক্তগণের মুখে অনেক কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা কবি জয়ানন্দের বর্ণনাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস প্রথমে জয়পুর নামক স্থানেই ছিল, তৎপরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যদেবের জ্ঞাতিগণ বৃন্দাবন বা বর্ত্তমান ঢাকা দক্ষিণনামক গ্রামে আসিয়া বাস করিলে সেই স্থানও চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকিবে।*

ইতি নিশ্চিত্য মনসা গত্বা স নিজকেতনম্।
আহ্বায়ৈ নবগ্রামাৎ মনসা সৎ কুলজ ভক্ত॥
প্রাজ্ঞাপিকাবিধানেন জগন্নাথায় ধীমতে।
তস্মৈ দিনে প্রদদৌ তু শচীং শীঘ্র সুতাং বরাম্॥
দত্ত্বা পাণিগ্রহং সদ্য নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ।
জগন্নাথোঽবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া শোভয়াবৃতঃ॥" (চৈতন্যোদয়াবলী ২ সর্গ)।

২। রাঢ়ীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তাঁহাদের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ ঘটিয়াছে। যথা—

শ্রীহট্টে বাস করিবার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় ছিলেন? এ সম্বন্ধে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে পালাঞা গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥
সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তাঁর নাম।
পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি তাঁর ঘরে করিল বিশ্রাম॥" (৪৮:২।১)

এখন জানা গেল, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলের যাজপুরে বাস করিতেন। রাজা ভ্রমরের ভয়ে সেই স্থান হইতে তাহারা শ্রীহট্টদেশে পলায়ন করেন।

"যোহি গৌরাঙ্গরূপেণ তারয়ামাস পাতকাৎ।
হরিনামকীর্ত্তনালোকাঃ পৃথিব্যাং সাধকোত্তমাঃ।
তস্যাপি যস্য কর্ম্মাণি অত্যাশ্চর্য্যানি ভূতলে।
তস্য সন্ন্যাসনাদেব তস্যান্যো ন বিদ্যতে॥" (বৈদিক কুলপঞ্জিকা।)

এরূপ স্থলে চৈতন্যের জ্ঞাতিবংশের অস্তিত্বেও ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র যেরূপ বংশাবলী দিয়াছেন তাহা এই—

মধুকর মিশ্র
|
উপেন্দ্র মিশ্র
|
কংসারি　পরমানন্দ　জগন্নাথ　সর্ব্বেশ্বর　পদ্মনাভ　জনার্দ্দন　ত্রিলোকনাথ
জগন্নাথ → বিশ্বরূপ　বিশ্বম্ভর (চৈতন্য দেব)
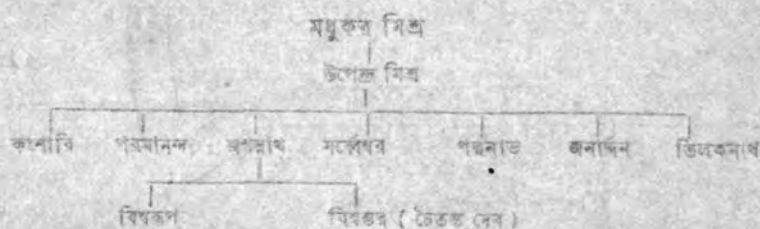
অচ্যুত বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, শ্রীহট্টে ঢাকার দক্ষিণে চৈতন্যের জ্ঞাতি বংশীয় যে সকল ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহাদের 'বৎস গোত্র ও পঞ্চম প্রবর।'

কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলপঞ্জিকায় যেরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—

১০০২ শকে সমাগত চারি ব্রাহ্মণের অন্যতম জিতামিত্র মিশ্র, তৎপুত্র ২ মাধব, তৎপুত্র ৩ কন্দর্প, তৎপুত্র ৪ অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ৫ বিশ্বপতি, তৎপুত্র ৬ ভর্গদেব, তৎপুত্র ৭ কার্ত্তিক, তৎপুত্র ৮ বর্ণশায়ী, তৎপুত্র ৯ শিবরাম, তৎপুত্র ১০ রমাপতি, তৎপুত্র ১১ জগন্নাথ। জগন্নাথের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও নিমাই গৌরাঙ্গ (বংশাভাব)।

গোপীনাথ কণ্ঠাভরণরচিত চৈতন্যচরিতেও ঠিক এইরূপ বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার কথা গুলি তুলিয়া দিলাম—

"যতো জিতামিত্র যথাগ্রজা ইহ কামেশরামেশ ক্রমেণ মাধবাঃ।
আদ্যত্রয়াণাং তনয়ো ন বিদ্যতে কন্দর্পকং পুত্রমবাপ মাধবঃ॥
তস্মাদনিরুদ্ধাহ্বয় নন্দনোঽজনি ততঃ সুতো বিশ্বপতীতি বিশ্রুতঃ।
বভূব ভর্গাভিধ সন্ততিস্ততঃ প্রকীর্ত্তিতস্তস্য সুতশ্চ কার্ত্তিকঃ॥
শ্রীবর্ণশায়ী তনয়োঽভবত্ততঃ স চ প্রপেদে শিবরামনন্দনঃ।
শিবস্য পুত্রো বিদিতো রমাপতিস্ততো জগন্নাথ সমাহ্বয় দ্বিজঃ।

উৎকলের ইতিহাসে 'ভ্রমর' নামে কোন রাজার স্পষ্ট নামোল্লেখ নাই। এরূপ স্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন, জয়ানন্দ এ নাম কোথায় পাইলেন? নামটী জয়ানন্দের মনঃকল্পিত নহে। কটক জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর হইতে উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্র দেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের "ভ্রমর" উপাধি দৃষ্ট হয়।* যে সময় মুসলমানরাজগণের প্রবল প্রতাপ সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় এই ভ্রমরবর কপিলেন্দ্ররাজ মালব, গৌড়, ও দিল্লীশ্বরগণের গৌরব খর্ব্ব করিয়া স্বাধীনতা ও হিন্দুপ্রতাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২৬। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, হরিদাস ঠাকুর বূড়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীবিষ্ণুদাসেত্যভিধস্ত ধর্ম্মিণো বণীতরঙ্গাজমুখীঃ সমোদরায়।
শচীতি নাম্নীং প্রিয়সেন কল্পিতা যতি জগন্নাথ ইত্যগ্রহীৎ স চ॥
ততঃ শচীগর্ভ সমুদ্ভবাবুভৌ যশোনিধানাবতি ভাববোধকৌ।
অপূর্ব্বরূপোঽপ্রতিমোঽপি পূর্ব্বজঃ শ্রীবিশ্বরূপেত্যভিধানধারকঃ॥
বাল্যকালে নিহত্যৈব সর্ব্বান্ বিষ্ণুপরাঙ্মুখাঃ।
সন্ন্যাসমুত্তমং মত্বা প্রবব্রজ কাননং যযৌ॥
শচী চ ক্লিষ্ট চিত্তাপি চৈতন্যাশাবশাত্তদা।
শতান্তরবিহীনা সা নীতিজ্ঞানীৎ স্বনীতিবিৎ॥
হরিনামপ্রচারায় কলিধ্বান্ত কর্ষণে।
পূর্ণিমায়াং শকাব্দেহভিবিয়দ্বেদবিধৌ ভবে॥
ফাল্গুনে ফাল্গুনীযোগে গোধূলে রজনীমুখে।
শ্রীশচ্যা গর্ভকুহরে গৌরচন্দ্র হ্যজায়তেঽভবৎ॥
গোপীশো গৌরচন্দ্রঃ কন্দর্পবিশালিতোঽসৌ কলেঃ কালরূপঃ।
সংসারেঽস্মিন্ সারে স্মরশরশমনঃ সারসন্ন্যাসিশিষ্টঃ॥
হতীব শাঠ্যেন শঠঃ শঠাশিরো বিবাদরাগৈরভিরঞ্জিতাকৃতিঃ।
শান্তঃ শশাঙ্কাননবেশচন্দ্রমে বিহায় গেহং প্রজগাম কাননং॥"

উপরে যে দুইটী তালিকা দেওয়া গেল, কেবল জগন্নাথমিশ্রের নাম ভিন্ন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কোন নামে মিল নাই। এরূপ স্থলে কোনটী প্রকৃত ও কোনটী অপ্রকৃত, তাহা স্থির করা বিষম সমস্যার বিষয়। গোস্বামী পাদগণ এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিলে ভাল হয়। তবে বলিয়া রাখি, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বংশাবলী লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা যেমন বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সেইরূপ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যেও সমাজদারগণ বহুকাল হইতে বংশাবলী লিখিয়া অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এরূপ স্থলে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় যে বংশাবলী রক্ষিত হইয়াছে, তাহা একেবারে উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

* বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ গোপীনাথপুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

"বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥" (চৈ° ভা° আ°।৪৩)

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার 'হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিতে' লিখিয়াছেন, বুড়নে হরিদাসের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম সুমতি শর্ম্মা ও মাতার নাম গৌরী-দেবী। কিন্তু আমাদের আলোচ্য চৈতন্য-মঙ্গলে কবি জয়ানন্দ এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"একদিন নাচে গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে। হরিদাস ঠাকুর আসি দেখিলা স্বরূপে॥
মহাবৈরাগ্য শুদ্ধ হেম কলেবর। উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর॥
স্বর্ণনদীতীরে জাটি কলাগাছি গ্রাম। হীনকুলে জন্ম হয়ে উপরি পূর্ণনাম॥"(১৩।২।১১-১৩)

উক্ত কবিতানুসারে হরিদাস ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতার নাম মনোহর, তিনি গঙ্গাতীরে কলাগাছি গ্রামে (জাটিবংশে ?) হীনকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতেছে, বৃন্দাবনদাস জয়ানন্দের অনেক পূর্ব্বে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, জয়ানন্দও তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ বৃন্দাবনের পুস্তক দেখিয়া শুনিয়া জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে এরূপ ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন কেন? জয়ানন্দ হরিদাসের মাতা পিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, বৃন্দাবন অপেক্ষা জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুরের বেশী পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনদাসের ভ্রমটী সংশোধন করিয়াছেন এইরূপ অনুমিত হয়। বুড়নের সহিত হরিদাসের বিশেষ সংস্রব ছিল, তাহাও কবি জয়ানন্দ জানিতেন। সে কথাও তিনি লিখিয়াছেন—

'বুড়ন হইতে আইল হরিদাস।" (৭৩২।৯)

বুড়নে হরিদাসের অনেক লীলাখেলা হইয়াছিল, বোধ হয় সেই জন্যই বৃন্দাবন বুড়ন হরিদাসের জন্মস্থান মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জন্মস্থান কলাগাছি গ্রাম।

৩য়। অনেকে বলিয়া থাকেন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্গী গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন। কিন্তু কবি জয়ানন্দ মহাপ্রভুর অনুসঙ্গিগণের মধ্যে স্পষ্ট গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

"হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি।
সন্ন্যাসেরহেতু যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি॥
শুনিঞা আনন্দময় হৈলা গৌরচন্দ্র।
গঙ্গা পার হৈঞা আগে হৈলা নিত্যানন্দ॥
মুকুন্দদত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইল নদীয়া গঙ্গাপার॥
আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর আচার্য্য হরি।
বাসুদেব দত্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগাই গঙ্গাদাস।
তোমা সভা বিদ্যমানে লইব সন্ন্যাস ॥" (৪২।২১৪ ৫)

'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামে যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।

৪র্থ। কোন কোন চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব যখন প্রথম নীলাচলে যাত্রা করেন, তৎকালে গৌড়াধিপের সহিত উৎকলরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই জন্য রামচন্দ্র খাঁন তাঁহাকে প্রথমে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন কথাই লেখা নাই। বরং জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, যে সময় নীলাচলে মহাপ্রভু অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় একবার উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রের বঙ্গজয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব. গৌড়াধিপের প্রভূত পরাক্রমের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। কোন সময় এ প্রসঙ্গ ঐতিহাসিকগণের সামান্য কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া জয়ানন্দের কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

"এই মতে আছেন (চৈতন্য) বৎসর দুই চারি। গৌড়ে উৎকলে পড়িল মহা মাড়ী।
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ। শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস ॥
চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল। প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল।
কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর। সিংহ শার্দ্দুল দেখ কতেক অন্তর ॥
ভুবনেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে। জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব অতদিনে ॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর। গৌড়সুখে শয়ন ভোজন পাছে কর ॥
কাঞ্চিদেশ জিনি কর নানা রাজ্য। গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য ॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে। তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে ॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র। বিদ্যানগরে গেলা করিবারে যুদ্ধ ॥"

(বিজয়খণ্ড ৭০।২ পৃ)

৫ম। এখন যেমন ইংরাজ রাজত্বে অনেক শিক্ষিত হিন্দু ইংরাজী অনুকরণ করিতে ছাড়েন না, সেইরূপ মুসলমান প্রাধান্যকালে মুসলমানী অনুকরণ চলিতেছিল, তখনকার সমাজ লক্ষ্য করিয়া জয়ানন্দ চৈতন্যের মুখে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

"শূদ্রাণী লইয়া ঘর করিব ব্রাহ্মণে। কন্যা বিচিবেক যে সব শাস্ত্র জানে ॥
ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ী পারস্য পড়িবে। মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥
মসনবিয়া বৃত্তি সে করিব দ্বিজবরে। ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তরে ॥
শূদ্র জগদ্‌গুরু হব ম্লেচ্ছ হবেক রাজা। রাজা সর্ব্বস্ব হরিবে দুঃখিত হব প্রজা ॥"(৭০।১)

৬ষ্ঠ। মহাপ্রভু কিরূপে অন্তর্দ্ধান করিলেন, সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী ভক্ত বৈষ্ণব লেখকগণ কেহ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। অনেক ভক্ত বৈষ্ণবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সেই নিদারুণ কথা প্রকাশ করিতে নাই, সে কথা মনে

হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আমাদের আজিকা সেই বিশেষ কথাটী যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈষ্ণব লেখক স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই, ভক্ত কবি জয়ানন্দ পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

"নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥
আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে। নিভৃতে তাঁহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্বপারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটাএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোঁসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানাবর্ণে বিকযাসা আইল কোথা হইতে। কত বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
প্রাণশরীর তথা রহিল সে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
অনেক সেবক সর্প দংশ হৈঞা মইলা। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈলা॥"

(১৫।২।১৪-১৫, ১৬।১।১-৩)

এখন আমরা জানিলাম, রথযাত্রার সময়ে গৌরাঙ্গের কোমল পদাগ্রে একটী ইষ্টকের আঘাত লাগে। কিন্তু তখন তেমন বেদনা হয় নাই। তিনি সর্ব্ব পারিষদ্ সঙ্গে শেষবার নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। টোটাশ্রমে শয়নাবস্থায় তিনি পণ্ডিত গোঁসাইকে কহিলেন, আগামী কল্য দশ দণ্ড রাত্রে মায়া শরীর ত্যাগ করিব। এইরূপে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য লীলা সম্বরণ করিলেন।

ভাষা।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপাদি অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, কবি জয়ানন্দ সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তখনও বঙ্গভাষা ব্যাকরণের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, এখনকার বঙ্গভাষার সহিত তখনকার ভাষার অনেকটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। জয়ানন্দের গ্রন্থে ক্রিয়ার নাম পুরুষ, কর্ত্তার উত্তম পুরুষ, আবার কর্ত্তার নাম পুরুষ ক্রিয়ার উত্তমপুরুষ, তৃতীয়ায় "কে" বিভক্তি, সপ্তমীর "তে" স্থলে "এ" বা "ত" এবং মধ্যম পুরুষে "সি" প্রয়োগ প্রভৃতি নানারূপ দৃষ্ট হয় *। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ;—

---

* পুঁথির সর্ব্বত্রই প্রাকৃত নিয়মানুসারে "য" স্থানে "জ", যেমন জায়—(বর্ত্তমান যায়) এবং স্থলে "য়া" স্থানে "আ" প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন চিন্তিআ।

১। করিল=করিলাম।

"কালে ইন্দ্রছায় বিষাদ ভাবিঞা।
কোন কর্ম্ম করিল ব্রজপুরী গিঞা॥" (৪৬।২।৮।)

২। যায়=যাও। খায়=খাও।

"ব্রহ্মচারী হৈলা তুমি হবিষ্যান্ন খায়।
আমি সব পড়ি তুমি পড়িতে না যায়॥" (১৩।২।১৩।)

৩। এ=(সপ্তম্যন্ত) তে।

"হেন বেলাঞ দ্বারকাএ পড়িল প্রমাদ।" (৫৯।১।৫।)

৪। ত=(সপ্তম্যন্ত) তে।

"সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নানাতীর্থ করি।" (৩।১।৫।)

৫। সি (মধ্যম পুরুষে)।

"ঈষৎ হাসিঞা প্রভু তাহারে জিজ্ঞাসি।
আমারে ভাণ্ডিঞা বেটা মন্দিরে পালাসি॥"

৬। বোলাহ=বল।

"তুমি কৃষ্ণ-চৈতন্য বোলাহ সন্ন্যাসী-মণি॥" (৬৬।১।১৫।)

৭। বলু=বল বা বলহ।

"প্রতিজ্ঞা করিঞা বলু মোর বিদ্যমানে।" (৫২।১।৮।)

৮। ছাড়িব=ছাড়িবে।

"লক্ষী কভু না ছাড়িব তোমার ভগ বলে।" (৫৭।২।১৩।)

৯। সাজাব=সাজাইবে।

"বিপ্রগণ ভোগ জাহে সাজাব সতত।" (৫৮।২।১৪।)

১০। পেলাইয়া=ফেলাইয়া।

"হাথের মোহন পুথি দূরে পেলাইয়া।" (১৪।১।৭।)

১১। ইবে=এবে, এখন।

"ইবে অভাগিনী হইলাঙ হেন প্রায় বাসি।" (৪২।১।৮।)

১২। তবু=তবু, তথাপি।

"তবু এই স্থান না ছাড়িব কোন কালে।" (৬১।২।৮।)

১৩। তথির=তাহার।

"যদুবংশ ক্ষয় হব তথির লাগিঞা।" (৫৯।১।১২।)

১৪। নৈ=নদী।

"কটক দেখি স্নান করি মহানৈ কূলে।" (৫২।২।৩।)

১৫। ওড়ন্ত্রা=উড়িষ্যা।

"ওড়ুআর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা লোকে ঘোষে।" (৫৭।২।১৫।)

১৬। দেনু = দেউল, দেবালয়।

"জগন্নাথের দেনু রহি সিংহাসন মাঝে।" (৫৩।১।৫।)

এতদ্ভিন্ন অনেক অপ্রচলিত শব্দেরও প্রয়োগ আছে, সহজে তাহাদের অর্থগ্রহ হয় না। প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলি উদ্ধৃত হইল ;—

১। ঢামালি।

"নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে রসের ঢামালি।" (৭৬।২।২৫।)

২। মথুরা।

"বিংশতি যোজন ক্ষেত্র নগর মথুরা।
পূর্ব্বে আগার ছিল হবে সে নগরা॥" (৬৯।২।৮।)

৩। নাছ।

"অগ্রে অগ্রে হংডা তাঁর নাছের কুক্কুর॥" (২।১।৩।)

৪। উভার।

"পুষ্পবৃষ্টি নীলাচলে গন্ধের উভার।" (৪৯।২।৪।)

৫। চিড়িপো। *।

"আমা সঙ্গে বিবাদ করিল চিড়িপো। (৫২।১।১৩।)

৬। ফেট * = বন্ধ করা।

"পুনরপি দ্বার ফেটি দেউল প্রবেশিল।"

৭। সস্তেট * = সাক্ষাৎকার।

"জগন্নাথের আজ্ঞা সার্ব্বভৌমে কপাট ফেট।
চৈতন্য গোসাঞি করাহ সস্তেট॥" (৫২।১।১৪।)

৮। এলঙ্কা = এড়কা।

"মুষলের কড়ে যত এলঙ্কা জন্মিল।
সেই এলঙ্কার যুদ্ধে যদুবংশ গৈল॥" (৫৯।২।১৩।)

৯। উদগ্রাহ।

"উদগ্রাহ করিতে চৈতন্য গোসাঞি জান॥" (৬২।২।১০।)

১০। ঠাঁসিঠুসি = ঠুকঠাক।

"ঠাঁসিঠুসি শব্দ শুনি দেনু ভিতরে।" (৫৯।২।১৩।) ইত্যাদি।

কবিত্ব।

চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতির মত জয়ানন্দ প্রথম শ্রেণীর প্রেমিক কবি নহেন ও ভক্ত হইলেও আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্বপ্রকাশে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমানও হইতে পারেন না,

* এই শব্দ গুলি উৎকল ভাষায় এখনও প্রচলিত আছে।

লোকচরিত্র চিত্রণে বা স্বভাবের শোভায় বিমুগ্ধ করিতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বা ঘনরামের আসন গ্রহণ করিতেও সমর্থ নহেন না কিম্বা ভাষার ওজস্বিতায় কাশীরাম দাসের সমকক্ষ নহেন; তথাপি কিন্তু ভক্তের কাছে, ভক্তির সরল আবেগ দেখিয়া যাঁহারা বিমুগ্ধ হন তাঁহাদের নিকট, কবি জয়ানন্দ একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। কবিরাজ গোস্বামীর মত তিনিও একজন বিনয়ী কবি। তিনিও বহুস্থলে—

"বৈষ্ণব চরণ ধূলা লাগু মোর গাএ।
সুবংশে বিকামু মুঞি বৈষ্ণবের পাএ॥"

এরূপ সরল প্রাণের কথায় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের অমূল্য নিধি বিনয় হইতে কবি জয়ানন্দ বঞ্চিত ছিলেন না। এই মহাগুণেই তাঁহার তুলিকায় শ্রীচৈতন্যদেব বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রতিফলিত হইয়াছেন। করুণ রস বর্ণনায় কবি অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার করুণ রসাশ্রিত সরল পদগুলি পড়িতে পড়িতে ভাবাবেশে অনেক সময় হৃদয় গলিয়া যায়। মহাপ্রভু যে দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তৎপূর্ব্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার যে সকল কথা হয়, তাহা বাস্তবিক হৃদয়স্পর্শী। তৎকালে কবি জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে এইরূপ বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন—

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে। (ধ্রু)

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্ম দিনে। উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান কর গৃহাঙ্গনে॥
দিব্য পাটের পুষ্প ধূপ দীপ গন্ধে। সংকীর্ত্তনে নাচে প্রভু পরম আনন্দে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

তোমার জন্মতিথি পূজা। আনন্দিত নবদ্বীপ বৃদ্ধ বালা যুবা॥ ১॥
চৈত্রে চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে। শুনিয়া যে প্রাণ করে কি কহিব কাকে॥
প্রচণ্ড উচ্চট বাত তপ্ত সিকতা। কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পাথারুদ্ধে বাতা॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

তোমার নিদারুণ হিয়া। গঙ্গাতে প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া॥ ২॥
বৈশাখে চম্পকমালা নূতন গামছা। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি-বসনের কোঁছা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ শুক্ল পৈতা কান্ধে। রূপ দেখিয়া কুলবধূ বুক নাহি বান্ধে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

বিষম বৈশাখের রৌদ্রে। তোমার বিচ্ছেদে পড়ি দুঃখ-সমুদ্রে॥
বসন্তে কোকিল পাখী ডাকে কুহু কুহু। তোমা দেখিয়া মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
চূতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোল। তুমি দূরদেশে আমি জুড়াব কার কোল॥
মোরে না খাইও জাগিঞা। মনের পোড়নি কারে কহিব ডাকিঞা॥ ৩॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবাসিত জলে স্নান করাইব। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি অঙ্গে পরাইব॥
পাখা ঢল চামরে চৌদিকে দিব বা। হৃদয়ে তুলিয়া থুব দুখানি রাঙ্গা পা॥

আমি কি বলিতে জানি। বিধি হেন কান্তে যেন ঝুমিল করিণী ॥ ৪ ॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরির নাদ। দারুণ বিধাতা মোরে লাগিল বিবাদ ॥
মেঘের শবদ শুনি ময়ূরের নাট। কেমনে রহিব আমি নদীয়ার বাট ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মীবিলাস গৃহে পালঙ্ক শয়নে। সে সব চিন্তিতে আমি না জীব শ্রাবণে ॥
প্রভু তুমি বড় দয়াবান। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি প্রভু কর অবধান ॥ ৬ ॥
ভাদ্রে ভানুতাপ সহনে না যাএ। কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগাএ ॥
যার প্রাণনাথ ভাদ্রে নাহি থাকে ঘরে। প্রাণ উচাটন তার বজ্রাঘাত যারে ॥
বিষম ভাদ্রের খরা। জীয়ন্তেই মরা প্রাণনাথ নাহি জারা ॥ ৭ ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা আনন্দিত মহী। কান্ত বিনু সেই দুঃখ কার প্রাণে সহি ॥
শরৎ সময় শোভা নদীয়া নগরী। গৌরচন্দ্র রমণী তারকা সারি সারি ॥
মোরে কহ উপদেশ। যথাতথা থাক প্রভু করিহ উদ্দেশ ॥ ৮ ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয় বা। কুরঙ্গ কৌপীনে কত আচ্ছাদিবে গা ॥
কত পুণ্য করিঞা হইল্য যে তোমার দাসী। ইবে অভাগিনী হইলাঙ হেন প্রাণ রাশি ॥
তুমি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী। তোমার সমুখে আমি কি বলিতে জানি ॥ ৯ ॥
হেমন্তে নূতন ধান্ত জগৎ প্রকাশে। সদা সুখময় গৃহে কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাটনেত তোট লক্ষাত কম্বল। সুখে নিদ্রা যায় আমি থাকি পদতল ॥
তুমি সর্ব্ব জীব অধিকারী। কত সুখ দিলোম হঞা দণ্ডধারী ॥ ১০ ॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে। কান্ত আলিঙ্গনে শীত তিলেক না থাকে ॥
তপ্ত জলে স্নান তোমার অগ্নি জলে পাশে। নানা সুখ আমোদ করহ গৃহবাসে ॥
পৌষে প্রবল শীত তোমারে না সহে। কীর্ত্তন অধিক সে সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে ॥ ১১ ॥
মাঘ মাসে স্নান কর হবিষ্যান্ন খাও। শ্রীভাগবত পড় আর শিষ্যেরে পড়াও ॥
বলি বৈশ্য শ্রাদ্ধ কর ভূদেব আচার। পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার ॥
বিষম মাঘ মাসের শীত। কত নিবারণ দিব এ দারুণ চিত ॥ ১২ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী যত কৈল নিবেদন। হৃদ্‌পাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ ॥
শ্রবণ যুগলে প্রভু দিঞা দুই হাত। জয়ানন্দ বলে প্রভু অনাথের নাথ ॥" (বৈরাগ্যখণ্ড)

উপরে যে বারমাস্যা উদ্ধৃত হইল, উহা হইতেই কবির ভাবশুদ্ধ সরল রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইতিপূর্ব্বে কবির বর্ণিত নবদ্বীপের বর্ণনা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও কবির কবিত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু উপরে যে বারমাস্যা উদ্ধৃত করিলাম তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। পদকল্পতরুর ১৭৮৩ সংখ্যক পদেও আমরা উক্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা দেখিতে পাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কেবল মাঘ মাসের বর্ণনা ব্যতীত আর সকল অংশে তাহার সহিত আমাদের উদ্ধৃত বারমাস্যার মিল আছে। যে টুকু মিলেনা তাহা এই——

"মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এইত দারুণ শেষ রহল সংপ্রতি। পৃথিবীতে না রহল তোমার সঙ্গতি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে লহ নিজ পাশ। বিরহ সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥"

পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদে লোচনদাসের ভণিতা দৃষ্টে অনেক বৈষ্ণবেই আমাদের আলোচ্য বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা লোচনদাসের রচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখন আমরা যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে বৈষ্ণব-সমাজে প্রশংসিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা লোচনের রচনা নহে বলিয়াই মনে হইতেছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্য-প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে তাঁহার অনেক পদ আছে, তন্মধ্যে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গে তিনি এই বারমাস্যার কিছুমাত্র আভাস দেন নাই। তাঁহার রচনা হইলে তাঁহার রচিত চৈতন্যমঙ্গল অথবা চৈতন্যপ্রেমবিলাসে যথাস্থানে আমরা উক্ত বারমাস্যাটি পাইতাম; কিন্তু যথাস্থানে না থাকায় অপরের রচনা বলিয়াই মনে হইতেছে। আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন যে পদকল্পতরুর দেড়শত বর্ষের প্রাচীন পুথিতে লোচনের ভণিতাযুক্ত উক্ত বারমাস্যা তিনি পান নাই। বিশেষতঃ যখন দুইশত আট বর্ষের প্রাচীন পুথিতে জয়ানন্দের ভণিতাযুক্ত পদ রহিয়াছে, এবং যতদিন না তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রাচীন পুথিতে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত উক্ত পদ না বাহির হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা এই বারমাস্যা জয়ানন্দের বিরচিত বলিয়াই গ্রহণ করিব। জয়ানন্দ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈষ্ণব লেখকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যদি লোচনের পদ হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি অকপটচিত্তে লোচনদাসের নামোল্লেখ করিতে কাতর হইতেন না। কেবল আমাদের সংগৃহীত একখানি পুথিতে নহে, এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত বৈরাগ্যখণ্ড নামক জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের অংশ বিশেষে এবং সংপ্রতি সংগৃহীত আর একখানি প্রাচীন পুথিতে কেবল জয়ানন্দের ভণিতা পাইয়াছি। এই সকল কারণে উদ্ধৃত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা জয়ানন্দের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

জয়ানন্দের ভাষা ও কবিত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে কেবল জয়ানন্দ গ্রন্থের উপসংহারে যে সংক্ষিপ্ত চৈতন্যজীবনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"প্রথমে প্রভুর জন্ম কর্ম্ম সুপ্রকাশ। ফাল্গুন মাসে রাহু চন্দ্র-সম্প্রাস॥
নিমাঞি গৌরাঙ্গ আদি বিশ্বম্ভর নাম। এই তিন নাম ভুবন মঙ্গলধাম॥
পাদপদ্ম ধ্বজবজ্র অঙ্কুশ চিহ্ন দেখি। শচী জগন্নাথমিশ্র মনে বড় সুখী॥
ছয় মাসে নিদ্রাচ্ছলে পালঙ্ক-শয়ন। শিরে সর্প দণ্ড ধরে দেখে সর্ব্বজন॥
ক্রন্দনের ছলে কত কত কত মায়া করি। সর্ব্বলোক মুখে বোলাএ হরি হরি॥
শিশু সঙ্গে রঙ্গে নিত্য গৃহাঙ্গন মাঝে। সদে বলে কনক নূপুর পাএ বাজে॥
ধনলোভে ভাণ্ডারিবারে লৈঞা গেলা চোরে। চোর ভ্রমাঞিঞা প্রভু আইলেন ঘরে॥

শিশুমধ্যে গঙ্গাতটে বালির আওয়াসে। হাথতালি দিয়া তথা কীর্ত্তন প্রকাশে॥
রুষিঞা মাএর মুখে ইটাল মারিঞা। তুলসী মঞ্জরী দিলা ভক্তি জনাইঞা॥
রাত্রিদিনে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে। নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
এক বিপ্র কৃষ্ণে অন্ন নিবেদিঞা আইলা। ছুইঞা তাহার অন্ন ব্রাহ্মণ খাইলা॥
সুদর্শন পণ্ডিত সে হাথে দিল খড়ি। চৈতন্যের গুরুকে মারিল পুথির বাড়ি॥
কত দিন কর্ণবেধ সময় হইলে। স্বর্গ হইতে মালা পড়ে গণেশ-ঘট উপরে॥
ছানিয়াধরা রাজার দূত খাইলেক সর্পে। কৃষ্ণ বোলাইয়া তারে ছাড়াইল সর্পে॥
পাটুআ শ্রীধরের পাটুআ চুরি করি। উদ্ধত হইলা কারো বচন না ধরি॥
বুড়ন হইতে আইলা শ্রীহরিদাস। শাপে মুক্ত করিল ঠাকুর গঙ্গাদাস॥
কুলবধূ সভার পুরিল অভিলাষ। অল্পকালে জ্যেষ্ঠ ভাই করিল সন্ন্যাস॥
শুভক্ষণে চূড়া উপনয়ন করিল। কামিনীমোহনরূপ গৌরাঙ্গ ধরিল॥
কলাপে আলাপ করি হৈলা অধ্যাপক। শব্দ অর্থ বাখানিতে পণ্ডিত হএ বক॥
নবদ্বীপে বিদিত পণ্ডিত গঙ্গাদাস। তাঁর ঘরে সর্ব্ববিদ্যা করিল প্রকাশ॥
কলাপে আলাপ সাঙ্গ সকল জানিল। বিবাহ করিঞা নবদ্বীপে পড়াইল॥
বৈকুণ্ঠবিজয় হৈল মিশ্র পুরন্দর। লক্ষ্মী বিভা করিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
প্রতি সূত্রে শব্দ বাখানিলা বিষ্ণুভক্তি। সে বাখান বুঝে হেন নাহি কারো শক্তি॥
তবে প্রভু করিলেন দিগ্বিজয়ী জয়। শেষে তার করিলেন সর্ব্বপক্ষ ক্ষয়॥
গদাধর শ্রীনিবাসে কহিঞা বিশেষে। ধন উপার্জ্জন ছলে গেলা বঙ্গদেশে॥
প্রাচ্যভূমি বঙ্গদেশ তীর্থ হৈল তথা। সর্পাঘাতে বৈকুণ্ঠে চলিলা লক্ষ্মীমাতা॥
বঙ্গ হৈতে আসি বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা করি। আনন্দে ভরিঞা বুলেন নদীয়া নগরী॥
বাপ মরিতে গয়া যাইতে দেখি ঈশ্বরপুরী। ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে রহি তাঁরে কৃপা করি॥
পাপভার গুচাইল বিপ্রপাদোদকে। মুনীন্দ্র মাধবেন্দ্রপুরী মঠে ষড়্ভুজ দেখে॥
গয়াশিরে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান দিলা। এক এক বংশাবলী সব উদ্ধারিলা॥
গয়াতে গৌরাঙ্গ বড় বাড়িল মহিমা। চরণ পরশে মুক্ত পাষাণপ্রতিমা॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী তারে পাদোদক দিল। পাদোদক খাঞা বুড়ি অন্তর্ধান হৈল॥
গয়া হৈতে আসি শ্রীনিবাসের মন্দিরে। ফুলপুষ্প তোলাইলা সর্ব্ব দিনান্তরে॥
তবে কত দিনে বায়ু ধরিঞা আছিল। প্রেমভক্তি যত ছিল সব প্রকাশিল॥
শ্রীনিবাস ঘরে বিষ্ণুখট্টার উপরে। আত্ম প্রকাশিল প্রভু সভার গোচরে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি ছাড়িলা বারাণসী। গৌরাঙ্গ-মহিমা শুনি নবদ্বীপে আসি॥
ষড়্ভুজ দেখাইল নিত্যানন্দ স্বরূপে। নন্দন আচার্য্য ঘরে রহিলা নবদ্বীপে॥
বরাহ মূর্ত্তি দেখাইল মুরারি গুপ্তেরে। স্কন্ধে চড়ি অনুগ্রহ করি দাসী পুত্রেরে॥
ভাবাবেশে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র। হস্তে হল মুষল দিলেন নিত্যানন্দ॥

সার্ব্বভৌম সঙ্গে হৈলা বেদান্ত বিচার । উদগ্রাহ শুনিঞা সার্ব্বভৌম চমৎকার ॥
সার্ব্বভৌমে দেখাইল ষড়ভুজ মূর্ত্তি । ত্রিপুর দেখিল ক্ষেত্রে বিস্থাবাচস্পতি ॥
পরমানন্দপুরি গোসাঞি মেলিলা সেতুবন্ধে । বড় অনুগ্রহ করি রায় রামানন্দে ॥
প্রতাপরুদ্র রাজা দেখিলেন ষড়ভুজে । কাশীনাথপট্টনাএ দিলেন পদাম্বুজে ॥
বড় অনুগ্রহ যাত্রি প্রদ্যুম্ন কানাঞি । তার কোলে নিদ্রা গেল চৈতন্য গোসাঞি ॥
বিষ্ণুপুরি দামোদর বিশ্বেশ্বর । গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গে নিরন্তর ॥
জগন্নাথের আজ্ঞা মনে আনন্দবিশেষে । মথুরা যাইতে প্রবেশিলা গৌড়দেশে ॥
নিভৃতে রহিলা বিস্থাবাচস্পতি ঘরে । সর্ব্বলোক দেখিলেক কুলিয়া নগরে ॥
অনেক পার্ষদ সঙ্গে আনন্দ বিশেষ । নিত্যানন্দ স্বরূপে পাঠাইল গৌড়দেশ ॥
গণেত ঈশ্বর ভাবে শ্রীরামদাস । ত্রিভঙ্গে মুরলী দেখে লোকে ত্রাস ॥
দাধর পসরা মাথে গদাধরদাসে । পথমধ্যে রাধাভাব করিল প্রকাশে ॥
পরমেশ্বর দাস ঈশ্বর ভাবে মত্ত । পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদ ভাবে মত্ত ॥
গাছ উপাড়িঞা সে গাছের ডালে চড়ে । ঘরের উপরে কেহো লাফ দিঞা পড়ে ॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি । নিত্যানন্দ ভাবে তিঁহো হইলা রেবতী ॥
তিন মাস বিহ্বল আছিলা সতন্তর । পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের ঘর ॥
শ্রীরামদাস কৃষ্ণভাবে হাসি হাসি । কদম্বের ফুল ফুটিল জাম্বিরের গাছে আসি ॥
গদাধর দাস বলে সভারে নাচান । গায়ন মাধবঘোষ দানখণ্ড গান ॥
কাজিমুখে হরিবোল বলাই নিত্যানন্দ । মুরারি চৈতন্যদাসে বাঘের সনে দ্বন্দ্ব ॥
পালিয়ে ডুবিঞা থাকে দিন পাঁচ সাত । কালসর্প খাএ সে শরীরে রক্তপাত ॥
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ বণিকের ঘরে । মহামহোৎসবে রাত্রিদিনে নৃত্য করে ॥
স্বর্ণ রজত হীরা মুক্তা নূপুরে । ছবি মনোহর পট্টবস্ত্র প্রচুরে ॥
শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে নিত্যানন্দ । অচ্যুতানন্দের সঙ্গে ভ্রমেন স্বচ্ছন্দ ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ হিরণ্যের ঘরে । দস্যু ব্রাহ্মণ রাত্রে গেল কাটিবারে ॥
রাত্রি পোহাইল দস্যু পালাইল ডরে । বড় বৃষ্টি অন্ধকারে স্তব্ধ হৈঞা রএ ॥
দস্যু প্রতি ব্রাহ্মণের বড় কৃপা করি । প্রেমাশ্রু পুলকে ভাসে দেখি সর্ব্বোপরি ॥
নীলাচলে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ রহিলা । নিত্যানন্দে গৌড়রাজ্য প্রভু সমর্পিলা ॥
কথো দিনে নিত্যানন্দ রথযাত্রা কালে । সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা নীলাচলে ॥
সবীরখাসে ঘুচাইল সংসার বন্ধন । দুই ভাইর নাম থুইল রূপ সনাতন ॥
পুনরপি মথুরা চলিলা গৌরচন্দ্র । সংকীর্ত্তনে গৌড়ে ভাসিলা নিত্যানন্দ ॥
গৌরচন্দ্র তীর্থযাত্রা গেলা বারাণসী । বিধিমতে বিড়ম্বিল পাষণ্ড সন্ন্যাসী ॥
প্রয়াগে চলিলা বেণীমাধবেরে স্নান । অযোধ্যাএ সরযু পর্ব্বত রজঃস্নান ॥
হরিদ্বার ছাড়ি প্রভু চলিলেন বন্যা । অনেক দুর্গম পথে গেলেন মথুরা ॥

দাঁড়ায়ে প্রভু রাতিতে কৌপীনের ডোর। যদি দেহ অন্ন কথাএ রুক্ষ প্রাণ মোর॥
হরিতকী কাটে বৈদ্য মহেন্দ্র ভারতী। মুখে অমি দিল তার তিন শত রতি॥
হরিদাস ঠাকুর আগে করিল বিজয়। ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশীর সময়॥
আষাঢ় বঞ্চিত রথবিজয় নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে। নিভৃতে তাঁহারে তথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটাএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিরে কহিল সব কথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইল কোথা হৈতে। কত বিদ্যাধর নৃত্য করে ব্যোমপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়া শরীর তথা রহিল সে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেল জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী॥
সর্ব্ব পারিষদ লৈঞা শ্রীরামদাস। নিত্যানন্দ প্রবোধিল করিঞা আশ্বাস॥
পুরুষোত্তম আদি অদ্বৈত পারিষদ। চৈতন্য-বিজয় শুনি হৈলা নিঃশবদ॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ। চৈতন্য-বিজয় লীলা করেন শ্রবণ॥
নিত্যানন্দ প্রবোধিঞা সর্ব্ব পারিষদে। চৈতন্যানন্দে নাচে কীর্ত্তন সম্পদে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরো। আচণ্ডালে আদি যদি বৈষ্ণব না করো॥
জাতিভেদ না করিব চণ্ডাল যবনে। প্রেমভক্তি দিঞা সভাএ নাচামু কীর্ত্তনে॥
সর্ব্বশক্তি ধরে শ্রীরামদাস। ছায়াএ কোটি ব্রহ্মাণ্ড করিব প্রকাশ॥
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে। অন্ধ বধির জড় নাচিব স্বচ্ছন্দে॥
আইনু চৈতন্য লওয়াইমু সে চৈতন্য। গৌড় উৎকল রাজ্য করিমু ধন্য ধন্য॥
এই প্রতিজ্ঞা নিত্যানন্দের সভে শুনি। সকল বৈষ্ণব করে জয় জয় ধ্বনি॥
কথো দিনে নিত্যানন্দ শিখাসূত্র ধরি। মহামল্লবেশ ক্ষিতি পর্য্যটন করি॥
সূর্য্যদাসনন্দিনী শ্রীবসু জানকী। পাণিগ্রহণ করিল অদ্ভুত কৌতুকী॥
বসু গর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র। জাহ্নবীনন্দন রামচন্দ্র মহামল্ল॥
মুরারি চৈতন্যদাস ব্যাঘ্র ধরি আনে। নাগশয্যায় নিদ্রা যাএ সর্ব্বলোকে জানে॥
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পানির ভিতরে। কুম্ভীর ধরিঞা আনে সভার গোচরে॥
কাজি সনে বাদ করি প্রেম উন্মাদে। সাতদিন গঙ্গাদাস ছিল গঙ্গাহ্রদে॥
প্রেমের উন্মাদ বড় কমলাকর পিপলাই। নিজ অঙ্গ কাটি তবু যার জ্ঞান নাই॥
কাজি সনে বাদ করিল গদাধর দাস। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলা দেখি লোকে ত্রাস॥
মধুর বিষ খাইলেন পুরুষোত্তম দাসে। বিষ জীর্ণ করিলেন প্রেমানন্দ রসে॥

পরিশিষ্ট।

উপরোক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের তিনখানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই তিনখানি পুথিতেই বৃন্দাবনদাসের প্রসঙ্গ আছে—

"বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিত্তে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে॥" (আদিখণ্ড)

লোচনদাসের এই কবিতা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবত নামেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবন ও লোচনের গ্রন্থগত নাম লইয়া যে বিরোধের প্রবাদ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার মূল কি? কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তমের গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের উল্লেখ আছে। ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-মঙ্গল নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই চৈতন্য-মঙ্গলই পরে চৈতন্যভাগবত নামে খ্যাত হয়, এই মাত্র প্রবাদ শুনা যায় বটে, কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা পাই নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়, তখনও চৈতন্য-ভাগবত নামকরণ হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যভাগবত নামেই গ্রন্থ যে বৃন্দাবনে গিয়াছিল, তাহা বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর সীতাচরিত্র পাঠে জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও লোকনাথ উভয়ে একত্র বৃন্দাবনে বাস করিতেন। একজন চৈতন্য-মঙ্গল ও অপর ব্যক্তি চৈতন্যভাগবত নাম গ্রহণ করিলেন, ইহার কারণ কি? "ভাগবত" নামটী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, ১৪৯২ শকে চৈতন্যভাগবত নামকরণ হয়। কিন্তু তাঁহার মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫০৩ শকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে (১৫০৩ শকে) তিরোহিত হন।' অতএব কেহ বলিতে পারেন, চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস গ্রন্থ সমাধা অথবা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণদাসের সঙ্গী লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্য-ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের দুইমাস পূর্ব্বে (১৪৩২ শকে) তাঁহার আদেশে লোকনাথ বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারার্থ আগমন করেন। তখন লোকনাথের বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বর্ষের কম হইবে না। কারণ চৈতন্যদেব একজন নিতান্ত বালককে কিছু আর তীর্থোদ্ধারের জন্য

পাওয়া যায় নাই। এরূপ স্থলে আনুমানিক ১৪২৪ কি ১৪২৫ শকে লোকনাথের জন্ম কাল মোটামুটি ধরিয়া লইতে হয়। লোকনাথ আপনার গীতাচরিত্রে চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। যদি চরিতামৃত শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বর্ষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত এরূপ বৃদ্ধাবস্থায় (বৈষ্ণব সাহিত্যে) আর কাহাকেও আমরা গ্রন্থ রচনা করিতে দেখি নাই। আমাদের বোধ হয়, যে সময়ে কৃষ্ণদাস চরিতামৃত রচনা করিতেছিলেন, লোকনাথও সেই সময়েই গীতাচরিত্র রচনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এমন বোধ হয় না যে চরিতামৃত সম্পূর্ণ হইবার পরে তিনি আপনার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে চৈতন্যভাগবত দেখিয়াছেন, অথচ তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ ও সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবত নাম শুনেন নাই, বিস্ময়ের কথা বটে! এইজন্যই আমরা বলিতেছি, চৈতন্যভাগবতের নাম করণ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা প্রকৃত কি না তৎপক্ষে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।

অচ্যুত বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস নরহরি ঠাকুরের নামোল্লেখ করেন নাই বলিয়া, লোচনদাসও প্রথমতঃ আপনার গ্রন্থে নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন নাই। পরে বিরোধ ভঞ্জন হইলে তিনি আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ বিরোধভঞ্জনের পরই তিনি চৈতন্যভাগবত নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া বৃন্দাবন দাস (পরে) আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়াও নরহরি ঠাকুরের নাম স্বীয় গ্রন্থে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। লোচনের গ্রন্থে শত শত বার নিত্যানন্দের নামোল্লেখ আছে ও লোচন যে ভাবে নিত্যানন্দকে ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে 'নিত্যানন্দ' শব্দ পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এরূপ শব্দ-যোজনা ও স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লেখা একই কথা। কিন্তু লোচনদাস যে দুইবার করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের বোধ হইতেছে, লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত হইবার বহু পরে আপনার চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতপরে লোচনদাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই এখন বিবেচ্য। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "লোচনদাস ১৪শ বর্ষের সময় ১৪৫৯ শকে নরহরি ঠাকুরের আদেশে চৈতন্য-মঙ্গল প্রকাশ করেন।" কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধারমণ দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় ঐ মত স্বীকার করেন না, তাঁহার বিশ্বাস, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বহুবর্ষ পরে লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হয়। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লোচনের গুরু নরহরি ঠাকুরের এই পদটী আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

"গৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিএ কিছু রাখি।
মুই অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিআ তাহা লিখি॥
গৌর-গদাধর-লীলা, আদ্রব করএ শিলা,
তার শাখা করএ বর্ণন।
শারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মেনি সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বড়।
ভাষায় রচনা হলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পূরাইব প্রভু॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করএ প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥" (পদসমুদ্র)

ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন, এই পদ যখন রচিত হয়, তখন লোচনের জন্ম হয় নাই। পরে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহার বহুবর্ষ পরে তিনি চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করেন।

আমাদেরও এখন বোধ হইতেছে যে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের বহুবর্ষ পরে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হয়। ১৪৮০ শকের কিছু পরে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তখনও লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল বিরচিত হয় নাই। তাই জয়ানন্দ লোচনের ও তাহার গ্রন্থের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কাহারও মতে, ১৪৬৩ শকে নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব ঘটে। তৎপূর্ব্বেই লোচনদাস তাঁহার গুরুর নিকট চৈতন্য-চরিত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরুর জীবদ্দশাতেই যে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থে "চৈতন্য-ভাগবত" নামের উল্লেখ ও জয়ানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহার অনুল্লেখে এখন লোচনদাসের গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়াই মনে হইতেছে। জয়ানন্দের গ্রন্থ ঐতিহাসিকতায় লোচন-দাসের গ্রন্থ অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার কবিত্ব লোচনের রসোদ্দীপক বর্ণনায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যামোদী বঙ্গবাসীর নিকট জয়ানন্দের ইতিহাস তেমন মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য হয় নাই, তাই লোচনদাসের ললিত পীযূষপূরিত শ্রুতিমধুর রচনায় জয়ানন্দের কীর্ত্তিকলাপ কোথায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যেমন মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

প্রকাশিত হইলে গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আদর কমিয়া যায়; লোচনদাসের অভ্যুদয়ে জয়ানন্দের যশোভাতি সেইরূপ মেঘাচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ জয়ানন্দ মহাপ্রভুর দেহাত্যয়ের কথা প্রকাশ করায় ভক্ত বৈষ্ণব-সমাজে অপ্রীতিকর হইয়া পড়েন, কিন্তু লোচনদাস বৈষ্ণবগণের মনোমত কথা লিখিয়া সহজেই ভক্তগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবগণ লোচনদাসের কবিতা-রসালাপে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অপরের রচিত কোন কোন সুমধুর পদ লোচনের নামে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই জন্যই বোধ হয়, এখনকার মুদ্রিত পদকল্পতরুতে জয়ানন্দ-রচিত "বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা" লোচনদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

হরিনামের শব্দ-তত্ত্ব।

বাঙ্গলাভাষায় ঈশ্বরের যত নাম আছে, বোধ হয় হরিনামই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহু বিস্তৃত, আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায়। পত্র লিখিতে হইলে শিরোভাগে অগ্রে হরিনাম লিখিতে হয়। বাড়ীতে পীড়া হইলে গৃহিণী অগ্রে হরিকে পূজা দিবার মানসিক করেন। আমাদের শাস্ত্রে—

'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।'

তুলসীতলায় হরির লুট কুড়াইবার সময় আমাদের সুকুমার-মতি শিশুরা হরিনামের মাধুর্য্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদও পায়। মৃত্যুর পর যখন আমাদের দেহ শ্মশান অভিমুখে নীত হয়, তখন পবিত্র হরিনামের শব্দে ঘোর পাষণ্ডও দ্রবীভূত হয়। এমন কি কেহ কেহ হরিনামের মাহাত্ম্য এতদূর অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহাদের বিবেচনায় এই কলিযুগে হরিনাম ব্যতিরেকে পরলোকে সদ্গতির উপায়ান্তর নাই। কি রাজধানী কি ক্ষুদ্রপল্লী সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মসভার প্রতিবাদস্বরূপ হরিসভার অভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত হরিনামাবলী বস্ত্রে অঙ্কিত করিয়া উত্তরীয় স্বরূপ ব্যবহার করেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়া 'হরি বল' বলিয়া গৃহস্থকে সম্বোধন করে। ঈশ্বরের এতাদৃশ ব্যাপক নাম আমাদের ভাষায় আর কি আছে?

সহজেই জানিতে কৌতূহল জন্মে হরিনামের অর্থ কি? অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি অতি বিচিত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

'হরি' শব্দের অর্থ হরিৎবর্ণ। ইহা মূলে বিশেষণ শব্দ এবং হরিৎবর্ণ বস্তুমাত্রেরই বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে; কিন্তু অতি প্রাচীনকালেই ইহা একটি বস্তু বিশেষের প্রধান বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে হইতে, সেই বস্তুরই নামান্তর স্বরূপ বিশেষ্য পদ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বস্তুটি অপর কিছু নহে, আমাদের বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতির 'সোম'।

আমাদের আর্য্য পিতামহগণের ভারতবর্ষ-প্রবেশের বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে এবং তাঁহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের মধ্যে উক্ত উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়। আমাদের পিতামহগণ যাহাকে 'সোম' বলিতেন, তাঁহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের রসনায় তাহা 'হোম' এই আকারে উচ্চারিত হইত।

'সোম' এক প্রকার উদ্ভিদ্। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা একবারেই জন্মে না। সুতরাং পিতামহ এদেশে আসিলে আর সোমের দর্শন পাইতেন না। ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের আদিম বাসস্থান হইতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের সহিত যেদেশে বসবাস করিতেন তথা হইতে) যত্নের সহিত আনাইয়া লইতেন। যাহারা আনয়ন করিতেন, তাঁহারা অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া

শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত অধুনাতন মহাপ্রসাদের ন্যায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কিন্তু মহাপ্রসাদ যেমন না খাইলেও চলে, তৎকালে সোম সেরূপ না খাইলে চলিত না। সোমযাগই প্রশস্ত দেবোপাসনা বলিয়া তৎকালে গণ্য ছিল। সুতরাং সোমবর্জ্জিত দেশে আসিয়া পড়িয়া সোমযাগের জন্য পিতামহগণকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইত। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতময় প্রদেশে লোক পাঠাইতে হইত এবং একজন কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিলে সকলকে আগ্রহের সহিত তাহার কিয়দংশ যাচ্ঞা করিয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় সোম-সংগ্রহকারিগণের অর্থোপার্জ্জনের একটি নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অর্থ-সংগ্রহের দ্বার স্বরূপ হইয়া উঠিলে এ কালের ন্যায় সে কালেও প্রবঞ্চনায় জড়িত হইয়া পড়িত। বঞ্চকেরা সোমজাতীয় বিবিধ উদ্ভিদ্ যাহা প্রকৃত সোম নহে, তাহা সোম বলিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহা প্রকাশ হইলে পিতামহগণ এক কঠোর আইন জারি করিলেন, 'কেহ সোম বিক্রয় করিতে পাইবে না' অর্থাৎ দ্বিজাতি সমাজে কেহ সোম বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না, করিলে সমাজে পতিত হইবে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যেমন সোমক্রয়ের কথা আছে, তেমনি বিক্রেতার সর্ব্বনাশ ঘটারও উল্লেখ আছে। কিছুকাল উদীচ্য বর্ব্বর জাতীয় লোক 'সোম' আনিয়া বেচিয়া যাইত। কিন্তু কালে এইরূপে 'সোম' সংগ্রহও উঠিয়া গেল। তখন এক্ষণকার ক্রিয়াকাণ্ডে মধু অভাবে যেমন গুড় ব্যবহারের রীতি আছে, তেমনি সোম অভাবে তজ্জাতীয় অন্য উদ্ভিদ্ ব্যবহারের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। তাই এক্ষণে আর 'সোম' কিরূপ উদ্ভিদ্, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাইনা। অনেকের ধারণা 'সোম' একপ্রকার লতা, তাহা নহে, উহা একপ্রকার খর্ব্বাকার বৃক্ষ। বৈদিক শাস্ত্রে সোম রাজা বলিয়া উল্লিখিত। 'সোম রাজন্' শব্দ বড়ই প্রচলিত ছিল। সুতরাং সোমকে অনেকে আদর করিয়া 'সোমরাজ' বলিত। বাঙ্গলা দেশে 'সোমরাজ' নামে একজাতীয় ক্ষুদ্রাবয়ব বৃক্ষ আছে। ইহার 'সোমরাজ' উপাধি কিরূপে হইল, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এই বৃক্ষের বীজ বা পত্র রোগবিশেষে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। সোমেরও রোগনিবারক গুণ ছিল। ইহাই কি বাঙ্গলায় সোমরাজের হেতু, না কোনকালে এই সোমরাজ বৃক্ষ প্রকৃত সোমের অভাবে তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত? একথা আমার স্পষ্ট জানা নাই। যাহা হউক ইদানীন্তনকালে আর সোমযাগ করিতে হইলে কেহই হিমালয় অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করেন না, কিন্তু বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে তাহাই করিতে হইত। এখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা সোমের পরিবর্ত্তে পূতিকা (পুঁইশাক) ব্যবহার করেন। তাই এখন 'সোম' শাক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যখন প্রকৃত সোম দেখি নাই, তখন পুঁই শাকের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য কি তাহা বর্ণনা করা আমাদের অসাধ্য, তবে এক প্রধান সৌসাদৃশ্য 'বর্ণ' বলিয়া বিবেচিত হয়। পুঁই শাকের ন্যায় 'সোম'ও একপ্রকার হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্ ছিল।

সোমলতার স্তুতিগায়কেরা সোমকে ভূয়োভূয়ঃ 'হরি' নামে সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন। কুতূহলী পাঠক ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডল দেখিবেন। আর সোমবল্লী হইতে যে আসব প্রস্তুত হইত, বেদে তাহারও নাম 'হরি'। এই আসব ইন্দ্র দেবতার প্রিয় পানীয় বলিয়া গণ্য। হরি প্রস্তুত হইলে ইন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারেন না; হরি যজ্ঞ স্থলে আসিয়াই অনিবার্য্য বেগে ইন্দ্রকে তথায় আকর্ষণ করিয়া আনেন, সুতরাং যজমানের ইষ্ট সিদ্ধি হয়।

এই ভাব বদ্ধমূল হইলে 'হরি' ইন্দ্রের বাহন বলিয়া ঋষি রচিত কাব্যে বর্ণিত হইতে আরম্ভ হইলেন। কোন কোন কবি তাঁহাকে একবারে অশ্ব করিয়া তুলিলেন। আবার অন্য কবি ইন্দ্রের রথে এক জোড়া 'হরি' যুড়িয়া দিলেন। সুতরাং 'হরিবাহন' ইন্দ্র কিছুকাল হরিনামক অশ্বদ্বয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে আগমন করিতে লাগিলেন।

হরি নামক সোমরস এইরূপে ইন্দ্রের অশ্বে পরিণত হইলেন; কিন্তু পিতামহগণ প্রত্যক্ষ সোমরসকেই যে কেবল সোম বলিতেন তাহা নহে—তদপেক্ষা মহীয়ান্ পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত তাঁহাদের এক পরোক্ষ দেবতা ছিল—তিনি সোমরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—তাঁহারও নাম সোম। তিনিই প্রকৃত সোমদেব এবং তাঁহারও নামান্তর হরি।

পিতামহগণ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেন। সেই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপ বা আকার সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা ও কর্ম্মের পরিচায়ক বলিয়া তাহা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সেই সেই বস্তুর পরোক্ষ বা নিরাকার অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত হইতেন। এইরূপে সাকারে নিরাকারের পূজাবিধি দ্বিজাতিসমাজে সমাদৃত হয়। দেবতা বলিলে এই বিধিতে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতা উভয় পদার্থই বুঝাইত।

বৈদিক উপাসনাতে এইরূপ সাকার দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেবতা দুইটি অগ্নি ও সোম। জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় অগ্নিতে ঈশ্বরের প্রকাশকতা, শক্তিমত্তা ও সর্ব্বব্যাপিতা যেমন জাজ্বল্যমান, মনোহরকান্তি, মাদক, বলকারক ও রোগনিবারক সোমে তেমনি তাহার সৌন্দর্য্য ও মনুষ্যের প্রতি হিতৈষিতাও জাজ্বল্যমান। প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি একটা জড় পদার্থমাত্র, প্রত্যক্ষদেবতা 'সোম' তদপেক্ষা বিস্ময়কর এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণময় পদার্থ। সুতরাং সেকালের চিন্তাশীল সাধকেরা অগ্নি অপেক্ষা সোমের মহিমা অধিক বিবেচনা করিতেন।

ইন্দ্র কি বাস্তবিকই তীব্র সোমরস চুমুক দিয়া পান করিতেন বলিয়া সেকালের ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন? কদাচ নহে।—ইন্দ্র একজন উৎকৃষ্ট নিরাকার দেবতা। ইনি পরমৈশ্বর্য্য। বাঙ্গালার 'প্রভু' বলিলে যাহা বুঝায়, ঋগ্বেদের যুগে ইন্দ্র বলিলে তাহাই বুঝাইত। কবিরা ইন্দ্রকে নানা সাজে সাজাইতেন, কিন্তু 'ব্রহ্মণ' অর্থাৎ তদানীন্তন

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নিরাকার ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন। যজ্ঞভূমিতে নিরাকার ইন্দ্র এবং নিরাকার সোম বা হরি যেরূপ মিলিত হইবে তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয় সখ্য বিদ্যমান আছে বলিয়া কোনও কোন ঋষি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে হরি ইন্দ্রের 'সখা'। হরি আসিলে ইন্দ্রও আইসেন। হরি ইন্দ্রকে আকর্ষণ করেন। যজ্ঞে অনেক সময়ে ইন্দ্র ও হরির (সোমের) যুগপৎ স্তুতিগান হইত।

ইন্দ্রের একটি বৈদিক নাম অর্জ্জুন। ইন্দ্রের আকর্ষক, বাহক, চালক ও সখা 'হরি' বেদে যেমন সুপরিচিত, পাণ্ডব অর্জ্জুনের আকর্ষক, বাহক, চালক ও সখা হরি মহাভারতের ইতিহাসে তেমনি সুপরিচিত। অর্জ্জুন নামে পাণ্ডুরাজার পুত্র কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন কি না তাহা এখানে বিবেচ্য নহে, কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণার্জ্জুন-বিষয়িণী কথায় বেদোক্ত ইন্দ্র ও হরির সম্পর্কবিষয়ক ভাব সকল যে জড়িত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

'হরি' যেমন ঋষিদের প্রধান দেবতা ছিলেন, আজিও তিনি আমাদের তেমনি প্রধান দেবতা। হরির গুণ গানের জন্য যেমন সামবেদের জন্ম—তেমনি হরির গুণগানের জন্যই আমাদের ভাষায় সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী সকল রচিত। 'মাদক' হরি চিরকালই গানের উদ্দীপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মনে করেন, যে বস্ত্রহরণ বা পাপহরণ করাই হরির 'হরিত্ব', তাহা নহে। বস্ত্রহরণ ও পাপহরণ দুইটিই আমার মতে কল্পনামাত্র। হরির হরিত্ব বাস্তবিক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের মূল।—আমাদের 'হরি' দেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন বলিয়াই 'হরি' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহীরুহ তরুলতাগণের উজ্জ্বল শ্যামকান্তিতেই ঋষিরা সর্ব্বপ্রথমে হরিকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়াছিলেন। আর আমরা যে সর্ব্বতোভাবে সে ভাব বিস্মৃত হইয়াছি, তাই বা কেমনে বলিব। অদ্যাপি ত আমরাও তুলসীতে হরিকে দেখিতে চেষ্টা করি? তবে তুলসী আর হরি নহি, হরিপ্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অগ্নির আলোক এবং উত্তাপ তরুলতাতে সঞ্চিত হইলে কিরূপে প্রাণের বিকাশ হয়, তাহা চিন্তা করিয়া ঋষিরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গদ্‌গদচিত্তে সেই প্রাণের মূলস্বরূপ পরোক্ষ 'হরি' দেবতার গুণ গানের দ্বারা বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে "মহাভারত" লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার ফলে আজ কয়েক বৎসর, এক নূতন মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। জর্ম্মাণ অধ্যাপক ডাঃ বুল্লার (Dr. Bühler) এই নূতন মতের একপ্রকার প্রথম উদ্ভাবক। তিনি মহাভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান স্মৃতিগ্রন্থগুলির ন্যায় মহাভারতখানিও একখানি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্মৃতিগ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক লাডউইগ (Prof. Ludwig) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহাভারতে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক হোলজ্‌মান (Prof. Holtzman) এই বিষয় ও তদানুষঙ্গিক বিষয় সকল আলোচনা করিয়া "মহাভারত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে" এই নামে চারিখণ্ড পরিমিত এক বৃহদায়তন পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহার পর ডাঃ ডাহল্‌মান (Dr. Dahlmann) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে *Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch* অর্থাৎ "মহাভারত আলোচনা, কাব্য ও বিধিপুস্তক" নামে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ডাহল্‌মান আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র, অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত", পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র এবং জৈনদিগের জাতকগ্রন্থ ও ধর্ম্মকথার উপাখ্যান গুলির সহিত মহাভারতোক্ত উপাখ্যান গুলির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং অন্যান্য কথার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের কাব্যাংশ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেও অতি অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান ছিল। ডাঃ ডাহল্‌মান তাঁহার পুস্তকে নানাসময়ে মহাভারতের ক্রমপুষ্টি কিরূপে ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, মহাভারতের উপাখ্যানাংশ বহুকাল হইতে একটি নীতিকথা রূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন ইহা আনুষঙ্গিক কথার সহিত মিশিয়া এরূপভাবে গঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে উপাখ্যানাংশ বাদ দিয়া নীতি কথাটুকু বাছিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া যুদ্ধদ্বারা স্বার্থসাধন করেন। অন্যায় কর্ত্তৃক ন্যায়ের উৎপীড়ন, পরে নির্য্যাতিতার জয়লাভ দেখানই এই নীতি কথাটির উদ্দেশ্য। ক্রমে এই দৃষ্টান্তটিকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইবার জন্য ইহাতে উত্তরকালে নানাবিধ গল্প প্রবেশ করিয়াছে। নায়ক যুধিষ্ঠির দুর্দ্দশায় অধীর হইয়া না পড়েন, এজন্য কোন কবি নলোপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য শকুন্তলোপাখ্যান, আসুর বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য মাদ্রী, লক্ষণা, সুভদ্রা, অম্বা ও অম্বালিকা হরণ ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। হয়ত এইরূপে নিয়োগপ্রথা দ্বারা সন্তানোৎ-

"মহাভারত" সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নূতন মত।

পাদনের বৈধতা প্রমাণের জন্য পরাশর কর্তৃক সত্যবতীর, ব্যাস কর্তৃক অম্বালিকার ও দেবগণ কর্তৃক কুন্তিমাত্রীর পুত্রলাভের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্ম্মের পোষকতায় দার্শনিক তত্ত্ব ও নানাবিধ উপাখ্যানাদি সৃষ্ট হইয়াছে। ডাঃ ডাল্হমান আরও বলেন যে দ্রৌপদীর স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। অবিভক্ত ঐশ্বর্য্য অবিসম্বাদে কিরূপে ভ্রাতৃগণ ভোগ করিতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য পত্নীরূপে দ্রৌপদীর চিত্র কল্পিত হইয়াছে। অধ্যাপক হোল্ৎস্‌মান "দুর্য্যোধন" নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভ্রম করিয়া এক সিদ্ধান্ত করেন যে কৌরব বিদ্বেষীরা অত্যধিক পাণ্ডবপ্রীতিহেতু মহাভারতের ইতিহাসাংশে বিস্তর জটিলতা ঘটাইয়াছে। তাঁহার মতে "দুর্য্যোধন" শব্দের অর্থ দুষ্ট অর্থাৎ কুৎসিত যোদ্ধা, কিন্তু বাস্তবিক উহার অর্থ 'দুঃখে না বহু আয়াসেও যাহাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না।' অত্যধিক পাণ্ডবপ্রীতি হইতেই পাণ্ডবপক্ষে অতিমাত্র সততা নানাবিধ জটিল বিধি নিষেধাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু ডাঃ ডাল্‌হমান অধ্যাপক হোল্ৎস্‌মানের এই মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। অধ্যাপক লাড্‌উইগ মহাভারতের ঐতিহাসিকতার অভাব সম্বন্ধে যে কথা বলেন, ডাঃ ডাল্‌হমান তাহাই স্বীকার করেন মাত্র। অধ্যাপক লাড্‌উইগ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহাভারত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন, পঞ্চপাণ্ডব গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত এই পঞ্চ ঋতুর রূপক মূর্ত্তি, দুর্য্যোধন শীত ঋতু, দ্রৌপদী পৃথিবী, যুদ্ধাদি ঋতু-পরিবর্ত্তনসূচক পার্থিব পরিবর্ত্তন এবং পাশক্রীড়ায় অক্ষপাটিগুলি শীত-ঋতুসঞ্চারক নাক্ষত্রিক অবস্থান ও ক্রীড়ায় জয় পৃথিবীতে শীতাবির্ভাব ইত্যাদি।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে পণ্ডিত বামন শাস্ত্রী ইসলামপুরকর যে পরাশর-ধর্ম্মসংহিতা প্রকাশ করেন, তাহার প্রথম খণ্ডের ৭ম পৃষ্ঠায় এক অপূর্ব্ব সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের শেষ তেইশটী অধ্যায় পাওয়া যায় নাই। কি যুরোপ, কি ভারতবর্ষ, যেখানে যতগুলি মহাভারত এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই ঐ তেইশটী অধ্যায় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশেও প্রবাদ আছে, লক্ষশ্লোকী মহাভারত আর এখন পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মলয়ালম্ অক্ষরে লিখিত অতি প্রাচীন একখানি মহাভারতের পুঁথিতে ঐ তেইশটি অধ্যায় আছে, এবং বৃদ্ধ গৌতম স্মৃতি নামে কথিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেও তিনি উহা দেখিয়াছেন।

মহাভারতের লুপ্তাংশ প্রকাশ।

অধ্যাপক বুহ্লার বলেন, মহাভারতের যতগুলি টীকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনখানি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু মনুর যতগুলি টীকা পাওয়া যায়, তাহার প্রাচীনখানি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে লিখিত।

প্রাচীন টীকা।

মহাভারতের কাল।

অধ্যাপক জ্যাকোবি সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গতঃ মহাভারত-রচনা-কালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যে মহাভারতকে যতই কেন প্রাচীন বলিয়া কল্পনা করা হউক না, কিছুতেই তাহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থ তিনি বলেন যে, মহাভারত মধ্যে শক বা যবনজাতীয় কেহই পঞ্জাববাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই অথবা পঞ্জাবে বৌদ্ধ বা পারসিক প্রভাবের কোন কথার ও উল্লেখ তাহাতে নাই। অধ্যাপক জ্যাকোবি বা ডাহ্ল্‌মানের মত সমীচীন নহে। বৌদ্ধ প্রভাবের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভারতেতিহাস প্রচারিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরাণ কতকালের এবং তৎসম্বন্ধে য়ুরোপীয় মতামত।

য়ুরোপীয়গণের সংস্কৃতচর্চ্চার প্রসাদে আজকাল আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে নানারহস্য প্রকাশিত হইতেছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতেরা বহুদিন আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুদিগের পুরাণ নামে খ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনখানিই সহস্র বর্ষের অধিক প্রাচীন নহে। ডাঃ বুহ্লার তাঁহার আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে যে পরিশোধিত ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন, তৎপাঠে এই পুরাণ শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এই জর্ম্মাণ অধ্যাপক ইংরাজ অধ্যাপকের মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, হিন্দুদিগের পুরাণশাস্ত্র সহস্রবর্ষ অপেক্ষা বহু প্রাচীনকালের, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ করা যায়। "হর্ষচরিত"-প্রণেতা বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার হর্ষচরিতে পবনপ্রোক্ত পুরাণের কথার উল্লেখ আছে। বাণভট্টের 'পুস্তকবাচক' (পুস্তকপাঠক) এই "পবনপ্রোক্ত পুরাণ" তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত"-প্রণেতা ব্রহ্মগুপ্ত খৃষ্টীয় ৬২৮।২৯ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠে সহজেই বুঝা যায়, তাহার অধিকাংশই "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ" হইতে রূপান্তরিত অবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। বাণভট্টের "চণ্ডিকাশতক" ও তাঁহার সমসাময়িক ময়ূরভট্টের "সূর্য্যশতক"ও পুরাণ হইতে গৃহীত বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "চণ্ডিকাশতক" মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের এবং "সূর্য্যশতক" সৌরপুরাণান্তর্গত অধ্যায় বিশেষের প্রতিচ্ছবি বলিলেই হয়, সুতরাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্যূন ১২শত বৎসর পূর্ব্বে যে "বায়ু," "মার্কণ্ডেয়" ও "সৌর" পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, তাহা বলিতে আর কোন বাধা থাকিতেছে না। এতদ্ভিন্ন ডাঃ বুহ্লার আরও দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত "বিজ্ঞানেশ্বরের" মিতাক্ষরা, দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত অপরার্কের "যাজ্ঞবল্কীয় ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ" এবং হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থে পুরাণবচনের উদ্ধার দেখিতে পাওয়া যায়। অলবীরুণি ১০৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতেতিহাস রচনা করেন, তাহাতে "আদিত্য," "বায়ু," "মৎস্য," "বিষ্ণু" ও "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য "দশাবতারচরিত" রচনা করেন। এই সকল শেষোক্ত প্রমাণ যদিও ইংরাজ অধ্যাপকের কথিত কালের বিরুদ্ধ হইতেছে না, তবুও তাহার স্বপক্ষে বিশেষ বলবত্তর প্রমাণ নহে। শ্রীহর্ষ ও ক্ষেমেন্দ্রের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যও স্মৃতিবচন বলিয়া মার্কণ্ডেয়-পুরাণের কতিপয় প্রমাণ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে হিন্দুর পুরাণশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল। শঙ্করাচার্য্যের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কুমারিলভট্টের গ্রন্থেও পুরাণের কথা আছে। তন্ত্রবার্ত্তিকের একস্থলে কুমারিল পুরাণ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে পুরাণশাস্ত্র পৃথিবীবিভাগ, বংশানুক্রম, দেশকাল-পরিমাণ ও ভাবীকথন প্রধানতঃ এই চারিভাগে বিভক্ত। তন্ত্রবার্ত্তিকোক্ত পুরাণ লক্ষণের সহিত এখনকার বৃহৎ পুরাণগুলির অনৈক্য নাই বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ডাঃ বুহ্লার দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে (স্মৃতি গ্রন্থাদিতে) "পুরাণোক্ত" বলিয়া অনেক উদ্ধৃত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল স্থানে পুরাণের নামোল্লেখ থাকে না। তিনি আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র হইতে এইরূপ দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহার একটি ভবিষ্যৎপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটি সম্বন্ধে আপস্তম্ব উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অপর শ্লোকটি উদ্ধারের সময়ে আপস্তম্ব কেবলমাত্র "পুরাণবচন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ বুহ্লার অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই দুই শ্লোকের প্রত্যেক পাদ অবিকৃত ভাবে একই অর্থে বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ঐ দুই শ্লোক সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় ও পদ্মপুরাণে ঐ দুই শ্লোক কিছু রূপান্তরিতভাবে উল্লিখিত আছে। এই সাদৃশ্য দ্বারা ডাঃ বুহ্লার আরও দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মসূত্রাদিতে "পুরাণোক্ত বচন" এরূপ অনামা পুরাণের উল্লেখ যাহা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা এ অনুমান একান্ত অসঙ্গত নহে যে, পূর্ব্বে পুরাণশাস্ত্র নামে যে গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতেই বৈদিক ধর্ম্মসূত্রাদিতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদুক্ত বিধি নিষেধাদিই উত্তরকালে স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। ডাঃ বেবারও (Dr. Weber) তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বে পুরাণনামে প্রসিদ্ধ এক শ্রেণীর শাস্ত্র ছিল, যাহা মন্থন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থকর্ত্তাদ্বারা বর্ত্তমান পুরাণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ডাঃ বুহ্লার এ সম্বন্ধে আরও বলেন, যে বর্ত্তমান পুরাণগুলি যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, তাহা বাণভট্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও সহজে প্রমাণ করা যায়। বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভবিষ্য রাজগণের নামের তালিকা প্রায়ই গুপ্তসম্রাট্ ও তাঁহাদের সমসাময়িক রাজগণের নামোল্লেখ করিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা হইতেও ডাঃ বুহ্লারের পোষক প্রমাণ অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় কবি কৃষ্ণরাম প্রণীত "রায়মঙ্গল" কাব্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বড় খাঁ গাজী" নামে এক মুসলমান পীরের কথা আছে। এই গাজী সাহেবের বিবরণ প্রবন্ধ লেখক আরও একটু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সংক্ষেপতঃ তাহাই এই স্থানে বিবৃত হইল।

পীরবুড়া খাঁ গাজী।

"টাকীর জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জমীদারী মধ্যে দক্ষিণে আবাদী নামে এক স্থান আছে। ইহা জামীরা পরগণার অন্তর্গত। এই আবাদীতে পীর বুড়া খাঁর কবর আছে। বুড়া খাঁর সহিতও দেবতা দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ হইয়াছিল, পরে বন্ধুত্ব হয়। এই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি যে, পীরবুড়া খাঁ রায়মঙ্গলের বড় খাঁ গাজী হইতে পারেন। আবাদীতে প্রবাদ এই যে, বুড়া খাঁই সর্ব্বপ্রথমে জামীরা পরগণা আবাদ করিয়া তাহাতে লোক বাস করান। আবাদে প্রথম দিন বুড়া খাঁ বনে সর্ব্বপ্রথমে একটি জামীর নেবু প্রাপ্ত হন। এই প্রথম প্রাপ্ত ফল হইতে তিনি নব আবাদী পরগণার জামীরা নাম রাখেন। আবাদ হইয়া গেলে, ইনি ওখানে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করেন। বুড়া খাঁর পুত্রের নাম ফতে খাঁ। প্রথম বন আবাদের সময় বুড়া খাঁ দুইটি শালিক পাখীর শাবক প্রাপ্ত হন। এই পাখী দুটিকেও তিনি প্রতিপালন করেন। এই পাখী দুটি এত পোষ মানিয়াছিল যে ইহাদিগকে খাঁচায় রাখিতে হইত না। ইহারা স্বেচ্ছামত [illegible] চরিয়া বেড়াইত, আবার আসিত। যখন আবাদ শেষ হইল, প্রজা বসিল, তখন ন[illegible] বুড়া খাঁর নিকট কর চাহিলেন।

ফতেখাঁ কর লইয়া নবাব-সরকারে গমন করিলেন। যাইবার সময় ফতেখাঁ একটি শালিক লইয়া গেলেন, এবং পিতাকে বলিয়া গেলেন, 'যদি আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে শালিক ফিরিয়া আসে, তবে জানিবেন যে আমার মৃত্যু হইয়াছে, তখন যথা-কর্ত্তব্য করিবেন।'

কিছুদিন পরে দৈবগতিকে শালিক ফিরিয়া আসিল। তখন বুড়া খাঁ পুত্রশোকে অধীর হইয়া নিজে জীবিতাবস্থায় কবরস্থ হইবার মনন করিলেন। কবর খোঁড়া হইল। বৃদ্ধের ত্রয়োদশ জন সর্দ্দার ছিলেন। ইহারা "তের ইয়ার" নামে খ্যাত। বুড়া খাঁ ইহাদিগকে লইয়া একদিন প্রাতঃকালে কবরে প্রবেশ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়া কবরস্থানে উপনীত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই ফতেখাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুড়া খাঁ আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, 'যাহা হউক তুমি ধন সম্পত্তি ভোগ কর, যে কারণেই হউক, এখন আর আমার পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।' এই বলিয়া তিনি জীবিতাবস্থায় স্বেচ্ছায় কবরস্থ হইলেন। ফতেখাঁ এরূপ পিতৃবিয়োগে কাতর হইয়া বিষয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনিও জীবিতাবস্থায়

কবরস্থ হইলেন। শালিক পাখী ছুটিও সেইখানে আসিয়া যেন কালপ্রেরিত হইয়াই মরিল। ত্রয়োদশ জন সর্দ্দার প্রভু ও তৎপুত্রের মৃত্যুতে সংসার অসার জানিয়া সেই স্থানেই লীলা সম্বরণ করিল। প্রভুদিগের প্রতি তাহাদের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া ভগবান তাহাদিগকে [illegible]রূপে গলাইয়া দিলেন। ইহাই "তেরোয়াঁর" নদী। ইহারা জীবিতাবস্থায় স্বেচ্ছায় কবরস্থ [illegible] পীর নামে খ্যাত হইলেন। তদবধি এখানে মুসলমানেরা হাজত ও ভোগ দিয়া থাকে। জাহিরা পরগণার পূর্ব্ব জমীদার চৌধুরীরা এই পীরের আস্তানার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কয়েকখানি গ্রাম লাখেরাজ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যাহারা ইহার সেবাইত, তাঁহাদের আর সে পূর্ব্ব সম্পত্তি নাই, অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পীরের গোরের উপর একটি গোলোকচাঁপা (গুলাল চাঁপা) ফুলের গাছ আছে। এই গাছে এক সময়ে বটের জটায় [illegible] একটি আশ্চর্য্য রকমের ফল হয়। এই ফল দেখিতে লোকসমাগম হয়। দর্শকেরা ফল দেখিয়া আস্তানার ফকীরের কথামত মুক্ত হইয়া মানস সিদ্ধির জন্য এখানে সীরণি দেয়। কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে এই স্থানের মহিমা ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে প্রতি ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই আস্তানায় যাত্রী আসিতে লাগিল। প্রতি বৎসরে এখন সেই সময় এখানে একটি প্রকৃত মেলা হয়। শুনা যায়, যাত্রীরা মানস করিয়া এখানে সীরণি দিতে আসিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা বৃক্ষ হইতে নব পুষ্প পতন দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সময় গাছে ফুল হইবার কথা নহে, সে সময়ও অনেক যাত্রীরা মানস সিদ্ধির অনুকূল টাটকা ফুল পাইয়া থাকে। এই পীরের ফ[illegible] 'সা সাহেব' নামে কথিত হন।"

দ্বিতীয় মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৭।৬ই জুন) তারিখে রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে পরিষৎ-কার্য্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু (সহ-সম্পাদক)।

অধিবেশনের আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "ছাতনার ইষ্টক-লিপি"-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ। ইষ্টক লিপি সভাস্থলে প্রদর্শিত হইবে।

৪। অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্ম-মঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

৬। বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

সম্পাদক বিগত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে কার্য্য বিবরণের এক স্থানে 'উঠাইয়া লইলেন' এইরূপ লিখিত হইয়াছে, উহার পরিবর্ত্তে "প্রত্যাহার করিলেন" এইরূপ লিখিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে সভাপতি মহাশয়ের উক্তির বিবরণ সম্বন্ধে

Positive শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই স্থানে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া কোন বাঙ্গলা প্রতি শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কার্য্য বিবরণ অনুমোদিত হইল।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। নিম্নে যথাক্রমে, প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত সভ্যের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, এম এ, বি এল। (এটর্ণি)
২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র।
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৫। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মল্লিক।	শ্রীযুক্ত বনকৃষ্ণ সেন, বি এ।
৬। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৭। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, বি এ।
৮। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।
১০। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
১১। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ।	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে বি এল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'ছাতনার ইষ্টক লিপি' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুকে প্রবন্ধ পাঠের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে পঠিত প্রবন্ধের সহিত ঐতিহাসিক বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প। কিন্তু আশা করা যায় যে ঐ জাতীয় আলোচনার ফলে ও রাজপুরুষদিগের যত্নে ভবিষ্যতে ইতিহাসের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে প্রবন্ধের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহিত তাঁহার মত ভেদ আছে। ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর এ মত তিনি স্বীকার করেন না। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে শূন্য শব্দের ব্যবহার দেখিয়াই যে বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতাবাদ বুঝিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহা হিন্দু দার্শনিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শূন্যতাবাদ অর্থাৎ (Nothing) হইতে সৃষ্টিপ্রণালীবাদও বুঝাইতে পারে। ফলকথা এরূপ একটী শব্দ

হইতে মত বিশেষের অনুমান তাদৃশ যুক্তি সঙ্গত নহে। পরন্তু ধর্ম্মমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশ গুলি তাদৃশ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক নহে এবং প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ভাষাগত দোষ দৃষ্ট হইল। তাঁহার মতে প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার যোগ্য নহে। তবে সমবেত সভ্যবর্গ যেরূপ বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, যে সভাপতি মহাশয় যে অভিনবগুপ্তের উল্লেখ করিলেন, তিনি প্রথমে শৈব থাকিলেও শেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশ এরূপ নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই। প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অনুমান করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সম্পাদক বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠে পত্রিকার পাঠক আনন্দ ও উপকার লাভ করিবে। প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে প্রবন্ধের মূল্য অল্প নহে। তাঁহার জ্ঞানমতে শূন্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের একটী বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মপূজার ঐতিহাসিক মূল শূন্যবাদের আলোচনা এ সকল পরিষদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে যখন কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি যাহা জানেন বলা ভাল। তাঁহাদের গ্রামে ধর্ম্মের মন্দির আছে। ধর্ম্মের পূজক জাতিতে কুম্ভকার বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরাও ধর্ম্মপূজায় বিশেষভাবে যোগদান করে। তাঁহার বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের এমন কিছুই নাই, যাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই, শূন্যতাবাদও হিন্দুদর্শনে পাওয়া যায় না এরূপ নহে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধোক্ত ধর্ম্মপূজার বিবরণ শুনিয়া বোধ হইল যেন ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার আলোচনায় সাহিত্যের উপকার হইতে পারে। শূন্যতাবাদ হিন্দুদর্শনেও আছে।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শৈশবে তিনি বীরভূম জেলায় ধর্ম্মপূজা দেখিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের নিকট অনেকরূপ বলি দিবার প্রথা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র "অহিংসা," সেইজন্য মনে হয়, ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যমরাজকে ধর্ম্মরাজ বলে। তাঁহার বোধ হয়, ধর্ম্মপূজা যমের পূজা। ধর্ম্মের নিকট লোকে রোগ শান্তির জন্য মানসিক করে। তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় বলিলেন, যে বন্দীপুরের শ্যামরায় ঠাকুরের উল্লেখ হইয়াছে, তিনি সেই বন্দীপুরের রায়-বংশধর। বন্দীপুরে উচ্চবর্ণও ধর্ম্মপূজায় যোগ দান করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও তান্ত্রিক দল আছে। তাহাদের মধ্যে মদ্যপান, শূকর ভোজন প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত আছে।

শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যে তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মপূজা কেন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হইল? ধর্ম্ম কেন নীচগামী হইলেন? তাহার বিবরণ খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই পুস্তক তিনি প্রকাশ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু বলিলেন যে প্রবন্ধের ভাষা স্থানে স্থানে সংস্কৃত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার অনেক কথা না বুঝিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্রব আছে, এ মত শাস্ত্রী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে মত বিশেষভাবে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অভিপ্রায় যে এরূপ তাহা বুঝা যায়। যে যুক্তি বলে শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সংস্রব প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাহা যুক্তি সিদ্ধ নহে। শূন্যতাবাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা অনেকে বুঝেন নাই। শূন্যতাবাদীরা Matter ও Mind (জড় ও চিৎ) এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না, কারণ তিনি নিজ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে "শূলীকে" (মহাদেবকে) নমস্কার করিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে উহার ভাষা গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট। সেই জন্য তিনি উহার পত্রিকায় মুদ্রণ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন। ভাষা সংস্কৃত করিলে তাঁহার আপত্তি থাকিবে না। মৌলিকতা অথবা গবেষণার পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধের কোন অনাদর করেন নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন প্রবন্ধ কি ভাবে মুদ্রিত হইবে, তাহার ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত হউক। ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদকের প্রস্তাবমতে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন মহাশয়গণ কৃত্তিবাস সমিতির সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবমতে যাঁহারা বিগত অধিবেশনের পর পরিষদে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। উপহারদাতার ও উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল।

১ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল—কোঁহিং। ২ শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন—লোহকাঞ্চনী (শ্রীমতি মানকুমারী রচিত)। ৩ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মজুমদার—রূপরাজ্য, সাহিত্য ও সমাজ।

অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

অনুমোদিত

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ২৮শে আষাঢ়।

তৃতীয় মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৮শে আষাঢ় (১৮৯৭। ১১ জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় পরিষৎ কার্য্যালয়ে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দত্ত এফ এইচ্ সি এস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, কুমার দেবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক) ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ (সহ-সম্পাদক)।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে ও সভ্যবর্গের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

৪। পত্রিকার নাম পরিষদ্-পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৬। বিবিধ বিষয়।

১। সম্পাদক বিগত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে উহা অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহাশয়গণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে যথাক্রমে প্রস্তাবক, সমর্থক ও নির্ব্বাচিত সভ্যের নাম প্রদত্ত হইল।

	প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল।
২।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪।	শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

৩। অতঃপর নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্যের আলোচনা হইল।

(ক) সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সহ-সম্পাদকের সমর্থনে স্থির হইল যে পরিষদের দুই জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নিয়মাবলীর ২য় ধারায় এইরূপ যোগ হউক 'সাধারণতঃ' দেশের শিল্প-শিক্ষার ও বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজন মত কার্য্য করা।

শ্রীব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(গ) শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ধারায় এইরূপ যোগ হউক। 'কোন ব্যক্তি বিশেষ বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি-সাধন বা সহায়তা করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ বা উপাধি দান।'

'কোন স্বদেশীয় ব্যক্তি যদি স্বদেশে বা বিদেশে বিদ্যার জন্য সম্মান লাভ করেন, পরিষদ্ সভায় তাঁহার জন্য আনন্দ প্রকাশ।'

সমর্থকের অভাবে উক্ত প্রস্তাব আলোচিত হইল না।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভাষা ও সাহিত্য ভিন্ন অন্য আলোচনা পরিষদের উদ্দেশ্যের বিষয়ীভূত নহে এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন যে একভাবে সকল শাস্ত্রই সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত বটে, কিন্তু সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা অত্যন্ত কঠিন এবং উদ্দেশ্য সংকীর্ণ করিলে পারদর্শিতা অধিক হইবার সম্ভাবনা। লুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার সাধন, বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ভাষান্তরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্যেই পরিষদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করা উচিত। বিলাতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ সভা সমিতি আছে। আমাদেরও ঐরূপ হওয়া উচিত। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, ২য় ধারার (ঙ) অংশ উঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে ২য় ধারায় (ঙ) অংশ থাকাই উচিত। যশদেশ বিলাত নহে। এখানে কোন বিষয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা হইবার সম্ভাবনা নাই।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে উক্ত (ঙ) অংশে "সাহিত্যের" পর "পুষ্টি ও প্রচার উদ্দেশ্যে তৎ তৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ" এইরূপ যোগ করা উচিত।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় যতীন্দ্রবাবুর সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানের প্রচলন না থাকাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এ সময়ে পরিষদ্ হইতে বিজ্ঞানের চর্চা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার মতে পরিষদের উদ্দেশ্য সংকোচ করা উচিত নহে। নানা সভ্য নানা বিষয় জানেন। যিনি যাহা জানেন, তিনি তাহারই বিষয় আলোচনা করিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। এরূপ হইলে সকল সভ্যের শক্তি-প্রয়োগের অবসর হইবে এবং সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনার ফলে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। পরিভাষা সংকলনের জন্য যতটুকু করিব, অধিক করিব না, এরূপ সংকোচের কোন হেতু দৃষ্ট হয় না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বিলাতে যে প্রণালীতে কাজ হয়, তাহা এদেশে করিতে পারিলে ভালই হয়। কিন্তু এরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পরিষদ্ যে প্রণালীতে গঠিত, তাহাতে একটী মাত্র কাজে সময় ও শক্তিক্ষেপ করা সঙ্গত বা সম্ভব নহে। আমরা বিশেষজ্ঞ (Specialist) লইয়া সভা গঠিত করি নাই। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই সভ্য হইতে পারেন। উদ্দেশ্য সংকোচ করিলে অনেক সভ্য খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। আমাদের শিক্ষা কোন বিষয় বিশেষে (Special Study) যায় নাই। বিলাতে গিয়াছে। সেই জন্য বিলাতে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Specialist) পাওয়া যায়। নানা রুচি নানা প্রবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য লইয়া গঠিত পরিষদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত নহে।

সভাপতি মহাশয় যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব বিষয়ে মত গ্রহণ করিলেন। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এ অধিবেশনে স্থগিত থাকুক। পরবর্ত্তী রবিবার পুনরধিবেশনে এই অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৩১শে শ্রাবণ।

তৃতীয় মাসিক স্থগিত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

তৃতীয় অধিবেশনের নির্দ্ধারণ মতে বিগত ৩রা শ্রাবণ (১৮৯৭, ১৮ই জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়েপাঁচ ঘটিকার সময় পরিষৎ কার্য্যালয়ে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল।

উক্ত অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে যে বিষয়-সমূহের আলোচনা স্থগিত ছিল, তাহারই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছিল। নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

২। পত্রিকার নাম পরিষদ পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৩। অন্যতম সহ-সম্পাদক নিয়োগ।

৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কুমার ক্ষেমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি এল, শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ (সহ-সম্পাদক)।

১। নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির বহু আলোচনা হইল।

(ক) সম্পাদক, পরিষদ্ কোনরূপ সমালোচনা করিবেন না, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ও সম্পাদক প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে দ্বিতীয় ধারার (চ) অংশে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্মতি ভিন্ন এই শব্দগুলি পরিত্যক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় সম্বন্ধে মত গ্রহণ করিলেন।

রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব অথবা শরচ্চন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

এ বিষয়ে নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে ৯ম ধারায় "ব্যক্তি" শব্দ স্থলে "পুরুষ" শব্দ প্রযুক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর প্রস্তাবক মহাশয় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে কোন সভ্যের নির্ব্বাচন প্রস্তাবিত হইলে, সেই প্রস্তাব সকল সভ্যের গোচর করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহার বিচার হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এবং সম্পাদক উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(ঘ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে নবম ধারার পর এইরূপ যোগ করা হউক, যথারীতি নির্ব্বাচনের পর, নির্ব্বাচিত সভ্যের নিকট সম্পাদক তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ ও তৎসহ প্রচলিত নিয়মাবলী একখণ্ড পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ঙ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন উক্ত ধারার পর এইরূপ যোগ করা হউক 'নির্ব্বাচিত সভ্য তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ প্রাপ্তির একমাস মধ্যে প্রবেশিকা ও প্রথম মাসের চাঁদা প্রদান না করিলে তিনি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন না এবং সভ্যের কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না'।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর প্রস্তাবক মহাশয় "ও প্রথম মাসের চাঁদা" এই শব্দগুলি প্রত্যাহার করিলেন। এইরূপে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(চ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ১০ম ধারার সভ্য শব্দের পূর্ব্বে "সাধারণ" শব্দ যোগ হইল।

(ছ) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদে বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পরিত্যক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, বিশিষ্ট সভ্য মহাশয়দিগের উচিত, পরিষদ্‌কে অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা এবং পরিষদের উন্নতিকল্পে অধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করা।

সম্পাদক প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(জ) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা দ্বাদশ জনের অধিক হইবে না।

(ঝ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে কেহ বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উক্ত বিষয়ে "ব্যালট" (Ballot) দ্বারা মত গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ঞ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, গ্রন্থরক্ষকও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(ট) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ২২শ ধারার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে "তাহা" শব্দের পর "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সহ" এইরূপ যোগ হইবে।

(ঠ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, ৩৩ক ধারার আরম্ভে "আবশ্যক মত" এইরূপ যোগ হইবে।

(ড) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সমূহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সমর্থকের অভাবে উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা হইল না।

নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। পরিষদের পত্রিকার নাম পরিষদ্-পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে, সম্পাদক বলিলেন যে, প্রস্তাবকারী মহাশয় এবং যিনি গত অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে

অন্যতরটি সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভায় উপস্থিত নাই। অতএব উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা সেদিন স্থগিত রাখিলে ভাল হয়। উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের অধিকাংশের অভিপ্রায়ানুসারে রজনীবাবুর প্রস্তাব এই ছিল যে, পত্রিকার নাম পরিষৎ পত্রিকা না হইয়া পরিষদ্-পত্রিকা হয়। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ এবং সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

৩। সহ-সম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সম্পাদকের সমর্থনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের অন্যতর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে পরিষৎ পত্রিকাতে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

৫। (ক) গ্রন্থরক্ষক মহাশয় নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহারদাতা মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করিলেন, তাহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল—প্রয়াগ।
„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রাবণী।

(খ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত মহাশয়গণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	পণ্ডিত দ্যুতি তর্কভূষণ।

পরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক। — শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৩১শে শ্রাবণ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ৩১শে শ্রাবণ (১৮৯৭। ১৫ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার দিয়র রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল।"

(খ) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু—"মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়।"

৪। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে দুইজন সভ্য-নিয়োগ।

৫। শাখা-সমিতি সমূহের সম্পাদকগণ নিয়োগ।

৬। ব্যাকরণ বিষয়ে শাখা-সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৭। বিবিধ বিষয়।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরীজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি এল, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ (সহ-সম্পাদক)।

(১) সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও অনুমোদনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত সভ্যের নাম লিখিত হইল।

প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল।
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি।	শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ।
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।	শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, নাজির।
৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন।

	প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
৭।	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দত্ত।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	ডাক্তার বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, এম বি।
৮।	পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কবিভূষণ।
৯।	শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি।	পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।

৩। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বিষয় (প্রবন্ধ পাঠ) ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ আলোচ্য বিষয়ের পর আলোচিত হইল।

৪। সম্পাদকের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

৫। সম্পাদকের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শাখা সমিতি সমূহের সম্পাদকগণ নিযুক্ত হইলেন। যথা—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পারিভাষিক সমিতি ও উদ্ভিদ্ সমিতি এবং রাম-মোহনের রামায়ণ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীদাসী মহাভারত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসী-রামায়ণ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৬। সম্পাদক, ব্যাকরণ বিষয়ক শাখা-সমিতি নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, ভাষার উন্নত অবস্থা উপস্থিত হইলে, ব্যাকরণ সঙ্কলিত হওয়া উচিত, বঙ্গভাষার এখনও সে অবস্থা আইসে নাই। অতএব এখন ব্যাকরণ-সমিতি গঠিত হওয়া সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, কুঞ্জলাল রায়, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ব্যোমকেশ মুস্তফি এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ রজনীবাবুর প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ পাণিনি ও মুগ্ধবোধের অনুবাদ মাত্র। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। অধিকাংশের মতে রজনীবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল। অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি মতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ ব্যাকরণ-শাখা-সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইলেন—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত (সম্পাদক)।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে বিদ্যানিধি মহাশয়, লেখক মহাশয় কৃত জয়ানন্দের কাল-নির্ণয়ের অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। তিনি একমনে শুনিয়াছেন। জয়ানন্দের সম্পূর্ণ পুঁথি তিনি দেখেন নাই। Asiatic Societyর পুস্তকালয়ে "বৈরাগ্য খণ্ড" মাত্র দেখিয়াছেন। ঐ খণ্ডে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিয়া কহিয়া সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক, এক স্থলে প্রদ্যুম্নমিশ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'শূদ্রাহ্নিকাচার' নামে এক চারিশত বৎসরের পুঁথি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তাহার লেখকও প্রদ্যুম্নমিশ্র, বোধ হয় তিনিও প্রবন্ধোক্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র, একই ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, জয়ানন্দের পুঁথি পত্রিকায় মুদ্রিত করা হউক। সভাপতি মহাশয় ইহার সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এই মতই সভায় অনুমোদিত হইল।

৭। প্রস্তাবক মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস—সিংহল-বিজয়।

(২) „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রাকৃতিক বিজ্ঞাপনের স্থূল মর্ম্ম।

(৩) „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজা হরিশ্চন্দ্র।

(৪) „ অচ্যুতচরণ চৌধুরী—হরিদাস ঠাকুরের জীবনী।

পরিষদ্ নিম্নলিখিত ৫ জন মৃত সভ্যের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

৺ গোঁসাইদাস গুপ্ত, চারুচন্দ্র সরকার, সুরেন্দ্রনাথ রায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে ৺ গোঁসাইদাস গুপ্ত ও ৺ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্তজীবনী পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক। | শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৪ঠা আশ্বিন।

৪র্থ ভাগ।] ৪র্থ সংখ্যা।]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

উপসর্গের অর্থ-বিচার।

কি বাঙ্গালি—কি ইংরাজি—আর্য্যজাতীয় ভাষা-মাত্রেরই সংগঠনে উপসর্গ-নিচয়ের সবিশেষ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। উপসর্গের গুণেই এক এক মূল শব্দ হইতে বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দ আবির্ভূত হয়; আর, উপসর্গের গুণেই বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দ নানাপ্রকার সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া, পরস্পরের ছায়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। কেবল মাত্র উপসর্গের অধিষ্ঠান প্রভাবে 'কৃতি' এই একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইতে কত শব্দই বাহির হইয়াছে;—প্রকৃতি, বিকৃতি, আকৃতি, ব্যাকৃতি, সংস্কৃতি, উপকৃতি, অপ-কৃতি, অনুকৃতি, প্রতিকৃতি, নিষ্কৃতি, নিরাকৃতি, সুকৃতি, দুষ্কৃতি,—এতগুলা সন্তান সন্ততি বাহির হইয়াছে! সকলেই স্ব স্ব প্রধান! অথচ আবার খুঁজিলে উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্র সহজেই ধরা পড়ে; কিন্তু খুঁজিবার প্রণালী আছে। এলোমেলো রকমে খুঁজিলে লাভের মধ্যে কেবল কতকগুলা কল্পনা-মূলক আনুমানিক সিদ্ধান্ত সত্যের বেশ ধরিয়া অনুসন্ধাতাকে ছলনা করে; তিনি সে গুলিকে ঠাহরা'ন প্রকৃত সত্য, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা দেখিতে পায় যে, তাহা সত্যের ভাণমাত্র।

উপসর্গ-গ্রস্ত শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার প্রধান উপায়—উপসর্গের নিজের অর্থ কি তাহা স্থির করা। বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়েরা ঠিক্ তাহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁহাদিগকে কোনো একটি উপসর্গের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা সেই উপসর্গ-বিশিষ্ট বিশেষ একটি শব্দকে সেই উপসর্গের অর্থ-বেশে সাজাইয়া আনেন। সেই সাজানো অর্থের গোড়াতেই যে, সেই উপসর্গটি স্বয়ং বিরাজমান, এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। বালক সন্দেশ চাহিতেছে, অথচ ঘরে সন্দেশ নাই, এরূপ

স্থলে ধাত্রী যেমন বালকের হস্তে একখণ্ড চিনির ডালা দিয়া বলে 'এই নেও সন্দেশ', তেমনি কোন বালক উপসর্গ-গুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, পণ্ডিত মহাশয় বলেন

প্র কি? না প্রকৃষ্টরূপে,
বি কি? না বিশেষরূপে,
সং কি? না সম্যক্‌রূপে ইত্যাদি ইত্যাদি

বিষম খলচক্র।

(১) প্র কি? না প্রকৃষ্টরূপে
(২) প্রকৃষ্ট কি? না প্র পূর্ব্বক কৃষ্ট
(৩) অতএব এটা স্থির যে, প্রশব্দের অর্থ প্র পূর্ব্বক কৃষ্টরূপে।

ইহারই সহোদর ভ্রাতা আর একটি এই:—

(১) ঘোড়া কি? না ঘোড়ার গাড়ী।
(২) ঘোড়া'র গাড়ী কি? না ঘোড়া পূর্ব্বক গাড়ী।
(৩) অতএব এটা স্থির যে, ঘোড়া শব্দের অর্থ ঘোড়া-পূর্ব্বক গাড়ী।

পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং যখন বলিতেছেন যে প্র-উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে, তখন, একজন যদি বলে যে, ঘোড়া শব্দের অর্থ ঘোড়ার গাড়ী, তবে তাহার অপরাধ কি?

প্র কিনা প্রকৃষ্টরূপে, বি কিনা বিশেষরূপে, সং কিনা সম্যক্‌রূপে, এ সকল ছেলে-ভুলানিয়া কথায় যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা থাকুন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, উপসর্গ-গুলির প্রকৃত অর্থ যতক্ষণ না রীতিমত অনুসন্ধানদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ বঙ্গের সাহিত্য এবং বিজ্ঞান মহলে সময়ে সময়ে অলক্ষিত ভাবে শব্দার্থের বিপর্য্যয় ঘটিয়া তাহার মূলে আঘাত পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমি তাই বলি যে, রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে উপসর্গগুলির প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হউক্, তাহা হইলে বঙ্গভাষার বিশেষ একটি উপকার সাধন করা হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী মোটে দুইটি মাত্র:—(১) হেতু প্রদর্শন, এবং (২) দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। ন্যায়-শাস্ত্রে হেতুর আর এক নাম সাধন, এইজন্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে সাংসাধিক (ইংরাজিতে যাহাকে বলে deductive); আর, শেষোক্ত প্রণালীর নাম তো হইতেই পারে দার্ষ্টান্তিক (ইংরাজিতে যাহাকে বলে Inductive)।

মনে কর, আমি এই একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম যে, দ্বিখণ্ডিত ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুমাত্রই রোমন্থন করে। প্রমাণ কি? প্রমাণ আর কিছু না;—গো, মহিষ, হরিণ, ছাগল, এই চারি জাতীয় জন্তুর দৃষ্টান্ত। সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ব্যাপক-সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিবার এই যে প্রণালী, ইহারই নাম দার্ষ্টান্তিক প্রণালী। সাংসাধিক প্রণালী ঠিক্ ইহার উল্টা পিট। মনে কর আলিপুরের পশ্বালয়ে বেড়াইতে গিয়া বাইসন্ নামক একটা জন্তুর সহিত

আমার প্রথম পরিচয় মাত্রেই আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এ জন্তুটা নিশ্চয়ই রোমন্থন করে। প্রমাণ কি? না যেহেতু ইহার খুর দ্বিখণ্ডিত। হেতু অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাবধারিত ব্যাপক সিদ্ধান্ত সম্মুখবর্ত্তী সংকীর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার এই যে প্রণালী, ইহারই নাম সাংসাধিক প্রণালী। "সাংসাধিক" অর্থাৎ হেতু দ্বারা সংসাধন করাই যাহার বিশেষ পরিচয় লক্ষণ। নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত প্রণালী সবিশেষ কাজে লাগে; আর, আবিষ্কৃত তত্ত্বের যাথার্থ্য-পরীক্ষা করিবার সময় শেষোক্ত প্রণালী সবিশেষ কাজে লাগে।

এইখানে একটি কথা আমি পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া রাখিতেছি, পরে যেন পাঠক আমার অভিপ্রায় তাহা ছাড়া আর কোনরূপ না বোঝেন। আমি বলিয়া রাখিতেছি যে, একমেটে প্রমাণকে দোমেটে করিবার জন্য মাঝে মাঝে ইংরাজি ভাষাকে সাক্ষী মান্ত করিব। যদি বল যে, প্রমাণ দৃঢ় করিবার কি অন্য উপায় নাই? তবে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই:—দুই প্রতিবেশীকে সাক্ষী মান্য করিলে, উভয়ে যদি একই রূপ কথা বলে, তবে সে কথা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে; কিন্তু পরস্পরের অপরিচিত দুই জন বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্ত করিলে উভয়ে যদি একই রূপ কথা বলে, তবে সে কথার মূলে যে সত্য রহিয়াছে, এ বিষয়ে আর কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। এরূপ যখন সুবিধা পাইতেছি, তখন আমার বিবেচনায় প্রমেয় বিষয়ের প্রমাণ দৃঢ় করিবার জন্য আবশ্যক মতে ইংরাজি ভাষাকে সাক্ষ্য মান্ত করা বুদ্ধিমানেরই কার্য্য। আদিম কালের সেই একটি উচ্চ প্রদেশ যেখান হইতে দেশীয় ভাষার পূর্ব্ববাহিনী নদী এবং বিদেশীয় ভাষার পশ্চিমবাহিনী নদী, উভয়ে একত্র যাত্রারম্ভ করিয়া, কালক্রমে দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিভিন্ন দিকে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারই প্রতি আমার প্রকৃত লক্ষ; ইংরাজি ভাষা কেবল উপলক্ষ মাত্র। ভূমিকা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

সূচনা।

প্রথমে আমরা বিবেচ্য উপসর্গের গোটা কত বাছা বাছা দৃষ্টান্ত সারিবন্দি করিয়া সাজাইয়া রাখিব।

তাহার পরে সেই দৃষ্টান্তগুলির আশিস্থিত উপসর্গের যথাবৎ অর্থ অবধারণ করিয়া দার্ষ্টান্তিক প্রণালী অনুসারে সেই অবধারিত অর্থের ব্যাপ্তি সাধন করিব; এইরূপ ব্যাপ্তি-সাধনের ইংরাজি নাম Generalization।

তাহার পরে সেই প্রতিপাদ্য অর্থটিকে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলির গণ্ডির বাহিরে বিভিন্ন স্থলে প্রয়োগ করিয়া তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিব; এইরূপ যাথার্থ্য পরীক্ষার ইংরাজি নাম Verification.

প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের দৃষ্টান্ত।

প্রশ্বাস ... ... নিঃশ্বাস

প্রবৃত্তি ... ... নিবৃত্তি

প্রবাস ... ... নিবাস

প্রবেশ ... ... নিবেশ

প্রক্ষেপ ... ... নিক্ষেপ

প্রকৃষ্ট ... ... নিকৃষ্ট

এই দৃষ্টান্তগুলিতে প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের অর্থ স্পষ্ট ধরা দিতেছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,

প্র = pro = forth

নি = in

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে; নি-উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে। তাহার সাক্ষী

প্রশ্বাস = breathing *forth*

নিশ্বাস = *in*haling

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যেও প্র এবং নি উপসর্গের ঐরূপ আড়াআড়ি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

প্রবৃত্তি = *pro*-pensity = সম্মুখের দিকে ঝোঁক।

নিবৃত্তি = ভিতরের দিকে বৃত্তি টানিয়া লওয়া।

প্রবাসের লক্ষ্য বাড়ীর বাহিরের দিকে।

নিবাসের লক্ষ্য বাড়ীর ভিতরের দিকে।

প্রবেশের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে, যেমন, সম্মুখস্থিত অরণ্যে প্রবেশ। নিবেশের লক্ষ্য ভিতরের দিকে, যেমন, পুস্তকের অভ্যন্তরে মনোনিবেশ। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা প্র, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা নি। কোন্ শব্দের বাচ্য বিষয়কে কোন্ দিক্ দিয়া দেখা হইতেছে, তাহা সেই শব্দের প্রচলিত অর্থ দৃষ্টে অতীব সহজে জানা যাইতে পারে। যেখানে দেখিবে যে, প্র-পূর্ব্বক কোন একটি শব্দের সহিত নি-পূর্ব্বক আর একটি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য দেদীপ্যমান, সেখানে নিশ্চয়ই জানিবে যে, দুই শব্দের অর্থ দুই বিপরীত দিক্ দিয়া অবধারণ করা হইতেছে। proclivity এবং inclination এই দুই শব্দের অর্থ অবিকল একই রূপ; অথচ পূর্ব্বোক্ত শব্দের আদিতে pro, শেষোক্ত শব্দের আদিতে in। দুই শব্দেরই অর্থ ঝোঁক। কিন্তু ঝোঁকের লক্ষ তাহার দুই প্রান্তের দুই বিভিন্ন দিকে:—

(১) যে ব্যক্তির ঝোঁক, তাহার সম্মুখ দিকে।

(২) যে বিষয়ের প্রতি ঝোঁক, তাহার ভিতরের দিকে।

ঝোঁকই বলো, টানই বলো, আর প্রবৃত্তিই বলো, তাহা ব্যক্তির দিক্ দিয়া দেখিলে proclivity, বস্তুর দিক্ দিয়া দেখিলে inclination।

প্রবেশ শব্দের প্র প্রবেশ-কর্তার সম্মুখ দিক্ দেখাইয়া দেয়; নিবেশ শব্দের নি শব্দ বস্তুর ভিতরের দিক্ দেখাইয়া দেয়। নিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ শব্দের প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে, যাহা বলিলাম তাহার যাথার্থ্য আরও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিক্ষেপ শব্দের বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য বস্তুর ভিতরের দিকে।

নিক্ষেপ = to throw in;

যেমন, দুর্গ মধ্যে গোলা নিক্ষেপ; কিন্তু যখন আমরা বলি যে, "অমুক পুঁথিতে এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত" তখন বুঝিতে হইবে যে, পুঁথির বহিস্থিত প্রক্ষেপ কর্তার দিক্ হইতেই প্রক্ষেপ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। এ স্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গোলাও দুর্গের অভ্যন্তরে নিপতিত হয়, প্রক্ষিপ্ত বচনও পুঁথির অভ্যন্তরে নিপাতিত হয়;—ইহার বেলাই বা প্র হয় কেন, আর, উহার বেলাই বা নি হয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, পৃথক্ ফল যাহা দেখিতেছ, তাহা এক যাত্রার ফল নহে। দুর্গের মধ্যে নিপাতিত হইবার জন্যই গোলা হইয়াছে—গোলার কাজই তাই; গোলা দুর্গাভ্যন্তরে অথবা শত্রুবক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহার জন্ম সার্থক হয়। কিন্তু পুঁথির অভ্যন্তরে নিপতিত হওয়া প্রক্ষিপ্ত বচনের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চা। প্রক্ষিপ্ত বচনের সহিত পুঁথির কোন প্রকার আন্তরিক সম্বন্ধ না থাকাতে নি উপসর্গ কোন সূত্রেই তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারে না। পক্ষান্তরে, গোলা-নিক্ষেপের পরিবর্ত্তে গোলা-প্রক্ষেপ স্থল-বিশেষে দিব্য খাটে। ক্রিকেট্ খেলিবার সময় গোলা-নিক্ষেপ অপেক্ষা গোলা-প্রক্ষেপ অধিকতর সংলগ্ন হয়।

প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ উত্তমাধম। এ অর্থ কোথা হইতে আইল? আইল যেখান হইতে, তাহা এখন আরও কাহার নিকটে গোপন থাকিতে পারে না।

প্রকৃষ্ট = প্র + কৃষ্ট = সামনে টানিয়া আনা।

নিকৃষ্ট = নি + কৃষ্ট = ভিতরে টানিয়া রাখা।

গো-বিক্রেতা ভাল গোরুকে সামনে টানিয়া আনে—যে, ক্রেতা তাহা দেখুক; আর, তাহার বিপরীত কারণে অধম গোরুকে ভিতরে টানিয়া রাখে।

প্রদর্শনীয় = ভাল; তাই, প্রকৃষ্ট = ভাল।

অপ্রদর্শনীয় = মন্দ; তাই, নিকৃষ্ট = মন্দ।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলিয়া রাখা শ্রেয় মনে করিতেছি যে,

গ্রহণীয় = ভাল; তাই উৎকৃষ্ট (টানিয়া তোলা) = ভাল।

বর্জ্জনীয় = মন্দ; তাই অপকৃষ্ট (টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া) = মন্দ।

উপরের "টানিয়া আনা", "টানিয়া রাখা", "টানিয়া তোলা", "টানিয়া ফেলা", এই যে চারিটি কথা, চারিটিই বিশেষণ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে; চারিটির কোনটিই ক্রিয়াবাচক নহে। অতএব ইহা দ্রষ্টব্য যে,

টানিয়া আনা = টানিয়া আনা বস্তুর বিশেষণ, টানিয়া আনা ক্রিয়া নহে।

টানিয়া তোলা = টানিয়া তোলা বস্তুর বিশেষণ, টানিয়া তোলা ক্রিয়া নহে।

পণ্ডিত মহাশয়কে প্রয়োজন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় তো বলিবেন প্রকৃষ্টরূপে যোজন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা বলি—সম্মুখ দিকে যোজন। ইংরাজিতে এইরূপ একটি বাক্য-প্রয়োগ প্রচলিত আছে যে, I am looking forward to a time when &c., এই কথাটিতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বস্তুর সম্বন্ধে forward শব্দটি কেমন সুন্দর বসিয়াছে তাহা দেখা হউক; তাহা দেখিলে, প্রয়োজন শব্দের গোড়ায় কি সূত্রে প্র গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রয়োজনীয় বস্তুকে মনোনেত্রের সম্মুখে গঠন করিয়া তোলা—যোজনা করিয়া তোলা, আর, তাহার উদ্দেশে সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারণ-পূর্ব্বক পথ চাহিয়া থাকা, নূতন কিছুই নহে; সেই সূত্রে প্রয়োজন শব্দের আদিতে প্র বসিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা প্র, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা নি। এইরূপ দিক্ পরিবর্ত্তন গতিকে অনেকগুলি প্র-পূর্ব্বক দেশীয় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ in-পূর্ব্বক (অর্থাৎ নি-পূর্ব্বক) হইয়া গিয়াছে; তাহার সাক্ষী

প্রভাব = *in*-fluence

প্রগাঢ় = *in*-tense

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশীয় এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় প্র-উপসর্গের প্রয়োগ-সাদৃশ্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার সাক্ষী

প্র-বচন = *pro*-verb

প্রণয়ন (পুস্তক-প্রণয়ণ) = *pro*-duce

প্রকীর্ত্তন = *pro*-claim

প্রলম্বন = prolongation

প্রচুর = profuse

প্রজন = progeny *

এতদ্ব্যতীত, প্রবাহ, প্রসারণ, প্রদান, প্রচার, প্রতান, প্রভা, প্রকাশ, প্রবর্দ্ধন, প্রদীপ, প্রদেশ, এইরূপ প্র-পূর্ব্বক নানা শব্দের মধ্য হইতে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবণতা অর্থ

---

* শাস্ত্রে আছে "প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোস্তি কশ্চন॥"

জাজ্জল্যমান ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নি-উপসর্গেরও অন্তর্নিহিত অর্থ অনেকানেক নি-পূর্ব্বক শব্দের গাত্রে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল দুই চারিটি স্থলে তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। নিদান শব্দের ঠিক্ অর্থ কি তাহা উপাদান শব্দের সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রাচীর গঠন করিবার সময় আমরা বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ করি, কিন্তু নিদান সেরূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কেননা নিদান নিতান্তই অন্তরের সামগ্রী। ইংরাজি ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, "to consist of" এবং "to consist in" এই দুইরূপ কথার দুইরূপ অর্থ। "অমুক consists of এই এই সামগ্রী" বলিলে বুঝায় যে, সে সামগ্রীগুলি তাহার উপাদান; আর, "অমুক consists in এই সামগ্রী" বলিলে বুঝায় যে, সেটি তাহার নিদান। তাহার সাক্ষী

'Humanity consists of intellect, animality, life, & body' এ কথা বলিলে বুঝায় যে, বুদ্ধি, মন, প্রাণ এবং শরীর, এ-গুলি মনুষ্যত্বের উপাদান। আর, যদি বলি যে,

'Humanity consists in rationality' তবে তাহাতে বুঝায় যে, প্রজ্ঞা মনুষ্যত্বের নিদান।

ন্যায়-শাস্ত্রে নিগমন শব্দের অর্থ—ইংরাজিতে যাহাকে বলে conclusion।

(১) নি = in

(২) গমন = coming

(৩) নিগমন = incoming

(উপরে, 'come' এবং 'গম', 'cow' এবং 'গো', এই প্রকার শব্দ-সাদৃশ্যের সূত্র ধরিয়া গমন শব্দের অর্থ করিলাম coming; ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, আমরা যেখানে বলি 'তোমার ওখানে যা'ব' ইংরাজেরা সেখানে বলে 'I will come to you')। ন্যায়শাস্ত্রের conclusion-এর সঙ্গে income-এর কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে—ইহা শুনিলে টোলের অধ্যাপকেরা দুঃখের হাসি হাসিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে: কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিতেছেন, এ সে income নহে—লক্ষ্মীর income নহে। এ income সরস্বতীর income—বুদ্ধির লোহার সিন্দুকে তত্ত্বের income। আমরা কথায় বলি—"এ থেকে এই আস্‌চে" অর্থাৎ এইরূপ যুক্তি হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিতেছে। conclusion যুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির বাহির হইতে বুদ্ধির ভিতরে আগমন করে—তাই তাহা নিগমন। মনে কর দূরে উচ্চাকার কি একটা বস্তু আমার নয়নগোচর হইতেছে—কিন্তু তাহা খোঁটা কি মনুষ্য তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহা যে কি তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। তাহার পরে ঠাহরিয়া দেখিলাম যে, সে বস্তুটা ক্রমশঃ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমার বুদ্ধিতে আসিল যে, এটা নিশ্চয়ই মনুষ্য। বুদ্ধিতে যে আসিল—কোথা হইতে আসিল? "চলিতেছে" এই যুক্তি হইতে। যুক্তি কি? না যোজনা। কিসের সঙ্গে কিসের যোজনা? "উচ্চাকৃতি

পদার্থ" এই ভাবটির সহিত "চলনানতা" এই ভাবটির যোজনা। যে মাত্র আমার মনোমধ্যে ঐ দুই ভাবের যোজনা (Synthesis) হইল, অমনি আমার বুদ্ধিতে আসিল "এ নিশ্চয়ই মনুষ্য।" নিগমন কি অর্থে income তাহা এখন বুঝিতে পারা গেল; যুক্তির পথ দিয়া বুদ্ধিতে আসা=বুদ্ধির অভ্যন্তরে আগমন=নিগমন; এই অর্থে। ন্যায় শাস্ত্রের 'ন্যায়' শব্দটি নিজে কি? তাহা নি+আয়। আয় শব্দের অর্থ আগমন। টাকা ঘরে আসিলে তাহারই নাম আয়। কোন একটি তত্ত্ব অন্যের নিকটে শুনিয়া তাহা যদি মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তবে তাহা বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে, যাহা যুক্তি দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা বুদ্ধির আয়ত্তাভ্যন্তরে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ যুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির অভ্যন্তরে তত্ত্বের আয় অর্থাৎ আমদানি ন্যায়-শব্দের বাচ্য; যেহেতু ন্যায়=নি+আয়। ইউক্লিডের কৃত একটি জ্যামিতির সিদ্ধান্ত তুমি যখন যুক্তি পরিচালনা করিয়া বুঝিতে আরম্ভ কর—তখন ইউক্লিডের সিদ্ধান্ত তোমার নিজের সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়—তাহা তোমার বুদ্ধির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ হইয়া তোমার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ নিজস্ব সম্পত্তির ভাব হইতে ন্যায়ান্যায়ের ভাব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহাতে যাহার সম্পূর্ণ অধিকার, তাহাই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহাই তাহার নি+আয়। যাহাতে যাহার অধিকার নাই, তাহা কখনই তাহার নিজস্ব হইতে পারে না! চুরি করা সামগ্রী কখনই চোরের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না; চোর যদি সহস্রবার বলে, যে, সে সামগ্রী তাহার নিজের, তথাপি তাহা তাহার নিজের নহে। তাহা তাহার ন্যায় নহে, নি+আয় নহে; তাহা অন্যায়। আমি নিজে যুক্তি খাটাইয়া যে কোন তত্ত্ব উপার্জ্জন করি, তাহাই আমার বুদ্ধির নিজস্ব সম্পত্তি; ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায় (=নি+আয়)। তেমনি আবার, আমি নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন বা উৎপাদন করি, তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তে, তাহাই আমার নিজস্ব ধন; নীতি-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায়=নি+আয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, আর, নীতি-শাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, নিজস্ব সম্পত্তির ভাব দুয়েরই গোড়া'র কথা। নি-উপসর্গের লক্ষ্য উভয় স্থলেই ভিতরের দিকে।

যিনি যাহা সুযুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই তাঁহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; যিনি যাহা সদুপায় দ্বারা উপার্জ্জন করেন, তাহাই তাঁহার অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তি যদি যথেচ্ছা-মূলক কল্পনা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সকল মনোমধ্যে পোষণ করেন, তবে কোন বিষয়েরই সত্যাসত্য তাঁহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তেমনি আবার, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের সম্পত্তি অন্যায় রূপে হস্তগত করিয়া নিজে ভোগ করেন, তবে তাহা তাঁহার অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ পায় না বলিয়া তিনি তাহা জীর্ণ করিতে পারেন না—আত্মসাৎ করিতে পারেন না। এইরূপ

দেখা যাইতেছে যে, স্নায়ুশাস্ত্রের "স্নায়ু" এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের "স্নায়ু" দুয়েতেই নি-উপসর্গের অন্তর্নিষ্ঠতা অর্থ সমানরূপে বলবৎ।

নি-উপসর্গ কোন কোন স্থলে নিষেধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু সেটা তাহার মুখ্য অর্থ নহে—গৌণ অর্থ। নিবৃত্তি শব্দের মুখ্য অর্থ বৃত্তিকে ভিতরে টানিয়া লওয়া; তাহা হইতেই তাহার গৌণ অর্থ দাঁড়াইয়াছে বৃত্তি-শূন্যতা।

প্র-উপসর্গের সহিত নি-উপসর্গের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখা গেল; অতঃপর তাহার সহিত সং এবং বি এ দুই উপসর্গের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদুপলক্ষে ভূমিকা স্বরূপে গোটা দুই কথা বলা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে, সং-উপসর্গ কখন কখন আপনার গাত্র হইতে অনুস্বার ঝাড়িয়া ফেলিয়া স হয়। স-উপসর্গের অর্থ, সহ, ইহা বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্রেরাও জানে, কিন্তু সং উপসর্গেরও যে গোড়ার অর্থ তাই—ইহা বালক দূরে থাকুক, পণ্ডিত মহাশয়েরাও জানেন কি না সন্দেহ; কেননা তাহা জানিলে তাঁহারা এরূপ কথা কখনই বলিতেন না যে, সং=সম্যক্‌রূপে। সায়নাচার্য্যকৃত বেদভাষ্যে "সংবদধ্বং" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "সহবদত"; অতএব সং যে, সহ, ইহা একপ্রকার বেদবাক্য; একদিকে এই যেমন দেখা গেল, যে স এবং সং দুয়েরই গোড়ার অর্থ, সহ, আর একদিকে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই গোড়ার অর্থের মধ্য হইতে দোঁহার দুই শাখা অর্থ দুই দিকে ছটকিয়া বাহির হইয়াছে; তাহা এই—

স'এর অর্থ সমান;

সং এর অর্থ এক সঙ্গে।

তার সাক্ষী

সপত্নী=পত্নী ইনি যেমন—উনি তেমনি—উভয়েই সমান।

সংগম=এক সঙ্গে উপস্থিতি।

ইংরাজি ভাষায় সং এবং স'এর অবিকল অনুবাদ con এবং co। সং যেমন অনুস্বার ফেলিয়া দিয়া স হয়, con তেমনি n ফেলিয়া দিয়া co হয়। co এবং con এ দুয়ের মধ্যে যে, অতীব নিকট সম্বন্ধ, তাহার প্রমাণ এই যে, coterminous এবং conterminous এ দুই শব্দের একই অর্থ। মনে কর

ক খ রেখার খ-প্রান্ত এবং গ ঘ রেখার গ-প্রান্ত এক স্থানে মিলিত হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় ক খ এবং গ ঘ রেখাদ্বয়কে coterminous ও বলা যাইতে পারে, conterminous ও বলা যাইতে পারে;—খ এবং গ সমস্থানে পড়িয়াছে বলিয়া রেখাদ্বয় coterminous;

থ এবং স একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে বলিয়া সেখানে conterminous। ও দুই শব্দের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ ;—

Coterminous = সমপ্রান্তিক = সাপ্রান্তিক।

Conterminous = সাম্প্রান্তিক ;

সং-এর মুখ্য অর্থ কিন্তু সহ ;—

সবান্ধব = বান্ধব-সহ ;

সক্রোধ = ক্রোধ-সহ।

স'এর এইরূপ সহবর্ত্তিতা অর্থ হইতেই তাহার সমকক্ষতা অর্থ গজাইয়া উঠিয়াছে ; তার সাক্ষী—

সপত্নী = co-পত্নী = rival পত্নী

সঙ্গনী = সুখদুঃখের copartner

সোদর = co-জঠরজাত

সহৃদয় = co-হৃদয় = sympathetic

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তিও "তোমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" না লিখিয়া স'কে বফলা দিয়া লেখেন "তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" ; "সিংহ এবং ব্যাঘ্রের মধ্যে সাজাত্য সম্বন্ধ" না লিখিয়া—লেখেন "সিংহ এবং ব্যাঘ্রের মধ্যে "স্বাজাত্য সম্বন্ধ" ; "গো এবং গবয়ের মধ্যে সারূপ্য রহিয়াছে" না লিখিয়া—লেখেন "গো এবং গবয়ের মধ্যে স্বারূপ্য রহিয়াছে"। "অমুক ব্যক্তি স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন" এরূপ স্থলে স'য়ে বফলা দেওয়া যে নিতান্তই আবশ্যক এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, "তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" এখানে স'য়ে বফলা দেওয়া হইতেছে শুদ্ধ কেবল গায়ের জোরে। যেখানে "তোমার সপক্ষ" বলিলেই সহজে তাহার অর্থ বুঝা যায়, সেখানে "তোমার স্বপক্ষ" বলিয়া, অর্থাৎ তোমার আপনার পক্ষ বলিয়া, মিথ্যা একটা গণ্ডগোল বাধাইবার প্রয়োজন কি ? ব-ফলা না দিয়া সাদাসিধা লিখিলেই তো হয় যে, তোমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি অর্থাৎ তোমার সমপক্ষে বা সহপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি—তোমার বিপক্ষে বা বিরোধী পক্ষে সাক্ষ্য দিই নাই। এই গেল আমাদের প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বি উপসর্গটি বড় সহজ পাত্র নয়—তাহা একপ্রকার সিদ্ধির ঝুলি ! একই বি-উপসর্গ হইতে কোন স্থলে বা বিবর্জ্জন, কোন স্থলে বা বৈপরীত্য, কোন স্থলে বা হেয়তা, কোন স্থলে বা বিশেষত্ব, কোন স্থলে বা পরিবর্ত্তন, কোন স্থলে বা অসামঞ্জস্য, এইরূপ নানা স্থলে নানা অর্থ বিজৃম্ভিত হইয়া পরীক্ষকের চক্ষে ধাঁদা লাগাইয়া দেয় ; তাহার সাক্ষী—

বিবর্জ্জন অর্থ	সজন,	বিজন
	সধবা,	বিধবা
	সবস্ত্র,	বিবস্ত্র
বৈপরীত্য অর্থ	অনুলোম,	বিলোম
	সপক্ষ,	বিপক্ষ
	অনুরক্ত,	বিরক্ত
হেয়তা অর্থ	সুপথ,	বিপথ
	ধর্ম্ম,	বিধর্ম্ম
	সুজাতি,	বিজাতি
বিশেষত্ব অর্থ	দ্বেষ,	বিদ্বেষ
	দলিত,	বিদলিত
	হীন,	বিহীন
পরিবর্ত্তন অর্থ	বর্ণ,	বিবর্ণ
	প্রকৃতি,	বিকৃতি
	প্রকাশ,	বিকাশ
অসামঞ্জস্য অর্থ	অঙ্গ,	ব্যঙ্গ
	সদৃশ,	বিসদৃশ
	সকল,	বিকল

উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত গুলির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ একটা কিছু আছে—তাহাই অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নানা অর্থে পরিণত হয়। একই প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অঙ্কুর যেমন মৎস্য দেহে পাকনা-রূপে, পক্ষি-দেহে ডানা-রূপে, এবং মানব-দেহে হস্তরূপে পরিণত হয়, তেমনি খুব সম্ভব যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ বিভিন্ন অবস্থা-গতিকে বিভিন্ন শাখা-অর্থে পরিণত হইয়াছে। বি-উপসর্গের সেই গোড়া'র অর্থটি কি, এবং তাহা কোন্ সূত্রে কোন্ শাখা-অর্থে কিরূপ করিয়া পরিণত হইয়াছে, তাহারই অন্বেষণে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। বি-উপসর্গের প্রচলিত অর্থ-গুলির মধ্যে তাহার গোড়া'র অর্থ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়—শাখা অর্থই অনেক; তাহার কারণ আর কিছু না—খাঁটি রূপা'র ঘটিবাটী বাজারে দুষ্প্রাপ্য। আর একটি কথা এই যে টাকা অপেক্ষা খাঁটি রূপা দেখিতে মলিন বলিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে, তাহা নিকৃষ্ট অধম শ্রেণীর রূপা। অতএব, বি-উপসর্গের মুখ্য অর্থটি যাহা আমরা খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়াছি, তাহা যদি প্রথম দৃষ্টিতে পাঠকের মনঃপুত না হয়, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা দোষ দিব না—কেননা প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মনঃপুত না হইবারই কথা।

উদাহরণ-মালা।

প্রকীর্ণ, বিকীর্ণ, সংকীর্ণ
প্রক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত
প্রবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধন, সম্বর্দ্ধন
প্রকাশ, বিকাশ, সংকাশ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্র = pro = forth ; এখন বক্তব্য এই যে,

বি = dis ;
সং = com।

তাহার সাক্ষী

বিবাদী সুর = discord ;
সংবাদী সুর = concord।

"পুষ্প প্রকীর্ণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে, পুষ্প সম্মুখে ছড়ান হইতেছে; "পুষ্প বিকীর্ণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে, পুষ্প আশপাশে ছড়ান হইতেছে ; "পুষ্পরাশি সংকীর্ণ রহিয়াছে" বলিলে বুঝায় যে পুষ্পরাশি একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে অনেকে যখন একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে, তখন সকলের ঝোঁক কেন্দ্রাভিমুখে। তেমনি

প্রক্ষিপ্ত = সম্মুখে ক্ষিপ্ত
বিক্ষিপ্ত = আশপাশে ক্ষিপ্ত
সংক্ষিপ্ত = একস্থানে কেন্দ্রীভূত

প্রবর্দ্ধন = সম্মুখে বর্দ্ধন
বিবর্দ্ধন = আশপাশে বা আড়ে বর্দ্ধন
সম্বর্দ্ধন = সাকল্যে বর্দ্ধন

প্রকাশ = সম্মুখে কিরণ প্রসারণ
বিকাশ = আশপাশে আলোকের কিরণ অথবা পুষ্পের পাপড়ি বিস্তার
সংকাশ = কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত আভা

রজত-সংকাশ বলিলে বুঝায় যে রজতের গাত্রে যেরূপ শুভ্র আভা ঘনীভূত দেখা যায় সেইরূপ সমুজ্জ্বল। উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত-গুলির প্রতি চক্ষু বুলাইয়া আমরা পাইতেছি যে

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখে ;
বি-উপসর্গের লক্ষ্য আশপাশে ;
সং-উপসর্গের লক্ষ্য কেন্দ্রাভিমুখে।

পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হৌক্। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :—বর্ত্তমান্ প্রবন্ধে সম্মুখ পার্শ্ব কেন্দ্র প্রভৃতি স্থান-বাচক অথবা দিক্-বাচক শব্দ যাহা যখন উল্লেখ করা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহার অর্থ যেন লৌকিক প্রথানুযায়ী মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হয় ; তাহা না করিয়া কেহ যদি তাহার অর্থ নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার জানা উচিত যে, এখানে আমরা জ্যামিতিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি না—ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। জাহাজ চালাইবার সময় বটে—ধ্রুব-তারা দেখিয়া অথবা কম্পাসের কাঁটা দেখিয়া অতীব সাবধানে দিক্ নিরূপণ করা হইয়া থাকে আর কর্ত্তব্যও তাই ; কিন্তু কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় লোকে ধ্রুবতারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তর-পশ্চিমকেও উত্তর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না—উত্তর-পূর্ব্বকেও উত্তর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। শেষোক্ত প্রকার লৌকিক প্রথাকেই আমরা এখানে আদর্শ মান্য করিতেছি। আমাদের এখানকার অভিধানে সম্মুখ দিক্‌ও যা—সম্মুখ ঘেঁসা দিক্‌ও তা—দুইই সম্মুখ দিক্ ; পার্শ্ব এবং পার্শ্ব ঘেঁসা স্থান দুইই আশপাশ ; কেন্দ্র এবং কেন্দ্র ঘেঁসা স্থান দুইই কেন্দ্র স্থান।

পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক্। আর একটি কথা এই যে প্র-উপসর্গের অভিপ্রেত সম্মুখের দিক্ বিশেষ কোন একটা ধরা বাঁধা দিক্ নহে। আমি যখন চিৎ হইয়া শয্যায় শয়ন করি, তখন কড়িকাঠের দিক্ আমার সম্মুখ দিক্। আমি যখন দোতালা ঘরের জান্‌লার দ্বার দিয়া মুখ বাড়াইয়া কে গৃহে প্রবেশ করিতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করি, তখন নীচের দিক্ আমার সম্মুখ দিক্। অতএব "বৃক্ষ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে" এই কথাটির ভিতরে প্র-উপসর্গের বিশেষ সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত যুক্তি-সোপানের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য :—

(১) যে দিকে যাহার গতি সেই দিক্ তাহার সম্মুখ দিক্।

(২) বৃক্ষের গতি উপর দিকে।

(৩) সুতরাং উপর দিক্‌ই বৃক্ষের সম্মুখ দিক্।

(৪) অতএব উপর দিকে বৃক্ষের বর্দ্ধন
　　　=সম্মুখে বর্দ্ধন
　　　=প্রবর্দ্ধন

তেমনি আবার "গোমুখী হইতে গঙ্গা প্রসৃত হইতেছে" বলিলে এক হিসাবে যেমন বুঝায় যে গঙ্গা নীচে নিপতিত হইতেছে, আর এক হিসাবে তেমনি বুঝায় যে, গঙ্গা সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু "তরু প্রবর্দ্ধিত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায় যে, তরু বিবর্দ্ধিত হইতেছে, অথবা "গঙ্গা প্রসৃত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায়

যে, গন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, তবে উভয় স্থলেই বুঝায় যে, উদাহৃত বস্তু আড়ে অথবা পার্শ্বে স্ফূর্তি পাইতেছে। এখানে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিকীর্ণ=আশপাশে ছড়ানো; বিজন=জন মনুষ্য বিবর্জ্জিত। কোথায় আশপাশে, আর, কোথায় বিবর্জ্জিত, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অতএব তুমি যে বলিতেছ যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ পার্শ্ব-প্রবণতা, আর, সেই গোড়া'র অর্থটি অবস্থা গতিকে রূপান্তরিত হইয়া বিবর্জ্জন অর্থে পরিণত হইয়াছে—এ কথা কোন কার্য্যেরই নহে; কেননা আশপাশ শব্দের মধ্য হইতে বিবর্জ্জন অর্থ টানিয়া বাহির করা অদ্ভুত ভেল্‌কি বাজি। সাপুড়ে যেমন লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া রাজবাটীর সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের আশপাশ হইতে কেউটিয়া সাপ টানিয়া বাহির করে, উহাও সেইরূপ একটা কৃত্রিম কাণ্ড, তাহাতে আর ভুল নাই। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির কোন্ কাজটা ভেল্‌কি-বাজি নহে? মনের আনন্দ হইতে যদি মুখের হাসি বাহির হইতে পারে, তবে বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা হইতে বিবর্জ্জন অর্থ বাহির হইতে না পারিবে কেন? বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে, মুখের হাস্য এবং মনের আনন্দ এ দুয়ের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান দুইপার্শ্বে ঘাড় নাড়া এবং মনের প্রত্যাখ্যান এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান তাহা অপেক্ষা এক তিলও অধিক নহে। পক্ষী যেমন বাম-দক্ষিণ পার্শ্বে চঞ্চু ক্ষেপণ দ্বারা অভক্ষ্য সামগ্রী আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া গোবরের মধ্য হইতে ভক্ষ্য কীট বাছিয়া লয়, আমরাও তেমনি দুই পার্শ্বে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার্য্য তত্ত্ব আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে স্বীকার্য্য তত্ত্ব বুদ্ধির অভ্যন্তরে টানিয়া লই। মনে কর দর্শকের সম্মুখ প্রদেশে ক্রোশ খানেক দূরে একটা গোরু দাঁড়াইয়া আছে। দর্শক দূরতাপ্রযুক্ত গোরুটাকে অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি দেখিয়া মনে ভাবিলেন, "ওটা খরগোশ"। এইরূপ ভাবিয়া কাল্পনিক খরগোশটাকে ধরিবার জন্য মাঠ ভাঙিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। পোয়াটেক পথ অগ্রসর হইয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "না—এটা খরগোশ না—এটা ছাগল।" খরগোশকে মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে একপার্শ্বে সরাইয়া ফেলিয়া ছাগলকে মনোনেত্রের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তাহার পরে তথা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশটাক পথ অগ্রসর হইয়া দর্শক বলিলেন "না—এটা ছাগল না—এটা গোরু!" ছাগল পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইল, আর, গোরু মনোনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরে দর্শক যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গোরুটা ততই স্পষ্টাকার ধারণ করিয়া আত্ম-সমর্থন করিতে লাগিল। তখন দর্শক স্বীকার করিলেন যে, হাঁ এটা গোরু। গোরুকে তিনি মনোনেত্রের সম্মুখে আনিয়া তাহার যাথার্থ্য শিরোধার্য্য করিলেন, তাই তিনি সম্মুখ দিকে মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিলেন। গোরুকে যেমন তিনি মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, ছাগলকে এবং খরগোশকে তেমনি মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে পার্শ্বে সরাইয়া দিলেন; আর, "পার্শ্বে সরাইয়া দিলাম" এই ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিবার জন্য, দুইপার্শ্বে ঘাড়

নাড়িয়া বলিলেন, "না—এটা খরগোশ না ; না—এটা ছাগল না।" আশ-পাশের ভাব কি সূত্রে অবস্থা-গতিকে বিবর্জ্জন-ভাবের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে, এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে ; তাহা আর কিছু না—স্বীকার্য্য বিষয়কে মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য বর্জ্জনীয় বিষয়কে আশ-পাশে নিক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা ; এই সূত্রেই পার্শ্ব প্রবণতার সহিত বর্জ্জনীয়তা কার্য্যগতিকে জড়িত হইয়া পড়ে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে বি-উপসর্গের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব কি সূত্রে প্রবেশ করে ? ইহার উত্তর এই যে, বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা এবং বর্জ্জনীয়তা দুইই বৈপরীত্যের প্রবেশ-দ্বার। প্রথমে পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া কিরূপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যা'ক্।

প্রকৃত কথা এই যে, বি-উপসর্গের বৈপরীত্য মুখ্য বৈপরীত্য নহে ; প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্যই মুখ্য বৈপরীত্য ; তার সাক্ষী—

প্রাচী = পূর্ব্ব,　　প্রতীচী = পশ্চিম।

প্র এবং প্রতি'র মধ্যে এইরূপ পূর্ব্ব-পশ্চিমের প্রভেদ। কথাটা এই :—

(১) একদিকে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবণতা ;

(২) আর একদিকে প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্য ;

(৩) মাঝখানে বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা।—

বি-উপসর্গ এইরূপ দুয়ের মাঝখানে পড়া'তে, তাহার গাত্রে কখনও বা প্র-উপসর্গের—কখনও বা প্রতি-উপসর্গের—ছায়া সংক্রামিত হয়।

পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হোক্।

জেলে যখন জাল নিক্ষেপ করে, তখন জাল সম্মুখে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিস্তারিত হয় ; এই গতিকে "জাল প্রসারণ কর" এবং "জাল বিস্তার কর" দুয়ের অর্থ একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। বৃক্ষ অঙ্কুরিতাবস্থা হইতে ক্রমশই উচ্চে প্রবর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ; এই গতিকে দুয়ের অর্থ একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ঘটনা-সূত্রে প্র এবং বি উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়। প্র এবং বি'র মধ্যে পরস্পরের ছায়া-সংক্রমণ এই যেমন দেখা গেল, প্রতি এবং বি'র মধ্যেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লোমাবলী বিপরীত দিকে ফিরান হইলে সেই সঙ্গে তাহা আশপাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ; এই গতিকে প্রতিলোম এবং বিলোম এ দুই শব্দের অর্থ অবিকল একই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন, বিবর্জ্জনের দ্বার দিয়া বি-উপসর্গে কিরূপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যাক্।

পৃথিবীতে যদি কেবল ভাল আর মন্দ এই দুই শ্রেণীর বস্তু থাকিত—ভালমন্দের

মাঝামাঝি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে "ভাল না" বলিলেই মন্দ বুঝাইত, "মন্দ না" বলিলেই ভাল বুঝাইত; কিন্তু ভাল এবং মন্দের মাঝামাঝি অসংখ্য বস্তু থাকাতে "মন্দ না" বলিলে "না ভাল না মন্দ" বুঝায়, "ভাল" বুঝায় না; "ভাল না" বলিলেও সেইরূপ "না ভাল না মন্দ" বুঝানো উচিত—কিন্তু কাজে দেখা যায় তাহার বিপরীত। "ভাল না" বলিলে মন্দই বুঝায়। শুদ্ধ বিচারে

ভাল না = না ভাল না মন্দ;

কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে

কেবল, "মন্দ না" কথাটাই = না ভাল না মন্দ;

ভাল না = মন্দ।

এরূপ হয় কেন? এক মাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন?

ইহার কারণ আর কিছু না—"তোমার এ কাজটা অতি মন্দ হইয়াছে" না বলিয়া আমরা যখন বলি যে "তোমার এ কাজটা ভাল হয় নাই" তখন তাহার অর্থই এই যে "তোমার এ কাজটা খুবই মন্দ হইয়াছে—তবে কিনা ভদ্রতার অনুরোধে সেরূপ স্পষ্ট কটু কথা তোমার সাক্ষাতে বলিতে আমার মুখে বাধ বাধ ঠেকিতেছে।" এরূপ স্থলে ভাল-না'র অর্থ শুধু কেবল ভাল না হইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না—এখানে তাহার অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবেই মন্দ। এমন কি ইংরাজি সংবাদ পত্রে যদি কোথাও এরূপ লেখা থাকে যে, "অমুক has told what is not true" তবে তাহার অর্থই এই যে অমুক has told a downright lie। এইরূপ লৌকিক ভদ্রতা রক্ষার দায়ে পড়িয়া বিবর্জ্জন অনেক সময় বৈপরীত্যের কটুত্ব-প্রশমন কার্য্যে, অর্থাৎ বিষ ঢাকা কার্য্যে, নিযুক্ত হয়; আর সেই গতিকে বিবর্জ্জন এবং বৈপরীত্য উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়।

আর একটি কথা এই যে, এমন কতকগুলি সামগ্রী আছে, যাহার গায়ে বিবর্জ্জনের একটু আঁচ লাগিলেই তাহার মূল্য তদ্দণ্ডে বিলুপ্ত হইয়া যায়;—যেমন সরলতা। সরলতা খাঁটি হইলেই তবে তাহা সরলতা নামের যোগ্য—মাঝামাঝি সরলতা সরলতাই নহে। এই জন্য "অকপট" বলিলেই কপটের ঠিক্ উল্টা বুঝায়—সরলতা বুঝায়। অতএব দুইটি দ্বার দিয়া বর্জ্জন ভাবের গণ্ডির ভিতরে বৈপরীত্যের ভাব প্রবেশ করে,—একটি হচ্চে লৌকিক ভদ্রতা রক্ষা, আর একটি হচ্চে খাঁটি বস্তুর বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা। শেষোক্ত দ্বার দিয়া বৈপরীত্য কেবল নয়—বৈপরীত্যের লাঙ্গুল ধরিয়া অনেক সময় হেয়তা অর্থও বিবর্জ্জনের গণ্ডির মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে। ইষ্ট বস্তুর গাত্রে বিবর্জ্জনের একটু আঁচ লাগিলেই তাহা জাতিচ্যুত হইয়া হেয় পদবীতে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম অতীব ইষ্ট বস্তু এইজন্য বিধর্ম্ম (অর্থাৎ আশপাশের ধর্ম্ম) লোকের চক্ষে অনেক সময়ে সাক্ষাৎ পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুপথ অতীব ইষ্ট বস্তু, এইজন্য বিপথ (অর্থাৎ আশপাশের পথ) কুপথেরই সামিল। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে,

যে বি-উপসর্গের পার্শ্বপ্রবণতা, বিবর্জ্জন, বৈপরীত্য, হেয়তা এই চারিপ্রকার অর্থ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত রহিয়াছে।

এই সুযোগে অপ-উপসর্গের ব্যাপারটা এক কথায় চুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে; সে কথাটি এই যে, বিবর্জন এবং হেয়তা বি-উপসর্গের গৌণ অর্থ, কিন্তু অপ-উপসর্গের তাহাই মুখ্য অর্থ। তাহার সাক্ষী—

হেয়তা অর্থ ... ... { অপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম
অপকর্ম্ম, বিকর্ম্ম
অপদেবতা

বিবর্জ্জন অর্থ ... ... { অপবর্জ্জন, বিবর্জ্জন
অপগত, বিগত
অপেত, বীত

ইংরাজীতে অপ = ab ; তাহার সাক্ষী

abnormal = অপ-normal

abdicate = অপবর্জ্জন

বিবর্জ্জন এবং হেয়তা এই দুই অর্থে বি-উপসর্গের এবং অপ-উপসর্গ উভয়েই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া অপ-উপসর্গ কখন কখন ইংরাজিতে de (অর্থাৎ বি) মূর্ত্তি ধারণ করে; তেমনি আবার, ab (অর্থাৎ অপ) উপসর্গ কখন কখন দেশীয় ভাষায় বি-মূর্ত্তি ধারণ করে; তাহার সাক্ষী—

অপযশ = defamation ;

to abstain = বিরত হওয়া।

অপ-উপসর্গ সম্বন্ধে এই যাহা ইঙ্গিত করিলাম ইহাই যথেষ্ট; কেননা, উহার অর্থ এত স্পষ্ট যে, তদুপলক্ষে অধিক বাক্য ব্যয় করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। একস্থলে কেবল অপ-উপসর্গের একটু প্যাঁচাও অর্থ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিবর্জ্জনের সহিত পার্শ্ব-প্রবণতার সম্বন্ধ যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে এখন আর সে অর্থ কাহারো নিকটে অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অপাঙ্গ শব্দের অপ-উপসর্গে পার্শ্বপ্রবণতা, হেয়তা এবং বিবর্জ্জন তিনই এক সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। অপাঙ্গ শব্দের অর্থ নয়নের কোণ। যাহা আদরের বস্তু তাহাকে আমরা নয়নের সম্মুখে আনয়ন করি, কিন্তু যাহাকে আমরা দেখিতে না পারি, তাহাকে আমরা নয়নের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলি, আর সে ব্যক্তি পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলে তাহার প্রতি আমরা নয়নের কোণ দিয়া আড়-ভাবে দৃষ্টি করি—"এখনো আছে কি গিয়াছে গেলে আপদ যায়" এই ভাবে দৃষ্টি করি। অপাঙ্গের পার্শ্ব-প্রবণতার সহিত পরিবর্জ্জনের এইরূপ ব্যঙ্গব্যঞ্জক সম্বন্ধ (Correspondence) দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় ব্যাপারে অপাঙ্গের ওরূপ বিষাক্ত অর্থ

একেবারেই উল্টাইয়া গিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টি অমৃত-দৃষ্টিরই নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়; কেন যে, এরূপ হয়, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে;—প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে নয়নের সম্মুখে আনয়ন করিবার ভরপুর ইচ্ছা থাকিলেও প্রণয়িনী লজ্জাবশতঃ সে ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়; কাজেই সেরূপ স্থলে অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রকৃত অপাঙ্গ দৃষ্টি নহে—তাহা অপাঙ্গ দৃষ্টির ভাণ মাত্র। অপাঙ্গ দৃষ্টি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—

(১) চক্ষেরই অপাঙ্গদৃষ্টি কিন্তু মনের সম্মুখ দৃষ্টি—যেমন দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার অপাঙ্গ দৃষ্টি।

(২) চক্ষেরই সম্মুখ দৃষ্টি, কিন্তু মনের ভীষণ অপাঙ্গ দৃষ্টি—যেমন ওথেলোর প্রতি ইয়াগো'র অপাঙ্গ দৃষ্টি।

(৩) মন এবং চক্ষু দুয়েরই অপাঙ্গ দৃষ্টি—যেমন ক্যালিবানের প্রতি মিরাণ্ডার অপাঙ্গ দৃষ্টি।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহা তাহা গন্ধ; এই জন্ত বর্ত্তমান স্থলে অপাঙ্গ বলিতে তৃতীয় শ্রেণীর সাদাসিধা অপাঙ্গ ভিন্ন প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেঁদো অপাঙ্গ বুঝাইতে পারে না।

অতঃপর বি-উপসর্গের মধ্যে বিশেষত্ব কোনখান দিয়া প্রবেশ করে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যা'ক্।

বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে তৎপূর্ব্বে শেষ শব্দের অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক,—

শেষ = পরিণাম = পর্য্যবসান = পরিসমাপ্তি।
শিষ্ট = পরিণত = পর্য্যবসিত = পরিসমাপ্ত।

শিষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ—ইংরাজিতে যাহাকে বলে finished gentleman। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, শিষ্টাচার = শিষ্টোচিত আচার ব্যবহার = যাঁহাদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে—যাঁহারা finished হইয়াছেন—তাঁহাদের অনুযায়ী আচার ব্যবহার। শিষ্ট শব্দের অর্থ এই যে, যাহাকে finish করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণকার বিদ্যালয়ের যেরূপ বিপর্য্যয় শিক্ষা-প্রণালী তাহাতে বালকদিগকে finish করিয়া তুলিতে গিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবেই finish করা হইয়া থাকে অর্থাৎ একেবারেই মারিয়া ফেলা হইয়া থাকে। শিক্ষা-শব্দের অর্থ finish করিবার ইচ্ছা। শেষের অর্থ যখন জানিতে পারা গেল, তখন বিশেষের অর্থ জানিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইবে না। শেষের অর্থ যখন পরিসমাপ্তি, তখন বি-শেষের অর্থ বি-পরিসমাপ্তি অর্থাৎ আশপাশের শাখার পরিসমাপ্তি, ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। নিম্নে প্রণিধান করা হোক,—

de = বি;
termination = শেষীকরণ;

determination = বিশেষীকরণ।

বিশেষিত হওয়া = নানাদিকের একটা কোন দিকে determination হওয়া
= নানা শাখার একটা কোন শাখার পরিসমাপ্ত হওয়া।

বস্ত্রের ভাব একটি সামান্য ভাব; এই সামান্য ভাবটির গাত্রে আমি যদি শ্বেত-বর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা একতর শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—শ্বেতবস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়; উহার গাত্রে আমি যদি শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে পীতবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—পীত বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়; উহার গাত্রে যদি নীলবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা তৃতীয় আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—নীল বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তির নামই বিশেষ প্রাপ্তি। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, "Jack of all trades is master of none" যে ব্যক্তির সব কাজই কিছু কিছু আসে, সে ব্যক্তি কোন কাজেই সুপরিপক্ক নহে। এক এক ব্যক্তি এক একটি কার্য্যে লাগিয়া থাকিয়া তাহাতেই সে পরিপক্কতা লাভ করে—পরিপক্কতা লাভ করিয়া অপরাপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে বিশেষিত বা বিপরিসমাপ্ত হয়; আর, সেই সঙ্গে সাধারণ লোক-মণ্ডলীর আশপাশ দিয়া নানাপ্রকার শাখা-মণ্ডলী বিনির্গত হইয়া পরস্পর হইতে উত্তরোত্তর পৃথক্‌রূপে বিশেষিত হইতে থাকে—সাধারণ লোক-মণ্ডলী নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলী, কৃষকমণ্ডলী, বণিক্‌মণ্ডলী, কারিকরমণ্ডলী, সেনামণ্ডলী, এইরূপ বিভিন্ন শাখা-মণ্ডলীতে পরিসমাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি = বিপরিসমাপ্তি = বিশেষ প্রাপ্তি। পার্শ্ব-প্রবণতার সহিত বিশেষত্বের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিয়াই আমরা বলিতেছি যে, বি-উপসর্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অর্থের দ্বার দিয়া শেষোক্ত অর্থ প্রবেশ করিয়াছে—পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেবল এই একটি কথা বলিবার আছে যে, তুমি বলিতেছ বটে যে, পার্শ্বপ্রবণতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তাহাই যে ঠিক্ তাহা কে বলিল? তাহার পরিবর্ত্তে আমি যদি বলি যে, বিশেষত্বের দ্বার দিয়া পার্শ্ব-প্রবণতা প্রবেশ করিয়াছে, তবে তাহাতে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে, তাহাতে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয়; তাহার সাক্ষী—

প্র উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা;
নি উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ অন্তর্নিষ্ঠতা;
সং উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা;

সমস্তই দিক্ দেশের সম্বন্ধ-সূচক। বি উপসর্গ তখন উহাদেরই দল-ভুক্ত তখন এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, তাহারও মুখ্য পরিচয় লক্ষণ, উহাদেরই অনুরূপ দিক্‌দেশের সম্বন্ধসূচক।

অতঃপর পরিবর্ত্তন এবং অসামঞ্জস্য এই দুই ভাব বি উপসর্গের মধ্যে কোথা হইতে কি সূত্রে প্রবেশ করে, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক।

সুবিখ্যাত ডারুইন এক জোড়া কপোত লইয়া তাহাদের বংশানুক্রমে বিশিষ্টতম লম্বপুচ্ছদিগের জোড়া মিলাইয়া অল্পকালের মধ্যে তদুৎপন্ন সন্তান-সন্ততির আকার এরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, পরিশেষে সেই কপোত বংশে কপোত এবং ময়ূরের মাঝামাঝি একটা জাতি-বিশেষ ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে Variety হইতে Species-এর উদ্ভাবন, ব্যাকৃতি হইতে বৈজাত্যের উদ্ভাবন, অর্থাৎ আকৃতি পরিবর্ত্তন হইতে বিশেষ জাতির উৎপত্তি। পরিবর্ত্তন এবং বিশেষত্ব দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, বি উপসর্গের পরিবর্ত্তন-সূচকতা, পার্শ্ব-প্রবণতা, বিহীনতা এবং বিশেষত্ব এই চারি দ্বারের প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই অসামঞ্জস্যের ভাব অতি সহজে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমতঃ বৈষম্য ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতেই পারে না; তাহার সাক্ষী পৃথিবীতে শীতোষ্ণের বৈষম্যই বায়ুর দিক্ পরিবর্ত্তন এবং চাল পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ বৈষম্যের যথোপযুক্ত মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইলেই পরিবর্ত্তনের স্রোতঃ বাহত বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার অসামঞ্জস্যে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার পার্শ্ব দিয়া প্রদর্শনীর গোরুর পঞ্চম চরণের ন্যায় ক্যাকড়া বাহির হইলে তাহা অসামঞ্জস্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া দর্শকের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়। চতুর্থতঃ কোন একটি বস্তু অঙ্গহীন হইলে তাহা হইতে অসামঞ্জস্য বিজৃম্ভিত হয়। পঞ্চমতঃ কোন একটি বস্তুর বিশেষত্ব অতিমাত্র পরিস্ফুট হইলে, চতুর্দ্দিকস্থ আর আর বস্তুর সহিত তাহার মিল থায় না—তাহারই নাম অসামঞ্জস্য। বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটনা; কিন্তু জ্বর বিকারের বিকার একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন ঘটনা। বিসদৃশ শব্দের মুখ্য অর্থ সাদৃশ্য হইতে পার্শ্বে বিচ্যুত, কিন্তু তাহার প্রচলিত অর্থ খাপছাড়া বা বেমানান্। বিকল শব্দের মুখ্য অর্থ কলাহীন বা অঙ্গহীন কিন্তু বিকল অবস্থা বলিলে বুঝায় যে তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির মর্ম্ম গ্রন্থি সকল অব্যবস্থিত ভাবে ছিন্ন ভিন্ন। বিকট শব্দের মুখ্য অর্থ বিশেষরূপে পরিস্ফুট, কিন্তু "বিকট শব্দ" বলিলে বুঝায় অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর শব্দ।

নানাদিক্ দিয়া আমরা এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি যে, পার্শ্বপ্রবণতা, বিহীনতা, বৈপরীত্য, শ্রেষ্ঠতা, বিশেষত্ব, পরিবর্ত্তন, অসামঞ্জস্য, সমস্তেরই মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ ভাবের মিল রহিয়াছে। অতএব প্রথমে যেমন আমাদের মনে হইয়াছিল—বি উপসর্গ কেমন করিয়া না জানি অতগুলা ভাবের বোঝা একাকী বহন করে—এক্ষণে তাহার ধন্দ অনেকটা মিটিয়া গেল; আর, সেই সঙ্গে এটাও বুঝিতে পারা গেল যে, বি উপসর্গের মুখ্য অর্থ পার্শ্বপ্রবণতা।

প্র, বি, এবং সং এই তিন উপসর্গের উদাহরণ-মালা ইতিপূর্ব্বে যাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি—সাহিত্যের উদ্যান হইতে ফুল তুলিয়াই আমরা সে মালা গাঁথিয়াছি। এবারে, দর্শনারণ্য হইতে রুদ্রাক্ষ ফল সংগ্রহ করিয়া আর এক রকমের মালা গাঁথিবার উপক্রম করিতেছি ;—তাহা দার্শনিকদিগের কাজে লাগিতে পারে।

উদাহরণ-মালা।

প্রচার = সম্মুখে ব্যাপ্তি
বিচার = বিশেষে ব্যাপ্তি
সংচার = সাকল্যে ব্যাপ্তি
[যেমন ইস্পঞ্জের অভ্যন্তরে জলের সঞ্চার]

প্রকার (process) = সম্মুখস্থিত লক্ষ্যের সাধনোপযোগী কার্য্য
বিকার = আশপাশে ছটকিয়া পড়া লক্ষ্যহীন কার্য্য
সংস্কার = অন্তঃকরণে কেন্দ্রীভূত বীজরূপী কার্য্য

প্রজ্ঞা = সম্মুখবর্ত্তী অপরোক্ষ তত্ত্ব জ্ঞান
বিজ্ঞান = পার্শ্ব-ঘেঁসা আপেক্ষিক (অর্থাৎ relative) তত্ত্ব জ্ঞান
সংজ্ঞা = কেন্দ্র স্থানীয় বীজ জ্ঞান

উপরি-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত গুলির মধ্যে, বিচার, সংস্কার, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং সংজ্ঞা, এই পাঁচটি শব্দের মুখ্য অর্থ অবধারণ করা, দর্শনতত্ত্বান্বেষীদিগের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বিচার বলে কাহাকে ? চার = চালনা। ফোড়ায় অস্ত্র চালনা করা হইতেছে, আর, ফোড়ায় অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে, দুয়ের অর্থ একই ; তা ছাড়া দাঁড় চালনা করা আর দাঁড় ply করা একই। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, চার = চালনা = প্রয়োগ = to apply। বিচার = বিশেষে চারণ = বিশেষে প্রয়োগ। মনে কর এক ব্যক্তির হস্তে আর ব্যক্তির নামাঙ্কিত ঘড়ি ধরা পড়া'তে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্য অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। বিচারপতি এ অবস্থায় কি করেন ? প্রথমে সাক্ষিগণের মুখে ঘড়ি স্থানান্তরিত হইবার বিশেষ বিবরণ অবগত হ'ন ; তাহার পরে, সেই বিশেষ বিবরণের অঙ্গীভূত ধৃত ব্যক্তির আচরিত বিশেষ কার্য্যটিকে চৌর্য্য বলা যাইতে পারে কি না, তাহা মনে মনে বিচার করেন ; যাহা তিনি করেন তাহা আর কিছু না—চৌর্য্যের স্বরূপ নির্ব্বাচন (definition) যাহা বিধান-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই তিনি উপস্থিত ঘটনাতে চারণ করেন বা প্রয়োগ করেন ;—ইহার নাম বিশেষে সামান্যের চারণ—ইহারই নাম বিচার।

সংস্কার শব্দের অর্থ কি ? সাধনীয় কার্য্যের নানা ডালপালা অন্তঃকরণ-মধ্যে বীজ ভাবে কেন্দ্রীভূত থাকিলে তাহাকেই আমরা বলি সংস্কার ; সুতরাং সংস্কার শব্দ সং উপ-

সর্পের কেন্দ্রাভিমুখিতার বিশেষ একটি প্রমাণ স্থল। যখন দেখিতেছি যে, হংস-শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইবাই জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ করে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, সন্তরণ করিতে হইলে যতপ্রকার পদ-চালনা কার্য্য আবশ্যক, সমস্তই হংসের অন্তঃকরণে বীজ-ভাবে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে ; সেই কেন্দ্রীভূত কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমরা বলি যে জলে সন্তরণ করা হংসের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রজ্ঞাতব্য বিবেক। সম্মুখবর্ত্তী জ্ঞাতব্য বিষয়কে আশপাশের সমস্ত ডালপালা হইতে বিবিক্ত করিয়া জানা = খোসা ছাড়াইয়া শাঁস গ্রহণ করা = প্রজ্ঞা। গণিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান—সমগ্র জ্ঞানবৃক্ষের বিশেষ বিশেষ শাখা প্রশাখা ; এইজন্য সমগ্র জ্ঞানের তুলনায় বলা যাইতে পারে

বিজ্ঞান = বিশেষ বিশেষ শাখায় পরিসমাপ্ত বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান

= Science

প্রজ্ঞা করে কি ? না নানা বিজ্ঞানপ্রবাহিণীর সাগরসঙ্গম হইতে সার মন্থন করিয়া মনুষ্যের পরমপুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথা-সম্ভব তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করে ; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে

প্রজ্ঞা = ফলজ্ঞান = Wisdom

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রজ্ঞা অগ্রে কি বিজ্ঞান অগ্রে ? ফল জ্ঞান অগ্রে কি শাখা জ্ঞান অগ্রে ? ইহার উত্তর এই যে এক হিসাবে ফল অগ্রে, আর এক হিসাবে শাখা অগ্রে। ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা বাহির হয় সুতরাং ফল অগ্রে। আবার শাখা হইতে বৃন্ত, বৃন্ত হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল বাহির হয়, সুতরাং শাখা অগ্রে। অতএব ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মূলও বটে—ফলও বটে ; তাহার সাক্ষী—বেকন্ এবং দে-কর্ত্তার প্রজ্ঞা-বাণীগুলি আরিস্ততেলিক এবং আরবিক বিজ্ঞানের ফল, কিন্তু নিউটনিক বিজ্ঞানের মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রজ্ঞা-বাণী গুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার ফল এবং ভারতবর্ষের মধ্যযাব্দীয় বিজ্ঞানের মূল। লোকসমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে ; তাহার পরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করে ; তাহার পরে শিক্ষিত বিজ্ঞানকে সংসার-ক্ষেত্রে খাটাইয়া বহুদর্শিতা-সূত্রে প্রাজ্ঞ হইয়া উঠে। যাঁহারা বিদ্বান্ মাত্র, তাঁহারা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং শাস্ত্রের উদাহরণদ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রেত মত সমর্থন করেন ; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্র এবং যুক্তির কাথ বাহির করিয়া লইয়া এবং তাহার দিটি পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বপুরুষেরা প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; আর অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য অনন্ত নামক একটা বৃহৎ সর্পের কল্পনা করিয়াছিলেন। "পৃথিবী

অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত" এ কথাটি শুনিতে খুব সহজ ; কিন্তু প্রথমে ঐ কথাটি যাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তিনি তাঁহার তৎকালোচিত বহুদর্শিতায় নিউটন অপেক্ষা যে, কোন অংশে ন্যূন ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিউটন বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিলেন যে পৃথিবী ভারাকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কৃত তত্ত্বটির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের প্রজ্ঞাবাণীর তুলনায় তাহা শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বচনের ন্যায় অসম্পূর্ণ—যদিচ বিজ্ঞান অংশে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা "পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত" বলিলে তাহার পরেই আইসে যে সূর্য্য কিসের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত" ; যদি বল যে সূর্য্য সূর্য্যান্তরের আকর্ষণের "উপর প্রতিষ্ঠিত" তবে তাহার পরেই আইসে যে "সূর্য্যান্তর কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত" যদি বল যে, "সূর্য্যান্তর অবশিষ্ট জগতের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত" তবে তাহার পরেই আইসে যে "অবশিষ্ট জগৎ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত" ; যদি বল যে, "অবশিষ্ট জগৎ স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ আপনার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত"—তাহা বলিতে পার না ; কেননা যদি জড়জগতের বড়ই হউক আর ছোটই হউক্ কোন একটি অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তবে পৃথিবী কি দোষ করিল ? পৃথিবী স্বপ্রতিষ্ঠিত না হয় কেন ? তা শুধু নয়—পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুই স্বপ্রতিষ্ঠ না হয় কেন ? "প্রত্যেক জড় বস্তু এবং জড়-বস্তু-সজ্ঘ অন্যের আকর্ষণে বিধৃত" এই না তোমার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত ? তবে আর তুমি কিরূপে বলিবে যে, জগতের অমুক অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ ! প্রজ্ঞা কিন্তু আশপাশে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন যে, পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার উপরে আর কাহার কোন কথা চলিতে পারে না। কেহ যেন ভুল না বোঝেন—এরূপ না মনে করেন যে, যাহা ধরিতে ছুঁতে পাওয়া যায় না, এইরূপ ঐকান্তিক তত্ত্ব লইয়া—অর্থাৎ একটা ঋজু রেখার দুই অন্ত নাই কেবল এক অন্ত আছে এইরূপ ঐকদেশিক (Abstract) তত্ত্ব লইয়া—প্রজ্ঞার যত কিছু বাণিজ্য ব্যবসায়। প্রজ্ঞার নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল তোমার আমার চক্ষে ঐকান্তিক বা ঐকদেশিক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না—ইহা সত্য ; কিন্তু এটাও তেমনি সত্য যে, যাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞান-দূরবীক্ষণের একান্ত এবং অপরান্ত উভয় অন্ত সমসূত্রে মিলাইয়া তাহার মধ্য দিয়া অনন্তের প্রতি পরিষ্কার সম্মুখ-দৃষ্টি প্রসারণ করেন ; আর তাঁহাদের সেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁহারা যাহা অবলোকন করেন, তাহা সমীচীন সত্য বই আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তের প্রতি তুমি আড় দৃষ্টি প্রয়োগ করিতেছ—কাজেই তোমার অনন্ত একটা ঐকান্তিক অর্থাৎ (Abstract) আবছায়া মাত্র ; কিন্তু আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্য-মণ্ডলী যাঁহারা নিখিল জগৎ সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের প্রতি সম্মুখ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনন্তও কি তোমার আমার অনন্তের ন্যায় অপদার্থ এবং শূন্য একান্ত মাত্র, Abstraction মাত্র, তাহা হইতেই পারে না। তাঁহাদের দুই একটি কথার আভাসে

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের অনন্ত অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ-সত্য, আর তাহা তাঁহাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ বিরাজমান। অতএব এটা স্থির যে, প্রজ্ঞা শব্দের আদিতে প্র, আর বিজ্ঞান-শব্দের আদিতে বি, দুই শব্দের আদিতে যে দুই উপসর্গ বসিয়াছে—ঠিক্‌ই বসিয়াছে। প্রজ্ঞা=জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ অপরোক্ষ তত্ত্বের উপলব্ধি, তাই তাহার আদিতে প্র; বিজ্ঞান=সমগ্র সত্যের আশ পাশ দিয়া পরিস্ফুটিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা প্রশাখা-সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি। এখন সংজ্ঞা কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

প্রজ্ঞা=ফলজ্ঞান (Wisdom);

বিজ্ঞান=শাখাজ্ঞান (Science);

সংজ্ঞা=বীজজ্ঞান (Consciousness)।

বীজজ্ঞানে ফলজ্ঞান এবং শাখাজ্ঞান দুইই অপরিস্ফুট আকারে সমাহিত রহিয়াছে বা কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, আর, সেই সমাহিত ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংজ্ঞা শব্দের আদিতে সং উপসর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। সং কি? না একত্র সমাহিত অর্থাৎ এক স্থানে জড়। সংজ্ঞা কি? না একস্থানে কেন্দ্রীভূত বীজজ্ঞান। কোন্ স্থানে? না জ্ঞাতার অন্তঃকরণে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা, শাখা হইতে ফল; তেমনি সংজ্ঞা হইতে (Consciousness হইতে) লৌকিক জ্ঞান বা বিষয় বুদ্ধি বা Common sense, বিষয় বুদ্ধি হইতে বিজ্ঞান বা Science, বিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞা বা Wisdom। Consciousness হ'চ্চে বীজ, বিষয় বুদ্ধি হ'চ্চে অঙ্কুর, বিজ্ঞান হ'চ্চে ডালপালা, প্রজ্ঞা হচ্চে ফল। ধান্য যখন মাটির ভিতরে থাকে তখন তাহা বীজ; যখন তাহা শীষের আগায় বিরাজ করে, তখন তাহা শস্য। এক গাছের শস্য যেমন আর এক গাছের বীজ হইতে পারে, তেমনি এককালের প্রজ্ঞা আর এককালের সংজ্ঞা হইতে পারে; তাহার সাক্ষী—বেদোপনিষদ্ মহাভারত রামায়ণ বাইবেল এবং সেক্ষপিয়রের প্রজ্ঞাবাণী এক্ষণে জন সাধারণের সংজ্ঞার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ এইরূপ হইয়াছে যেন সে-সকল মহাবাক্য জন্মাবধি সকলেরই অন্তঃকরণে বদ্ধমূল। সং এবং আধান এই দুয়ের যোগে সমাধান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাধি কি? না একত্র সমাধান—একত্র সমাবেশ—সমস্ত মনোবৃত্তি একস্থানে জড় করা। "বাণ সন্ধান করা হইতেছে" বলিলে বুঝায়—সমস্ত মনোবৃত্তি বাণের সহিত একযোগে লক্ষ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। সং উপসর্গ সংজ্ঞা শব্দের আদিতে বসিয়া ইঙ্গিতচ্ছলে বিজ্ঞাপন করিতেছে যে, জ্ঞানের সমস্ত ভাবী শাখা প্রশাখা এবং ফলফুল শিশুর সংজ্ঞার ভিতরে জড়িপুঁটুলি হইয়া রহিয়াছে সংজ্ঞারূপী মুকুলের অভ্যন্তরে তাহার আশপাশের পাপড়ি—বিজ্ঞান, এবং সম্মুখের বীজ-কোষ প্রজ্ঞা, দুইই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম তাহার আদ্যোপান্ত স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে

প্র-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা
বি-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্শ্ব-প্রবণতা
সং-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা ।

অতঃপর পরি-উপসর্গের কিরূপ অর্থ তাহা দেখা যা'ক্। বি-উপসর্গের লক্ষ আশ-পাশে ; পরি-উপসর্গের লক্ষ্য চতুর্দ্দিকে ; তাহার সাক্ষী—

পরিধি = circumference
পর্য্যায় = পরি + আয় = ঘুরে ফিরে আসা ।
পর্য্যায়-ক্রমে = পালা-ক্রমে = periodically ।

প্রকৃত প্রবন্ধ এ যাত্রা এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। এখনও ন্যূনাধিক দ্বাদশ উপসর্গ অবশিষ্ট আছে, আর তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার কিছু না কিছু বলিবার আছে। বারান্তরে সমস্তই নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিব। অতঃপর যাহা আসিতেছে, তাহা আমি দুইজন শ্রদ্ধের প্রবীন ব্যক্তির সৎপরামর্শ হেলন করিতে না পারিয়া পরিশিষ্ট বেশে অত্র সহ চালাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। দুইজনই জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়—একজন হ'চ্চেন ধর্ম্মবুদ্ধি, আর একজন হ'চ্চেন বিষয়বুদ্ধি। ধর্ম্মবুদ্ধি আমার দক্ষিণকর্ণে মন্ত্র দিতেছেন যে, অভ্যাগত অতিথিকে ফিরাইতে নাই ; বিষয়বুদ্ধি আমার বামকর্ণে মন্ত্র দিতেছেন যে, বিশেষতঃ যখন তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার ভাবী উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ধর্ম্মবুদ্ধির বচন শিরোধার্য্য করিয়া আমার মন বলিতেছে যে, পরিশিষ্টাংশ যখন প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক প্রবন্ধের অভ্যন্তরে আশ্রয় দেওয়া হউক ; বিষয়-বুদ্ধির পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া আমার মন বলিতেছে যে, পরিশিষ্ট অংশ যখন সাহিত্য-সেবকদিগের কাজে লাগিতে পারে, তখন বিশেষ যত্ন-সমাদরের সহিত তাহার অবয়ব-পুষ্টির ব্যবস্থা করা হউক—বিধিমতে অতিথি-সৎকার করা হউক্। আমার দুই পার্শ্বের দুই গুরু-তুল্য মন্ত্রণা-দাতা উভয়ে একবাক্যে আমাকে যাহা করিতে বলিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি—আমার তাহাতে কোন অপরাধ নাই।

পর্য্যায় এবং পালার মধ্যে মর্ম্মান্তিক (অর্থাৎ অস্থি মজ্জাগত) অভিন্নতা-সম্বন্ধে কাহারও মনোমধ্যে যদি কোন প্রকার "কিন্তু" বা দ্বৈধ থাকে, তবে তিনি নিম্নে প্রণিধান করুন্ :—

ঘোরা = to turn } ইহা হইতে আসিতেছে যে {
∵ পর্য্যায় = পরে পরে যুরে আসা
∴ পর্য্যায়-ক্রমে = by turns ………ক
∵ your turn = তোমার পালা
∴ by turn = পালা ক্রমে ………………খ
}

ক বলিতেছে যে, পর্য্যায়ক্রমে = by turns }
খ বলিতেছে যে, by turns = পালাক্রমে } অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে,

পর্য্যায়-ক্রমে = পালা-ক্রমে।

এ যেন হইল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; সেটা এই যে, পর্য্যায়ের পালা স্বতন্ত্র, আর ডালপালা'র পালা স্বতন্ত্র। এরূপ দ্বৈধস্থলে কর্ত্তব্য যাহা তাহা এই :—

ক ১ ॥ যখন নবাবি চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, চলন হইতে চাল আসিয়াছে।

ক ২ ॥ যখন আতপ চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তণ্ডুল হইতে তাঁড়ুল আসিয়াছে, তাঁড়ুল হইতে তাউল আসিয়াছে, তাউল হইতে চাউল আসিয়াছে।

খ ১ ॥ যখন গাছের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দারু হইতে ডাল আসিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে, দারুকে ডাল বলিলে দারু-শব্দের নিতান্তই ব্যাপ্তি-সংকোচ করা হয়, যেহেতু দারু-শব্দের অর্থ কাষ্ঠ। ইহারই জুড়ি আর একটি কথা এই যে, পানীয় শব্দ হইতে খোট্টার ব্যবহার্য্য পানী (জল) আসিতে পারে না; যেহেতু পানীয়কে জল মাত্র বলিলে দুগ্ধাদিকে পানীয়ের কোটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া পানীয় শব্দের ব্যাপ্তি-সংকোচ করা হয়। আপত্তিকারীর জানা উচিত যে, কার্য্য-গতিকে অনেক সময় মূল-শব্দের ব্যাপ্তি-সংকোচ অনিবার্য্য। কাঠুরে কুড়ালের ঘায়ে প্রথমেই গাছের এক পার্শ্ব কাটিয়া ফেলে। সেই কর্ত্তিত খণ্ডের শাখাংশই জ্বালানি কাঠ, অবশিষ্ট অংশ পল্লব। এইরূপে পাইতেছি যে,

শাখাপল্লব = শাখা + পল্লব = জ্বালানি কাঠ + পল্লব = দারু + পল্লব = দারুপল্লব = ডালপালা।

খ ২ ॥ যখন মুগের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

যেমন, মেজে = মার্জ্জ্য = মার্জ্জিতব্য অর্থাৎ মার্জ্জনী দ্বারা কিনা ঝাঁটা দ্বারা মার্জ্জিতব্য; তেমনি, ডাল = দাল্য = দলিতব্য অর্থাৎ জাঁতায় দলিতব্য। দলিয়া (অর্থাৎ ডলিয়া) বাহির করা হয়, তাই দাল্য বা ডাইল।

অতএব যেমন কল্য হইতে কাল্ আসিয়াছে, তেমনি, দাল্য হইতে ডাল আসিয়াছে।

গ ১ ॥ যখন গাছপালার কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পল্লব হইতে পালা আসিয়াছে।

গ ২ ॥ যখন তস্কর-ভীত ব্যক্তি-গণের মধ্যে পালা-ক্রমে রাত জাগিয়া চৌকি দিবার কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

পর্য্যায় হইতে পর্য্যা আসিয়াছে, পর্য্যা হইতে পালা আসিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য! পর্য্যায়ের যঁ ল-বেশ ধারণ করিয়া পালা-শব্দের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া বসিয়া আছে! এইরূপেই—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া গাঙ্গুর্য্যের র্য গাঙ্গুলির মধ্যে এত কাল ধরিয়া অজ্ঞাত বাস করিয়া আসিতেছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্তও কেহ এরূপ প্রশ্ন করিল না যে, চট্টোপাধ্যায় চাটুয্যে, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁড়ুয্যে, মুখোপাধ্যায় মুখুয্যে—একা কেবল গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলি হইল কি অপরাধে!

আমি কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, গাঙ্গুলির উলি, মুখুয্যে-চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যের উর্য্যে ভিন্ন আর কিছুই নহে। পালার মূল বৃত্তান্ত আর গাঙ্গুলির মূল বৃত্তান্ত অবিকল একই রূপ; তাহার সাক্ষী—

পর্য্যায় = পর্য্যা = পালা }
গাঙ্গুর্য্যো = গাঙ্গুলি }

লোকে বলে যে, গঙ্গোপাধ্যায় হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় হইতে চাটুয্যে হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় হইতে মুখুয্যে হইয়াছে—ইত্যাদি। কোন কোন শব্দাচার্য্য উপাধ্যায় শব্দের উপরে আসুরিক অস্ত্র চিকিৎসা চালাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। প্রথম উদ্যমেই তাঁহারা উপাধ্যায়ের পা কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে উধ্যায় করেন; তাহার পরে সুদীর্ঘ উপবাসের শোষণে উধ্যায়ের কণ্ঠের হাড় বাহির করিয়া তাহাকে উধ্যা করেন; তাহার পরে ক্রমান্বয়ে উধ্যাকে পিটিয়া উজ্যা এবং উজ্যাকে ঈষৎ বাঁকাইয়া উয্যে করিয়া ছাড়িয়া দেন। উপাধ্যায় যখন উয্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি এক আঁচড়েই বুঝিতে পারিলাম যে, সে উয্যে কোন কার্য্যেরই নহে—যেহেতু তাহার মাথায় রেফ নাই। উপাধ্যায়ের উধ্যাকে যতই কেন মুচড়াও না,—কিছুতেই সে বাগ মানিবে না; কেননা উধ্যা হইতে রেফ-যুক্ত উর্য্যা বাহির করা দেবতারও অসাধ্য। তুমি হয় তো বলিবে যে, "রেফে আমার প্রয়োজন নাই—আমি ইংরাজিতে নাম স্বাক্ষর করিবার সময় Mookerjy না লিখিয়া Mookejjey লিখিব; কিন্তু তাহা বলিলে চলে কই! রেফে তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে—কিন্তু আমার নিকট তাহা বহুমূল্য সামগ্রী; যেহেতু আমি অনেক চিন্তা ব্যয় করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়াছি যে, গাঙ্গুর্য্যের রেফের মধ্য দিয়া গাঙ্গুলির লি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। রেফ উর্য্যের শিখা মাত্র নহে যে, তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলেই হইল—রেফ ফণীর মণি; রেফ গেলে উর্য্যের সবই যায়। ব্যাকরণের সন্ধি হইতে পাইতেছি যে,

রি + অ = র্য্য

তা'ছাড়া, বস্তুতই য'য়ে য-ফলা দিয়া তাহাতে রেফ দিলে তাহার প্রকৃত উচ্চারণ র্জ নহে—তাহার প্রকৃত উচ্চারণ রিঅ। রিঅ যে অ ফেলিয়া দিয়া রি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা তো হইতেই পারে; তার সাক্ষী

চাতুর্য্য = চাতুরি অ = চাতুরি ;

মাধুর্য্য = মাধুরি অ = মাধুরি।

এইরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, র্য্য হইতে রি অতি সহজে আসিতে পারে ; যখন রি আসিতে পারে তখন লি' ও আসিতে পারে। এমন কি "ডলয়োরলয়োরভেদঃ" এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে রি'এর আর এক নামই লি ; তাহার সাক্ষী—অভিধান খুলিয়া দেখ; দেখিবে যে, অঙ্গুরি এবং অঙ্গুলি উভয়েরই অর্থ আঙ্গুল। এই জন্যই আমি বলি যে, গাঙ্গুর্য্যের রেফের মধ্য দিয়াই গাঙ্গুলির ল বাহির হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে গাঙ্গুলি যেন গাঙ্গুর্য্যে হইতে আসিল—গাঙ্গুর্য্যে স্বয়ং কোথা হইতে আসিল? গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্য হইতে তো নহেই!—আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলিব "গাঙ্গুর্য্যে" আসিয়াছে "গঙ্গার্য্য" হইতে। যদি বল যে, আর্য্য হইতে উর্য্যে আসিবে কেমন করিয়া? তবে তাহার উত্তর এই যে, কদর্য্য হইতে কদুর্য্যি আইল কেমন করিয়া? প্রথমতঃ গঙ্গার্য্য হইতে গাঙর্য্য অতি সহজেই আসিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ কদর্য্য হইতে যেমন করিয়া কদুর্য্যি আসিয়াছে, গাঙর্য্য হইতে তেমনি করিয়া গাঙুর্য্যি আসিয়াছে; তৃতীয়তঃ পর্য্যা হইতে যেমন করিয়া পাল্যা আসিয়াছে, গাঙুর্য্যি হইতে তেমনি করিয়া গাঙুলি আসিয়াছে। অতঃপর বক্তব্য এই যে, র্য্য হইতে র্য্যি র্য্যা এবং র্য্যো তিনই অতি সহজে বাহির হইতে পারে। র্য্য হইতে র্য্যি তো বাহির হইতে পারেই, তার সাক্ষী আচার্য্য = আচার্য্যি; তা ছাড়া য্য হইতে য্যা বাহির হইবার পক্ষেও লেশমাত্র বাধা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অকারের মূল উচ্চারণ আকারের সহিত অবিকল সমান—কেবল আকার অপেক্ষা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রস্ব। পণ্ডিত মহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপ বালকদিগকে "কর খল" পড়া'ন, সেরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কুত্রাপি ছিল না—এমন কি বিদ্যাপতির আমলে উহা বঙ্গের কোন স্থানে ছিল কি না সন্দেহ। ব্যাকরণ-শাস্ত্র মানিতে হইলে বলি এবং বলী'র মধ্যে যেরূপ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ—পদ্ম এবং পদ্মা'র মধ্যেও অবিকল সেইরূপ। আর একটি কথা এই যে শব্দের শেষ স্থানীয় স্বর হ্রস্ব হইলেও তাহাকে একটু দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক—কেন না তাহা না করিলে তাহা রীতিমত পরিস্ফুট হইতে সময় পায় না। এই জন্য মাধুরি যদিচ মাধুর্য্য হইতে আসিয়াছে, তথাপি আমরা মাধুরি লিখিবার সময় ইকারটাকে দীর্ঘ করিয়া দিই। অতএব উপবীতের ত হইতে যেমন পইতার তা আসিয়াছে, তেমনি য্য হইতে য্যা অতি সহজেই আসিতে পারে। আর য্যা তো য্যো হইয়াই রহিয়াছে; তাহার সাক্ষী—"সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতে কা'র ভার্য্যে।" আর একটি কথা এই যে আমাদের এই বঙ্গ-ভারতী ভাগীরথী-মাতা'র পার্শ্বচরী হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে পদপ্রসারণ করিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা মৈথিলি ভাষার ন্যায় আধ-খোট্টাই ভাষা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই;

তার সাক্ষী বিদ্যাপতির বাঙ্গালা ভাবা। এইজন্য খুব সম্ভব যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুখুয্যে শব্দ আর থোটাই ছাঁদে উচ্চারিত হইত—'মুখুয্যা' এইরূপে উচ্চারিত হইত। এইরূপ নানাবিধ যুক্তির একত্র সমাধান দ্বারা আমরা পাইতেছি যে মুখুয্যে দুইরূপে আসিতে পারে:—অকারের দীর্ঘ আকার এই সূত্রে একদিক্ দিয়া আমরা পাইতেছি যে,

মুখার্য্যা = মুখয্যা = মুখুয্যো

আর ইকারের গুণ একার এই সূত্রে আর একদিক্ দিয়া পাইতেছি যে

মুখাধ্য = মুখয্য = মুখুর্য্যি = মুখুয্যে

এখনও জিজ্ঞাসা মিটিতেছে না। কেহ বলিতে পারেন—লোকে যে বলে "মুখের মুখুটি"—মুখুটি কোথা হইতে আইল? ইহার উত্তর স্পষ্ট পড়িয়া আছে;—

মাধুর্য্য = মাধুরি অ
মুখুয্যে = মুখুরি অ

অঙ্গুরীয় = অঙ্গুটি
মুখুরিঅ = মুখুটি

র মূর্দ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার স্বর অস্পষ্ট; ট মূর্দ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার টঙ্কার সুস্পষ্ট; অতএব র যে কখন এখন ইতর-ভাষা-পল্লীতে ট-বেশে দেখা দিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। চাটুটি মুখুটিরই সহোদর; কিন্তু চাটুটির দুই ট'য়ে টক্কর টক্করি বাধিয়া গোলোযোগ উপস্থিত হওয়াতে দ্বিতীয় ট প্রথম ট'য়ের নিকটে নরম হইয়া ত হইল—চাটুটি নরমিয়া চাটুতি হইল। চাটুয্যে মহাশয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন—তিনি বলিতে পারেন যে "বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিখিয়াছি কোন্ গাঁই?—চাটুতি গাঁই'—তুমি আমাকে আজ নূতন শিখাইতে আসিয়াছ যে চাটুতি চাটুর্য্যে'র অপভ্রংশ? তোমার তো স্পর্দ্ধা কম নহে!" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে চাটুতি গাঁই বলিয়া যে একটা গাঁই আছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত—মুক্তকণ্ঠে—স্বীকার করিতেছি; কিন্তু চাটুতি গাঁই চট্টগ্রাম হইতে আইল কেমন করিয়া সেটাও তো একবার ভাবিয়া দেখা উচিত! আমি জানি যে যশোহর প্রদেশে নরেন্দ্রপুর বলিয়া একটা গ্রাম আছে; ঐ নামটির উৎপত্তি-বিবরণ আর কিছু না—অনতিপূর্ব্বে ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কোন একটা গ্রামে নরেন্দ্র নামক একজন মাথালো ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ঐ গ্রামটি নূতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার নাম দিলেন নরেন্দ্রপুর। এইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের নামে গ্রামের নামকরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত যে তাহার নিদর্শন পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে; তার সাক্ষী—মুরসিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুরসিদ আলি খাঁ; আমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আমেদ; রামগিরিতে রামচন্দ্র

এক সময়ে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম রাম-গিরি। এরূপ প্রথা কেবল আমাদের দেশেই আবদ্ধ নহে, আমেরিকা-খণ্ডে উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তার সাক্ষী—চিরস্মরণীয় মহাত্মা ওয়াসিঙ্‌টনের নামানুসংজ্ঞিত ওয়াসিঙ্‌টন নগর; পেনের প্রতিষ্ঠিত পেন্সিল্‌বানিয়া উপরাজ্য; ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সহিত আমেরিকার প্রথা-সাদৃশ্যের বিশেষ একটি কারণও আছে; তাহা আর কিছু না—বঙ্গদেশে যেমন এক সময়ে ব্রাহ্মণ-কুলের নূতন পত্তন হইয়াছিল, আমেরিকা প্রদেশে সেইরূপ ইউরোপীয় জন-মণ্ডলীর নূতন পত্তন হইয়াছিল। তা ছাড়া, প্রধান আর একটি কথা এই যে পূর্ব্বতনকালে ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা অধিষ্ঠাতৃ-ব্রাহ্মণকুলের কুল-মাহাত্ম্যে আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপে গৌরবান্বিত মনে করিত। তখনকার আমলের অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ এবং অধিষ্ঠিত গ্রাম দুয়ের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা দেখিলে মনে হয়—অধিষ্ঠাতৃ-ব্রাহ্মণকুল যেন অধিষ্ঠিত গ্রামের আত্মা, আর অধিষ্ঠিত গ্রাম যেন অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণের শরীর। অধিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে এমন-তর যেখানে ঘনিষ্ঠতা, সেখানে উভয়ের মধ্য দিয়া উভয়ের পরিচয়-জ্ঞাপনের প্রথা-প্রচলিত হইবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ স্থলে পরিচয়-জ্ঞাপনের প্রশ্নোত্তরপদ্ধতি কিরূপ হওয়া সম্ভবপর তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; তাহার একটি নমুনা এই :—

প্রশ্ন। কোথাকার আর্য্য।

উত্তর। চট্টগ্রামের আর্য্য=চট্টার্য্য=চাটুয্যে।

প্রশ্ন। কোন্ গ্রাম।

উত্তর। চট্টার্য্যের গ্রাম=চট্টার্য্যগ্রাম=চাটুতি গাঁই।

চট্টগ্রাম হইতে কেমন করিয়া চাটুতি গাঁই আসিতে পারে—এ জিজ্ঞাসার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল। একটা জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হইল বটে, কিন্তু তাহার উত্তপ্ত চিতা ভস্ম হইতে আর একটা জিজ্ঞাসা গাত্রোত্থান করিল; তাহা এই যে, গ্রামের ব্যালাই বা চাটুতি-গ্রাম হইল কেন, আর, ব্রাহ্মণের ব্যালাই বা চাটুয্যে-মহাশয় হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণকে "তত্র ভবান্" বলিয়াও আশ মেটে না কেন, আর, ব্রাহ্মণের আসন-বসনকে "তৎ" বলিয়াই "যথেষ্ট বলা হইয়াছে" মনে করা হয় কেন? যাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বলিবেন যে, ঘটিবাটির পক্ষে একটা যৎসামান্য তকারান্ত বা টকারান্ত নামই যথেষ্ট—তৎ বা That-ই যথেষ্ট; কিন্তু ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নাম উহারই মধ্যে শুনিতে একটু লম্বা চওড়া হওয়া বিধেয়; আর, যাহা বিধেয় তাহা কার্য্য-গতিকে স্বভাবতই ঘটিয়া উঠে—যেমন চাষা'র মুখ দিয়া সত্য কথা স্বভাবতই বাহির হইয়া পড়ে। মুখুটি-শব্দ অপেক্ষা যে মুখুয্যে-শব্দ মুখার্য্য-শব্দের নিকট-সম্পর্কীয়—শ্রোতা'র কর্ণ-ই তাহার সমুচিত কষ্টিপাথর; স্বতরাং কাহারও কর্ণ থাকিতে তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, একদিকে মুখুটি এবং আর একদিকে মুখুয্যে—

দুয়ের মধ্যে মুখুয্যে—অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা; আর, তাহা অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা বলিয়াই ব্রাহ্মণের ব্যাপা আমরা তাঁহাকে মুখুয্যে মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করি; আর তাঁহার বাস গ্রামের ব্যাপা "মুখুটি গ্রাম" বলিয়া সংক্ষেপে সারি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটি ভুলিলে চলিবে না;—আমেরিকায় ওয়াশিংটন, পেন্সিল্‌বানিয়া, এবং আর গোটা দুতিন স্থান তত্তৎ প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুসংজ্ঞিত হইয়াছে দেখিয়া—নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে কেহ আর এরূপ কথা বলে না যে, নিউইয়র্ক, চিকাগো প্রভৃতি আমেরিকা'র সমস্ত প্রদেশই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাতা'র নামে অনুসংজ্ঞিত। অতএব, মুখুটি এবং চাটুতি এই দুই গ্রামের নাম মুখার্য্য এবং চট্টার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বন্দিঘাটিও যে বন্দার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে—এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই; বরং পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত গ্রামের নাম পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা এবং ঘটনা সূত্রে পৃথক্ পৃথক্ প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছিল মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই পর্য্যন্তই আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আর বলিয়াছিও তাই—যে, বন্দার্য্য হইতে শুধু কেবল বাঁড়ুয্যে আসিয়াছে, কিন্তু মুখার্য্য হইতে মুখুয্যে এবং মুখুটি দুইই আসিয়াছে; চট্টার্য্য হইতে চাটুয্যে এবং চাটুতি দুইই আসিয়াছে। আর্য্য হইতে কিরূপে উর্য্যে এবং উতি আসিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া চুকিয়াছি; অধিকন্তু একটু পূর্ব্বে এটাও দেখাইলাম যে, অঙ্গুরীয় হইতে অঙ্গুটি আসিয়াছে যদি সত্য হয়, তবে মুখুরিক হইতে মুখুটি আসিবে—চাটুরিক হইতে চাটুটি'র ভাই চাটুতি আসিবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর যেখানে গ্রাম নাম আর ডাক নামের মত একই গ্রামের একটি নাম চট্ট এবং আর একটি নাম চাটুতি, সেখানে চট্টার্য্য গ্রাম (চাটুতি গাঁই) যে চট্টগ্রামেরই নামান্তর হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? মুখুটি এবং চাটুতি যেখান হইতেই আসুক না কেন—আমার যেটা মুখ্য প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত (Hypothesis) সেটা এই যে, আর্য্য হইতে উর্য্যে এবং উতি এই দুইটি যমক সহোদর বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমার এই প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তটিকে আমি চাটুয্যে, মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, গাঙ্গুলি এই চারি স্থানে খাটাইয়া দেখিলাম যে, উহাদের চতুঃসীমার মধ্যে কোন স্থানেই তাহা তিলমাত্রও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা বলেন যে, উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ওঝা হইতে উঝা আসিয়াছে। উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলি—কথাটা'র প্রতি একটু ধীর ভাবে প্রণিধান করা হউক—যে, ওঝা'র মাথায় যেহেতু শিখা নাই (অর্থাৎ রেফ নাই) এই জন্য ওঝা হইতে কোন প্রকারেই গাঙ্গুলির উলি আসিতে পারে না; তা ছাড়া, আর একটি কথা এই যে, উপাধ্যায় যখন একবার উপবীত পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ য-ফলা পরিত্যাগ করিয়া) ওঝা হইয়াছে, তখন আবার

যে যে যে পাঁচিয়া উপবীত (অর্থাৎ ব-ফলা) ধারণ করিয়া উয্যো হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। উপাধ্যায় হইতে যে ওঝা আসিয়াছে, তাহা তুমিও বলিতেছ—আমিও বলিতেছি; কিন্তু "উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে" এই মাত্র বৃত্তান্তের বলে কিছু এটা প্রমাণ হয় না যে, ওঝা হইতে উয্যো বা উলি আসিয়াছে; বরং উপরে আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যথোচিত প্রমাণ হইতেছে যে, ওঝা হইতে উলিও আসিতে পারে না—উয্যোও আসিতে পারে না; উলি আসিতে পারে না কেন? না যেহেতু ওঝা'র মস্তকে শিখা নাই; উয্যো আসিতে পারে না কেন? না যেহেতু ওঝা'র গলায় উপবীত নাই। পক্ষান্তরে আমি যথেষ্ট প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছি যে, উয্যো এবং উলি দুইই আর্য্য হইতে অতি সহজে আসিতে পারে; যেহেতু আর্য্যের মস্তকে শিখা উড্ডীয়মান—জম্‌কালো রেফ; আর, তাহার গল-দেশে উপবীত লম্বমান—দিব্য সর্পাকৃতি ব-ফলা: অতএব আর্য্যের কাজ আর্য্য করুন, ওঝা'র কাজ ওঝা করুন, তাহা হইলেই দেখিতে ভাল হয়, নচেৎ পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষের কাহারও তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই—তৃতীয় পক্ষ জন-সমাজেরও তথৈবচ—অতএব তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

শব্দ ভাঙিয়া গড়িয়া মুচড়িয়া এই যে, আমি একটা নূতন সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইলাম যে, মুখার্য্য হইতে মুখুয্যে হইয়াছে—গঙ্গার্য্য হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে—বন্দ্যার্য্য হইতে বাঁড়ুয্যে হইয়াছে—সাধারণ লোকমণ্ডলীর স্থূল দৃষ্টিতে ইহা এক প্রকার ভেল্‌কি বাজী মনে হইতে পারে; তাঁহারা তো জানেন না যে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত Max Muller ভট্টাচার্য্য সরমা হইতে Helena বাহির করিয়াছেন; দহনা হইতে Daphne বাহির করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের বিচিত্র-গতি বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু একেবারেই বদ্ধ-কপাট। শব্দের মার প্যাঁচ ছাড়িয়া দিয়া, এবার, একটা চক্ষে দেখা এবং কাণে-শোনা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি—দেখি যদি তাহাতে তাঁহাদের কাহারো চক্ষু ফুটাইতে পারি। কিন্তু এ সভায় যাঁহারা অদ্য উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় তো আমি মুখ খুলিতে না খুলিতেই আমার সমস্ত মন্তব্য কথা বুঝিয়া বসিয়া আছেন—আর তাঁহাদের মধ্যে এমনও বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ পণ্ডিতের অভাব নাই যাঁহারা অনেক বিষয়ে আমার অর্দ্ধস্ফুট চক্ষু পূর্ণ মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন;—এ সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যদি আমার বক্তব্য বিষয়টি ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য অপক্ষপাতে বিচার করেন, তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে পত্নীরা স্ব স্ব স্বামীকে আর্য্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অধুনাতন কালের অন্তঃপুর প্রদেশে স্বামীকে না হউক—স্বামীর ভ্রাতাকে প্রকারান্তরে আর্য্য-পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করা হইয়া থাকে; যেহেতু, আর্য্যপুত্রও যা, আর ঠাকুর-পো'ও তা একই। শ্বশুর হ'চ্চেন ঠাকুর বা আর্য্য

আর শ্বশুরের পুত্র হ'চ্চেন ঠাকুর-পো বা আর্য্য-পুত্র। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ঠাকুর শব্দ আর্য্য-শব্দের এক প্রকার অবিকল অনুবাদ। ইহা হইতে আসিতেছে যে চট্ট-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ চট্টার্য্য, বন্দ্য-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ বন্দ্যার্য্য, গঙ্গ-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ গঙ্গার্য্য। অতএব অধুনাতন কালে ব্রাহ্মণেরা যে-ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন—পূর্ব্বে এক সময়ে যে তাঁহারা ঠিক্ সেইভাবে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষিত হইতেন—এরূপ অনুমান কেবল অনুমান-মাত্র নহে; কেমনা একটি চক্ষে দেখা কথা এবং আর একটি কাণে শোনা কথা এই দুইটি প্রত্যক্ষ বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য ঐ অনুমানটির অটল ভিত্তিমূল। আর্য্যপুত্র শব্দটি সকলেই পুস্তকে দেখিয়াছেন আর ঠাকুর-পো শব্দটি সকলেই কাণে শুনিয়াছেন; এখন দুইটিকে নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া দেখুন্—দেখিবেন যে দু'য়ের মধ্যে একচুলও ভাবের ইতর বিশেষ নাই। তুলা-দণ্ডের দুইদিকের দুই ভার-পাত্রের একটিতে রাখিলাম ঠাকুর-পো এবং আর একটিতে রাখিলাম আর্য্য-পুত্র; তুলা-দণ্ড দুইদিকের কোন দিকেই হেলিল না—দুই ভার-পাত্র সমসূত্রে স্থির রহিল। একদিকের ভার-পাত্র হইতে পো এবং আর একদিকের ভার-পাত্র হইতে পুত্র এই দুই সমান অংশ উঠাইয়া লইলাম। এ পাত্রে অবশিষ্ট রহিল ঠাকুর আর ও পাত্রে অবশিষ্ট রহিল আর্য্য। ইহাতেও দুইদিকের দুই ভার-পাত্র পূর্ব্ববৎ সমসূত্রে স্থির রহিল। তবেই হইতেছে যে, আর্য্য = ঠাকুর।

অনতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে অধুনাতন-কালে ব্রাহ্মণেরা যে-ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন—পূর্ব্বে এক সময়ে তাঁহারা ঠিক্ সেই ভাবে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষিত হইতেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে অধুনাতন-কালে ব্রাহ্মণেরা কি-ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন? এ প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজে হইতে পারে। পথের কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া অতিথি করিবার ইচ্ছা হইলে গৃহী ব্যক্তি দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে "ঠাকুর এই দিকে আসুন।" এমন কি রাঁধুনে বামুনকেও আমরা বামুন ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, কোন ব্রাহ্মণের কোন বিশেষ গুণ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ঠাকুর বলি না—সাধারণতঃ সকল ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলি। অতএব মিষ্টর্ যেমন ইংরাজের সাধারণ উপাধি—আর্য্য তেমনি পূর্ব্বে এক সময়ে ঠাকুরের ন্যায় ব্রাহ্মণবর্গের সাধারণ উপাধি ছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তাহা যদি হইল—আর্য্য যদি ব্রাহ্মণবর্গের সাধারণ উপাধি হইল—তবে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য বিশিষ্ট উপাধি আছে;—সে উপাধি কি? আপাততঃ তিনটি বিশিষ্ট উপাধি প্রধানতঃ আমার চক্ষে পড়িতেছে—(১) ভট্টাচার্য্য (২) আচার্য্য এবং (৩) উপাধ্যায়। তা ছাড়া আরো অনেকগুলি বিশিষ্ট উপাধি আছে—যেমন বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার ন্যায়রত্ন ইত্যাদি; কিন্তু শেষোক্ত উপাধি-গুলি বিশিষ্ট হইতেও বিশিষ্ট—ও গুলি বিশিষ্টতর। বিশিষ্টতর উপাধিগুলির সহিত আপাততঃ আমাদের

বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিছুপূর্ব্বে এই যে তিনটি বিশিষ্ট উপাধির কথা আমি উল্লেখ করিলাম—যে, ভট্টাচার্য্য আচার্য্য এবং উপাধ্যায়, এগুলি হ'চ্চে বিশেষ বিশেষ অধ্যাপক-মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ উপাধি। আমাদের দেশে যাঁহারা স্মৃতি ন্যায় কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপক তাঁহারা ভট্টাচার্য্য। যাঁহারা জ্যোতিষাদির অধ্যাপক তাঁহারা শুধু আচার্য্য অর্থাৎ সামান্য আচার্য্য—আচাজ্জি ঠাকুর। এ দেশের সভাসমাজে স্মৃতি দর্শন এবং সাহিত্যের ন্যায় জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের তেমন কোন বিশেষ মর্য্যাদা ছিল না; এইজন্য শুধু আচার্য্য যাঁহাদের উপাধি তাঁহারা পুরোহিতদিগের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হ'ন। ভট্টাচার্য্য এবং আচার্য্য উভয়েই Professor। ভট্টাচার্য্য স্মৃতিদর্শন এবং সাহিত্যের Professor বলিয়া বিশেষ সম্মানার্হ; আচার্য্য সামান্য জ্যোতিষাদির Professor বলিয়া অবজ্ঞাস্পদ। আর এক শ্রেণীর অধ্যাপক হ'চ্চেন উপাধ্যায়। উপাধ্যায় শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে যে, অধ্যাপক; উপদেশক; বেদের এক দেশ যিনি অধ্যয়ন করা'ন্। খুব সম্ভব যে সর্ব্ব প্রথমে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বেদের কোন না কোন দেশ অধ্যয়ন করাইতেন; কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের বংশজাত ব্রাহ্মণেরা বেদের কোন দেশই অধ্যয়ন করা'ন না।

বহুদর্শী সুবিদ্বান্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেদিন সভা-সমীপে প্রসঙ্গ ক্রমে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন—ইতিপূর্ব্বে তাহা আমার জানা ছিল না। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করাইয়া বৃত্তিগ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল—আর সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ উপাধি ছিল 'উপাধ্যায়।' তাঁহার এ কথা বেস্ আমার মনে লাগিতেছে, কেননা পুরাতন গ্রীক্ দেশেও শেষাবস্থায় ঐরূপ বিদ্যাদানের বিনিময়ে বৃত্তি-গ্রহণের প্রথা সুরু হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত ঐতিহাসিক দূরবীনের মধ্য দিয়া আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বৃত্তি যোগাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্র-মণ্ডলীর অভিভাবক-দিগের মনে জোয়ারের জলের ন্যায় ক্রমশই প্রবর্দ্ধিত হইতেছে, আর, তাহার প্রবল তোড়ে উপাধ্যায় মণ্ডলীর অধ্যাপনা-শালার ভাঙ্গন ধরিয়া ভট্টাচার্য্যগণের চতুষ্পাঠীর দিন দিন কলেবর পুষ্টি হইতেছে। তাহার কিয়ৎপরে দেখিতেছি, যে ছাত্র-হীন উপাধ্যায়েরা আপন আপন পাততাড়ি গুটাইতেছেন। তাহার পরেই সবেগে যবনিকা-পতন। সেই যবনিকা-পতন অবধি এ কাল পর্য্যন্ত উপাধ্যায়-শ্রেণী নিতান্তই বেকার অবস্থায় পড়িয়াছেন—এখন তাঁহারা বেদও পড়া'ন না, বেদাঙ্গও পড়া'ন না। এক্ষণে একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভট্টাচার্য্য-পদবী কেবল বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, আর একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ মাত্রই লোক-সমাজে ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। উপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ভট্টাচার্য্যের দলে মিশিয়া ভট্টাচার্য্য

হ'ন, তাঁহারাই কেবল অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হ'ন ; আর সেই উপলক্ষে তাঁহারা তাঁহাদের পৈতৃক উপাধি (উপাধ্যায়) বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যোচিত উপাধি পরিগ্রহ করেন ; কিন্তু এরূপ যাঁহারা করেন তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ;—অধিকাংশ উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা কার্য্যের কোন ধারই ধারেন না অথচ অধ্যাপনা-কার্য্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষোক্ত ব্রাহ্মণদিগের মান বজায় রাখিবার জন্য উপচারচ্ছলে (অর্থাৎ out of courtesy) তাঁহাদের নামের শেষ-ভাগে উপাধ্যায় পদবী অদ্যাবধি সংযোজিত হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাজে উপাধ্যায় ছিলেন—ইঁহারা কেবল নামে উপাধ্যায়। এই গতিকে—বেদাধ্যাপক-বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের নামের পরিশিষ্ট ভাগে দুই কারণে দুইরূপ উপাধি সংযোজিত হইল ; (১) তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম বজায় রাখিবার জন্য উপাধ্যায় উপাধি ; এবং (২) তাঁহাদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দৃষ্টে সাধারণ-ব্রাহ্মণ-জাতি-সুলভ আর্য্য উপাধি। সাঁটে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপাধ্যায়, বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের পোষাকি উপাধি, আর, আর্য্য তাঁহাদের আটপৌরে উপাধি। আমাদের দেশের ভাষাও দুইরূপ—পোষাকি ভাষা এবং আটপৌরে ভাষা। সাধু ভাষা পোষাকি ভাষা, ইতর ভাষা আটপৌরে ভাষা। এখন বক্তব্য এই যে, আটপৌরে ভাষার পর্ণকুটীরে আর্য্য শব্দ উর্য্যে এবং উলি বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাত বাস করিতেছে ; আর সেই সঙ্গে পোষাকি ভাষার প্রশস্ত অট্টালিকায় উপাধ্যায় শব্দ যেমন তেমনি অবিকৃত ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। গঙ্গঠাকুর পোষাকি ভাষাতেই পোষাকি উপাধি ধারণ করিয়া গঙ্গোপাধ্যায় হ'ন ; কিন্তু আটপৌরে ভাষাতে তিনি আটপৌরে উপাধি ধারণ করিয়া সামান্য গঙ্গার্য্য বা গাঙ্গুলি হইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উপাধ্যায় উপাধি কেবল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলেরই উপাধি ছিল—সকল ব্রাহ্মণের নহে। খুব সম্ভব যে, ঘোষাল উপাধি ঘোষার্য্য হইতে আসিয়াছে—সান্ন্যাল উপাধি সান্ন্যার্য্য হইতে আসিয়াছে। এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, যেমন চট্টগ্রামের বা চাটুতি গ্রামের চট্টার্য্য, তেমনি, ঘোষপাড়ার ঘোষার্য্য। পর্য্যায়ের র্য্য যখন পালা'র ল হইয়াছে, তখন ঘোষার্য্যের র্য্য ঘোষালের ল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তবে, ঘোষালের যেহেতু পোষাকি উপাধি নাই এইজন্য সন্দেহ হয় যে, তিনি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ; অথচ আবার ঘোষাল কুলীনের মন্ত্রপূত পঙ্‌ক্তির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ;—ইহার ভিতরে কি যে নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, ইতিহাস-বেত্তারা তাহা বলিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা যাহা আমার মনে হইতেছে তাহা এই ;—মান্দ্রাজ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগের উপাধি আইয়র। আইয়র যে, আর্য্য হইতে আসিয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই। পূর্ব্বে মান্দ্রাজ নিতান্তই অনার্য্য প্রদেশ ছিল ; সুতরাং মান্দ্রাজ

অঙ্গের আদ্যাই যে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বোচ্চ উপাধি হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পরি-উপসর্গের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া এ আবার কি একটা নূতন উপসর্গে আসিয়া পড়িলাম! গতিক যখন এইরূপ, তখন আমার পক্ষে আজ—মহামান্য সভাপতি এবং শ্রদ্ধাস্পদ সহোদরগণের অনুমতি লইয়া—এই খানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়। তা বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি আমার হাতের কার্য্য অর্দ্ধসমাপন করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইতেছি। প্রত্যেক উপসর্গের সম্বন্ধেই আমি সাধ্যানুসারে ভাবিয়া চিন্তিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি; যদি আপনারা তাহা শুনিতে ভার বোধ না করেন, তবে বারান্তরে আমি তাহা নিঃশেষে বলিয়া ফেলিয়া আমার মনের ভার লাঘব করিতে কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করিব না—কেননা আপনাদের মত অভিজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলী অন্যত্র দুর্লভ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম-মঙ্গল।

বাল্যকালে কীর্ত্তন শুনিতাম। কীর্ত্তনের অনেক গানই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সুর-দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস, মুকুন্দরাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রচিত বলিয়া জানিতাম। সঙ্গীতের বৈঠকে, মাঠে ঘাটে ঠাকুরুণ-বিষয়ক গান শুনিতে পাইতাম, তাহাতে রামপ্রসাদ, নীলাম্বর, নরচন্দ্র, কমলাকান্ত, নারায়ণ প্রভৃতি শক্তি-সাধকদিগের ভনিতি থাকা প্রযুক্ত বুঝিতাম, তাঁহারাই সেই সকল গীতের রচয়িতা। তদ্ব্যতীত গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত পড়া হইত। কবিকঙ্কণের চণ্ডী বয়স্থ ব্যক্তিগণ পাঠ করিতেন, গায়কেরা গান করিত। এজন্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণকেও চিনিতাম। স্কুল পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া বয়স কালে যখন অধ্যাপনা করি, তখন পূজ্যপাদ ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ" এবং বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কবিচরিত" নামক প্রায় একজাতীয় দুইখানি পুস্তক একই কালে হস্তগত হয়, তাহাতে বাল্যকালের পরিচিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস ও রামপ্রসাদ ব্যতীত রামেশ্বর, ক্ষেতকাদাস, ভারতচন্দ্র ব্যতীত মুসলমান আমলের আর কোন গ্রন্থকারকে দেখি নাই।

আজি দশবৎসর পূর্ব্বে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তাহাতেও আর কোন প্রাচীন কবির নাম পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলের কথাও তাহাতে ছিল না, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে দুই একজন প্রাচীন কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কোন কথা পাওয়া যাইত। মোটের উপর বুঝিতাম, বাঙ্গলা ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থ আর বড় বেশী নাই। তবে যে বটতলায় কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল সে গুলি অপ্রসিদ্ধ লোকের লিখিত বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতে পায় নাই বলিয়া বিবেচনা হয়। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে এই দশবৎসর মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন কবির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে ছিলেন এতদিন তাহাও অনেকে জানিতেন না, সৌভাগ্যক্রমে যখন তাঁহাদিগকে লেখায় পড়ায় পাওয়া গিয়াছে তখন একদিন, না—একদিন সাধারণে তাঁহাদিগের রচিত অপূর্ব্ব কাব্যের অমৃতময় স্বাদে তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবেন সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

আজি আমি তদ্রূপ একটী কবির এবং তাঁহার রচিত একখানি অপূর্ব্বকাব্যের পরিচয় দিব। পুস্তকখানি মুদ্রিত করিলে ৮ পেজী ফর্ম্মায় তিনশত পৃষ্ঠারও অধিক হইবে। গ্রন্থের অনেক স্থলেই কবি ইহাকে অনিলপুরাণ অর্থাৎ বায়ুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন,—

"উদ্ধৃচিন্তা আত্মারে কহেন ভগবান। অনিল পুরাণ দ্বিজ সহদেব গান॥"

কিন্তু বায়ুপুরাণ দেখিয়া ইহা যে উক্ত পুরাণের অনুবাদ এরূপ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। স্থানে স্থানে ইহার "ধর্ম্মমঙ্গল" নামও দেওয়া হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব গায়। ধনে বংশে নায়কে বাড়াবে কালুরায়॥"

কোথাও বা আদি পুরাণানুসারে ইহা লিখিত এরূপ পরিচয়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্রহ্মার বচন শুনি, পাণ্ডবের চূড়ামণি,
চলিল বিষ্ণুর সন্নিধান।
আদি পুরাণের মত, অনাদি চরিত যত,
দ্বিজ সহদেব রস গান॥"

কোন স্থলে বা ইহাকেও শ্রীধর্ম্মপুরাণ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মপুরাণ দ্বিজ সহদেব গায়।
ভক্ত নায়কেরে দয়া কর কালুরায়॥"

আবার কোথাও বা ইহা যে এক নূতন কাব্য কবি তাহাও বলিতে ক্রটী করেন নাই,—

"রাক্ষিরে দেখিয়া হিমালয় চমকিত। দ্বিজ সহদেব গান নূতন সঙ্গীত॥"

ফলতঃ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় পুরাণের অনুকরণে লিখিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণের উৎপত্তি প্রভৃতি ইহাতে যথাবিধি বর্ণিত হইয়াছে, উহার মধ্যে কবির কল্পনার ক্রীড়াও আছে— ভগবতীর বাঁদিনীবেশে মৎস্যধারণ, শিবের কৃষিবৃত্তি অবলম্বন ইত্যাদি। কথা-প্রসঙ্গে অনেক স্থানেই পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা আছে। ইহাতে পরব্রহ্মকে "ধর্ম্ম নিরঞ্জন" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি আপন পূজাপদ্ধতি মর্ত্ত্যলোকে প্রচার জন্য সময়ে সময়ে অবতার হইয়াছেন। অবতার হইয়া, যে যেরূপে আপন মহিমা প্রচার করিয়াছেন, তাহাই এ গ্রন্থের অস্থিমজ্জা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব পুরাণের অনুবাদ হইতে ইহাকে ধর্ম্মপুরাণ বলিলে ক্ষতি ছিল না, বায়ুপুরাণ বা আদিপুরাণও ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ ঐ সকল পুরাণের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। অংশতঃ কোন পুরাণের সহিত ঐক্য থাকিলে একটী পুরাণের পুরানামের অধিকার ইহার নাই। এইরূপে পুরাণ ও কল্পনার মিশ্রিত মতাবলম্বনে লিখিত বলিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য আপন চণ্ডীকাব্যের গ্রন্থিচয়নাবসরে নানা পুরাণ বিচার করিয়া এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিবার কথা যে বলিয়াছেন, উপস্থিত গ্রন্থে সেইরূপ বলিলেই ঠিক হইত। কবি আপন কল্পনা বলে ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি প্রচার উপলক্ষে উপাখ্যানাংশের গুরুত্ব-প্রতিপাদন জন্য অনেক স্থলে পুরাণের কথা উপস্থিত করিয়াছেন। সে কালের অধিকাংশ কবিই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ে, ধর্ম্মজীবন বর্ণনায় পাঠকের চিত্তাকর্ষণ জন্য নায়ক নায়িকাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বর্ণন করিতেন এবং তাঁহাদিগের রূপ বৃদ্ধি ও কথোপকথন জন্য মধ্যে মধ্যে

দেব বা দেবী বিশেষের মর্ত্তালোকে আবির্ভাব দেখাইতেন। মুসলমান আমলের কবিদিগের মধ্যে কেহই আপন কাব্যে দেবদেবীর সংস্রব শূন্য করিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষার প্রাচীন কাব্য আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন দেব দেবী ছাড়িয়া সে কালে কোন কাব্যই হইতে পারিত না, বোধ হয়, হইলেও সাধারণের নিকট সমাদৃত হইত না।

ঐ সকল কাব্যে প্রধানতঃ যে যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন থাকিত, সেই সেই দেবদেবীর নামের সহিত 'মঙ্গল' শব্দ যোজনা দ্বারা প্রায়শঃ গ্রন্থের নামকরণ হইত, তজ্জন্যই কৃষ্ণমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্য কবি যে স্থানে স্থানে তাঁহার গ্রন্থ খানিকে "ধর্ম্ম-মঙ্গল" নাম দিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া ইহাকে "ধর্ম্মমঙ্গলই" বলা হউক। এ পর্য্যন্ত আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে। ময়ূরভট্ট, খেলারাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, রমাই পণ্ডিত এবং সহদেব চক্রবর্ত্তী, এই আটজনের লিখিত আটখানি। এই আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলই ধর্ম্মযাজন বা তাহার মানত উপলক্ষে মন্দিরা বা খোল ও মন্দিরা উভয় সহযোগেই গায়কদিগের দ্বারা গান করা হইয়া থাকে। আজি কালি প্রাচীন কবিদিগের কাব্য গান করিবার প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে বলিলেও চলে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শারদীয় মহা মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, যেখানে মহামায়ার মূর্ত্তি সেইখানেই চণ্ডী ও রামায়ণ-গান শুনিতে পাওয়া যাইত। এখন আর দেশে পূর্ব্বের ন্যায় চাউল ধান শস্তা নাই, লোকের সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতারও অভাব, মতি গতিও অন্যদিকে ফিরিয়াছে। সুতরাং দুর্গা পূজায় সেরূপ উৎসব নাই, আড়ম্বরও নাই। এই সর্ব্ববাদিসম্মত মহোৎসবেরই যখন এই অবস্থা, তখন ধর্ম্মগাজনের আর কথায় কাজ কি, ধর্ম্মগাজনের ধূমও গিয়াছে, ধর্ম্মের গানের পসার কমিয়াছে। তাহা না হইলে উপরোক্ত আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলই গায়কেরা খোল ও মন্দিরা সহযোগে গান করিত। ধর্ম্মমঙ্গল এত দিন মুদ্রিত হয় নাই। বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ১২৯৫ সালে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-প্রণীত ধর্ম্ম-মঙ্গল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। অপর তিনখানি এখনও অমুদ্রিত। ঘনরাম, রূপরাম ও রামচন্দ্র প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক নায়িকা একই ঘটনা ও বর্ণনীয় বিষয়ের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলের বিষয় বিশেষ অবগত নাই। কিন্তু সহদেব চক্রবর্ত্তী-প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল পৃথক্‌বিধ। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ভাবসমাবেশও সুন্দর। গ্রন্থের আকার, রচনা-পারিপাট্য, ও কবিত্বে সহদেবের ধর্ম্ম-পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার একখানি মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। গ্রন্থকার কাব্যের নানা স্থানে আপনার নাম ধাম বংশ পিতামহাদির পরিচয় ও আত্ম জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই সে কালের কবির চরিতাখ্যান সম্বন্ধে যথেষ্ট।

বাসস্থানের পরিচয় বালোগণকে তিনি বলিয়াছেন,—

"দ্বিজ সহদেব গান অনাদি ভাবনা। রাধানগর বাড়ী যার বালিগড় পরগণা॥"

এতদ্দেশে—অর্থাৎ অধুনাতন হুগলী জেলার অন্তর্গত দুইটী রাধানগর দেখিতে পাওয়া যায়। একটী পাড়ার সাহাবাজারের নিকট—হাবেলী পরগণার অন্তর্গত; অপরটী আরামবাটার নিকটবর্ত্তী ও বালিগড় পরগণার অন্তর্গত। ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে শেষোক্ত রাধানগরেই কবির বাসস্থান ছিল। তিনি জাতিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—

"অহনিশ ভাবি হরগৌরীর চরণ। গান দ্বিজ সহদেব বৈদিক ব্রাহ্মণ॥"

সহদেব বংশ-পরম্পরায় চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রাজারাম চক্রবর্ত্তী এবং অগ্রজ মহাদেব চক্রবর্ত্তী।

"চক্রবর্ত্তী রাজারাম, অশেষ পুণ্যের ধাম,
বিশ্বনাথ তাহার নন্দন।
মহাদেব তস্য সুত, যাহার অনুজ জাত,
সহদেব সুকবি রচন॥"

গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবি আপনাকে দেবানুগৃহীত ও তৎসূত্রেই কবিত্বসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এই দেবানুগ্রহলাভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন রকম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

"অনিল পুরাণ দ্বিজ সহদেব ভণে। কালাচাঁদ যারে কৃপা করিলা স্বপনে॥"

অন্যত্র,—"দ্বিজ সহদেব গান শ্রীধর্ম্মের মায়া। বিল্বমূলে বসিয়া যাহারে কৈলে দয়া॥"

অন্যত্র,— "খদির পলাশবন, এড়াইয়া দুইজন,
মধুবনে হৈল উপনীত।
দ্বিজ সহদেব গায়, দয়া কৈলে কালুরায়,
স্বপনে শিখালে যারে গীত॥"

কবি উক্ত ধর্ম্মকালুরায়ের বন্দনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"সোণার নূপুর পায়, উর বাপা কালুরায়,
যারে কৃপা করিলে স্বপনে।
বসিয়া শ্রীফল মূলে, সত্য করি কুতূহলে,
নিজ মন্ত্র শুনাইলে কাণে॥
আপনি করিছে দয়া, মোরে দিলে পদছায়া,
পূর্ব্বজন্মে আছিল তপস্যা।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে,
তেঁই ধর্ম্ম দেখা দিলে আস্যা॥

দেবোত্তর মোর দিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে,
সঙ্গীত হইল নিরমান।
অনাদি চরণ-রেণু, ভণি লোটাইয়া তনু,
দ্বিজ সহদেব রস-গান॥"

কবির অনুগ্রাহক কালুরায়, এখনও রাধানগরে আছেন, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণবংশ লুপ্ত হওয়ায় উক্ত দেবতা এখন ভাট-উপাধিধারী সদ্গোপদিগের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাহার পর কবি তারকেশ্বর-বন্দনায় বলিয়াছেন,—

"মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় এক চল্লিশ সালে। বসা ছিলে বৃষধ্বজ শ্রীফলের মূলে॥
বাঘছাল আসন বিভূতি ভূষা গায়। কিবা সে লাবণ্যছটা কহা নাহি যায়॥
পঞ্চম অক্ষর মন্ত্র শম্ভু দিলে কানে। বদনে নাচয়ে বাণী ভণির কারণে॥
গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা। গায়কের পূর্ণ কর মনের বাসনা॥"

ইহাতে এই বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের বাল্যাবধি বাঙ্গলা কবিতার একটু ঝোঁক ছিল, বয়স্ককালে লেখাপড়া শিখিয়া দৈবানুগ্রহে কালিদাসের কবিত্ব, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভা-শালী কবিকঙ্কণভট্টাচার্য্যের স্বপ্নলব্ধকবিত্বশক্তির কথা সর্ব্বদাই মনে তোলা পাড়া করিতে করিতে, বিশেষতঃ "কবিত্বং দুর্লভং লোকে" এই কথায় কবিত্ব দৈবশক্তির অধীন নিশ্চয় বোধে নানা দেবতার ধ্যানানুরক্তিপ্রবৃক্ত ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে একদিন নিদ্রাযোগে—বিভূতিভূষিত, সম্ভবতঃ বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন বিল্বমূলে, কোন দেব-মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাঁহার নিকট স্বপ্নে পঞ্চাক্ষরমন্ত্রলাভ ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, তন্ত্রাদিপাঠে তাঁহার এই মন্ত্রের উৎকর্ষ জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, ইহার পর দৈবানুগ্রহের সাহসে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রামে বা পাড়ায় কালাচাঁদ বা কালুরায় নামে কোন ধর্ম্মের তাৎকালিক অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। কবিত্বের জন্য ব্রাহ্মণকে সেই কালুরায় ধর্ম্মের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয়। এদিকে তারকেশ্বরের মহিমা রাঢ়ে বঙ্গে, গ্রন্থমধ্যে কাহাকে ছাড়েন, কাহাকে রাখেন কাজ নাই, পাঁচেই এক, একেই পাঁচ, এই ভাবিয়া সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল মধ্যে যখন যে দেবতার কথা আসিয়াছে, তখন তাঁহারই উদ্দেশে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়াছেন।

"দ্বিজ সহদেব গান রসের কাহিনী। রাঙ্গা পায়ে স্থান দিবে শঙ্কর ভবানী॥" ইত্যাদি।

ফলতঃ ব্রাহ্মণ বহুদেবতার সাধনায় সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার কাব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত তুলনায় উৎকৃষ্ট না হইলেও কোন মতে নিকৃষ্ট নহে, স্থানে স্থানে ভাষার লালিত্য ও কল্পনার আবেগ তাঁহার কাব্যে অধিক-তর সৌন্দর্য্য-যোজনা ও উদ্দীপনার আবির্ভাব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল রচনারম্ভের কাল ৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পৌর্ণমাসী। এই দিন

তিনি দেবানুগ্রহ লাভ করেন, এবং সম্ভবতঃ ঐই পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথিতেই তিনি ধর্ম্মমঙ্গলের দুই চারি পৃষ্ঠাও—অন্ততঃ রচনা করিয়া থাকিবেন।

"দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব্ব তপ ফলে। যাহারে করিলে দয়া এক চল্লিশ সালে॥

* * * *

অগোচর কথা ইহা কে বলিতে পারে। কালাচাঁদ স্বপনে সদয় হৈলা যারে॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি। হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

* * * *

দ্বিজ সহদেব গান ললাটের লেখা। মধুমাসে মায়াধর যারে দিলা দেখা॥"

এখন কথা হইতেছে ৪১ সাল কোন্ শতাব্দীর? সে সম্বন্ধে বা গ্রন্থসমাপ্তি কাল সম্বন্ধে কবি কিছুই বলিয়া যান নাই। অনুমান ও প্রমাণ-প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। আমি সহদেবের যে হস্তলিখিত ধর্ম্মমঙ্গল খানি পাইয়াছি, উহার লিপিকাল ১১৯৩ সাল। আমার নিজ গ্রামস্থ বাঁকুড়ারায় ধর্ম্মের সেবক ডোম-জাতীয় পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বপুরুষ আনন্দীরাম পণ্ডিত উহার লিপিকর। ভাঙ্গামোড়ার ডোমপণ্ডিতেরা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা কালে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও পাণ্ডিত্য প্রসিদ্ধি নাই,—তবে যে তাহারা একেবারে বর্ণজ্ঞানশূন্য তাহাও নহে, তাহাদের গৃহে আজিও যে সকল অপ্রকাশিত মহামূল্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে—এ দেশের অনেক কৃতবিদ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগের নিকট তাহাদের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রণীত "রাধা-রসমঞ্জরী" নামক অপূর্ব্ব সংস্কৃত খণ্ডকাব্য খানি আমি ঐ ডোম পণ্ডিতদিগেরই নিকট পাইয়াছি।

আনন্দীরাম ধর্ম্মমঙ্গলের শেষে "ইতি ১৮ই মাঘ" ইহা ভিন্ন আর কিছু লেখে নাই, কিন্তু তাহারই হস্তলিখিত কৃষ্ণদাসপ্রণীত পাষণ্ডদলনের লিপি শেষে ১১৯৩ সাল লিখিত থাকায় বুঝা যাইতেছে, আনন্দীরাম ১২৩ বৎসর পূর্ব্বে বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিল। আনন্দীরামেরই পিতামহ বৃন্দাবন পণ্ডিত যে সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলরচনার সমকালিক তাহার প্রমাণ ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যেই আছে,—

"বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়া স্থিতি। অরূপম গুণধাম অনন্ত মুরতি॥
সদংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন॥"

আনন্দীরাম যদি ১১৯৩ সালের লোক হইল, তবে তাহার পিতামহ কখন হাজার এক চল্লিশ সালের লোক হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না, যেহেতু পৌত্র ও পিতামহে ১০৪১—১১৯৩, ১৫২ বৎসর কালের দূরবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। নর্ম্মদেশ্বরদেবী-বর্ণনা উপলক্ষে কবি হুয়াধার কালাচাঁদ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"হুয়াধার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে। পাইল গোপের সুত তপস্যার ফলে॥"

হুগলী জাঙ্গীপাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী পোমাপুকুরের একটী পল্লী, তত্রত্য গোস্বামী পণ্ডিতগণও অতিপ্রাচীনবংশসম্ভূত। পণ্ডিতগোষ্ঠীর বর্ত্তমান পুরুষ হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ বলাই পণ্ডিতের অগ্রজ ভ্রাতা কানাই পণ্ডিত কাগাচাঁদ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের রচনা ১১৪১ সালের ৬ঠা চৈত্র (১৭৩০ খৃঃ অঃ মার্চ্চ ২০।২২শে) আরম্ভ হয়। ১০৪১ সাল বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দীর ৪১ সালে নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে কবি সহদেব ঘনরাম ও শিবায়নপ্রণেতা রামেশ্বরের সমসাময়িক এবং তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল উক্ত দুই গ্রন্থকারের গ্রন্থরচনার পরে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলাদি ও রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তনাদির পূর্ব্বে রচিত।

সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল পৃথক্ ধাতুর ও পৃথক্ ছাঁচে ঢালা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে রঞ্জাবতী নাই, লাউসেন নাই, কর্পূর নাই, কানড়া রাজকন্যাও নাই। সহদেবের গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবেই পুরাণের রীতি অনুসারে রচিত। তিনি তৎকাল-প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে বিঘ্নবিনাশন গণপতি, তাহার পর এইরূপে শ্রীধর্ম্মের বন্দনা করিয়াছেন,—

"করিয়া যুগলকর,   প্রণমহ মায়াধর,
শূন্য মূরতি নৈরাকার।
দ্বিভুজ ধবলকায়,   প্রণমে তোমার পায়,
তোমা বই দেবতা নাহি আর॥
বসিয়া পরম শূন্যে,   শান্তি নাহিক মনে,
ডাকিছে উলূক মুনি-জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,   গণনা করিয়া বল,
কেবা মোরে করয়ে সঙ্গরণ॥
শুনি গোঁসাঞির বাণী,   আনন্দে উলূক মুনি,
একে একে করয়ে গণন।
জম্বুদ্বীপের মাঝে,   ভক্তগণ তোমা পূজে,
লইয়া সকল সঙ্গগণ॥
ভক্তের স্মরণ জানি,   বলে ধর্ম্ম চূড়ামণি,
সেইখানে শূন্য জোয়াগিয়া।
ত্রিভুবনে অনুপম,   শূলপাণি যার নাম,
তার মাঝে উত্তরিল গিয়া॥
উপরে পুষ্পের ঝারা,   মধ্যে গণেশের বারা,
তাহার উপরে সিংহাসন।
দূপদীপে অন্ধকার,   পূজা পেয়ে উপচার,
দেখি ধর্ম্ম উরিছে আসন॥

লড়া ধরি আসে ছেলা, কাঁদি কাঁদি চাঁপা কলা,
বোঝা ভারে গুবাক্ নারিকেল।
দাতী আসে লেখা নাঞি, আনন্দিত গোঁসাঞিঃ,
কলসে কলসে গঙ্গাজল॥
উর উর ধর্ম্মরাজ, সিদ্ধ কর মোর কাজ,
দানপতি আছে মুখ চেয়্যা।
মনে বড় বাসি ভয়, না জানি কেমন হয়,
পার কর আপনি আসিয়া॥
বিষম ধর্ম্মের ঘর, সেথ্যা বড় লাগে ডর,
এক মন হল্যা হয় পার।
দুই মন করে যদি, তারে বাম হয় বিধি,
আচম্বিতে পড়ে মহামার॥
হরিচন্দ্র মহারাজা, আনন্দে করিল পূজা,
নিজ পুত্র দিয়া বলিদান।
মদনা তাহার রাণী, চোখে না পড়িল পানি,
আড় পূজা দিল সাবধান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর, পূজা করে নিরন্তর,
জাজপুরে আমোর দেহারা।
এতিন ভুবন মাঝে, শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে,
রামাই করিল ঘর ভরা॥
সোণার নূপুর পায়, উর বাপা কালুরায়,
যারে কৃপা করিলা স্বপনে।
বসিয়া শ্রীকল্পমূলে, শতা করি কুতূহলে,
নিজ মন্ত্র শুনাইলে কাণে॥
আপনি করিলে দয়া, মোরে দিলে পদছায়া,
পূর্ব্বজন্মে আছিলা তপস্যা।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে,
তেঞি ধর্ম্ম দেখা দিলা আজ্ঞা॥
তেরাস্তর গোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে,
সঙ্গীত হইল নির্ম্মান।
অনাদি চরণ-রেণু, ভথি সোটাইয়া তনু,
দ্বিজ সহদেব রস গান॥

অতঃপর ভগবতী-বন্দনা, তাহার পর সরস্বতী-বন্দনা, সরস্বতীবন্দনার পর লক্ষ্মী-বন্দনা, অনন্তর চৈতন্য-বন্দনা, তারকেশ্বর-বন্দনা, তাহার পর সর্ব্ব-দেবদেবী-বন্দনা, ইহাতে কবির সমসাময়িক যত গ্রাম্যদেবী, ধর্ম্ম, জীব প্রভৃতি কবি যাঁহাদের কথা আপনি জানিতেন ও লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, সকলেরই বন্দনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইতে সকলের কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা বোধে, এস্থলে তাঁহারই বন্দনাংশ-টুকু কেবল উদ্ধৃত করিতেছি,—

"গবথুরে বন্দিব স্বরূপ নারায়ণ। আগুটীর ধর্ম্ম বন্দো হয়ে একমন॥
জাড়গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালুরায়। দিবা-নিশি কতেক গায়নে গীত গায়॥
পূর্ব্বদ্বারী কোঠা সম্মুখে দামোদর।* দুদিকে তুলসীমঞ্চ দেখিতে সুন্দর।
বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়া স্থিতি। অরুণন গুণধাম অনন্ত শকতি॥
সংবাদে উৎপত্তি খণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় বর দেন নিরঞ্জন॥
ক্ষুয়াদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তাগে। পাইল গোপের সুত তপস্যার বলে॥
বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়। দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥"

সর্ব্ব দেবদেবী ও পিতামাতা বন্দনার পর কবি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

---

* জাড়গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার চকদীঘির দক্ষিণ, সেলিমাবাদ হইতে কাণা দামোদর দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একটি মুখ জাড়গ্রাম, দশঘরা, পাড়ুই, নাহাবাজার, রামনগর, খাজহাটী দিয়া হাবড়া জেলায় ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং অপর একটী মুখ বাহাদুর, বনপুর, মল্লমপুর ও বন্দীপুরের নিকট দিয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিয়াছে। পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান দামোদর ঐ দুইটি খাত দিয়াই প্রবাহিত হইত বলিয়া কবি জাড়গ্রামের ও বন্দীপুরের নদী দুইটিকেই দামোদর বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, বর্ত্তমান দামোদর চৈতন্যদেবের সময়েও এই পথে প্রবাহিত হইত; তবে সে সময়ে ইহার অন্য নাম থাকা অসম্ভব নহে।

"ভাঙ্গামোড়া গ্রাম সেই পরম সুন্দর। রজনী পণ্ডিত স্থাপিত করিলা পুনর্ব্বার॥
এই গ্রামে আছে বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তোমারে আসিয়া আজি করিবে মিলন॥
মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন। গ্রামবাসী লয়্যা কর সেবার নিয়ম॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু সমাগমে। মদনমোহনপুর বুলিবে এক্ষণে॥
তুমি ভাগ্যবান হয়্যা জন্মিলে সংসারে। নদীর প্রস্তাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে॥
সেই কাষ্ঠে ছিলা এই মদনমোহন। পুনশ্চ বকুল বৃক্ষ করিল রোপণ॥"

অভিরামলীলামৃত।

চৈতন্যদেবের সহচর অভিরামগোস্বামীর নির্দ্দেশানুসারে ভাঙ্গামোড়া গ্রামে মদনমোহনবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। তদনুসারে এই গ্রামের নাম কালেক্টরী তৌজী ও হুগলী জেলার মানচিত্রে মদনমোহনপুরই লিখিত। শেষের কবিতায় যে নদীর উল্লেখ আছে, উহাই বর্ত্তমান দামোদর, ভাঙ্গামোড়া বা মদনমোহনপুরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই নিরঞ্জন বা ধর্ম্ম এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার নিঃশ্বাস হইতে উলূক নামক পক্ষীরূপধারী মুনির সৃষ্টি হয়; তাঁহার পৃষ্ঠের উপর উপবেশনপূর্ব্বক নিরঞ্জন ধর্ম্ম আদ্যাশক্তির সৃষ্টি করেন, ইঁনিই গ্রন্থের সর্ব্বত্র আদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছেন। আদ্যার গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিদেবগণের উদ্ভব, আদ্যার শক্তবায় দেহান্তরগ্রহণ, মহাদেবকে পতিত্বে বরণ, অবশেষে তুহিনগিরিগৃহে তাঁহার আবির্ভাব, বাল্যলীলা, শিবসহ বিবাহ, গুহগজানন পুত্রের জন্ম, শিবশিবার ঘরকন্না, শিবের ভিক্ষা, দারিদ্র্য দুঃখদাহপ্রযুক্ত কামদা নামক ক্ষেত্রে তাঁহার কৃষিকার্য্য, তদুপলক্ষে কৈলাসে দীর্ঘকাল অদ্দর্শনস্থিতিপ্রযুক্ত বাগ্দিনীবেশে শিবকে ছলনা, উভয়ের মৎস্যধারণ, কামদক্ষেত্র হইতে ভগবতীর অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান, কৃষিজাত শস্যাদি লইয়া শিবের কৈলাসযাত্রা, তথায় মহাজ্ঞানপিপাসিতা ভগবতীর শিব সমীপে প্রার্থনা উভয়ের পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী বল্লকাতীরে প্রস্থান, গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশকালে শিবমুখবিনিঃসৃত জ্ঞানকথা-আকর্ণনে নদীজলস্থ মৎস্যগর্ভশায়ী মীননাথ যোগীর মহাজ্ঞান-লাভ, মীননাথের গৌরীনিন্দা, তদ্ধেতু ভগবতীর অভিশাপ, শাপপ্রযুক্ত কদলিপাটন নামক স্থানে স্ত্রীজাতির মোহনমন্ত্রে মেষরূপে অবস্থিতি, শিষ্য গোরক্ষনাথকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার; কালুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গী নামক যোগিপঞ্চকের একত্র মিলন, হরগৌরীস্তুতি, মহানাদে* মীননাথের রাজত্বলাভ; অনন্তর সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গার উৎপত্তি, ডোমবেশে অমরানগরে শিবের ধর্ম্মপূজা, অমরানগরপতি ভূমিচন্দ্রকর্ত্তৃক উক্ত ধর্ম্মসেবক ডোমের নির্য্যাতন ও ধর্ম্মনিন্দা, সেই অপরাধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠের আবির্ভাব, এবং ধর্ম্মপূজান্তে মুক্তিলাভ, জাজপুরনিবাসী রামাই পণ্ডিত নামক সেবক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীধরের ধর্ম্মনিন্দা, তজ্জন্য অবদাপাঠন নামক স্থানে তাঁহার প্রাণনাশ, পিতাকর্ত্তৃক পুনর্জীবনপ্রাপ্তি, জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মদ্বেষ, তৎপ্রতিকারার্থ তাঁহাদিগের গৃহে ধর্ম্মের জন্মগ্রহণ ও ম্লেচ্ছত্ব অবলম্বনে সকলের জাতি-নাশ, তৎপ্রযুক্ত সকলের ধর্ম্মভীতি ও পরিত্রাণলাভ, ভূমিচন্দ্ররাজার আপন মুণ্ডচ্ছেদে ধর্ম্মপূজা ও স্বর্গারোহণ; হরিশ্চন্দ্ররাজার ধর্ম্মনিন্দা, তৎফলে অপুত্রত্ব, পুত্রলাভার্থ রাণী সঙ্গে বনগমন, নানা দেবদেবীর উপাসনা, তাহাতে নিষ্ফলতা, বনমধ্যে পিপাসায় প্রাণ-ত্যাগ, রাণীর ধর্ম্মস্তুতি, ধর্ম্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, লুইচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম, রাজা ও রাণীকে ধর্ম্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণীকর্ত্তৃক পুত্রমাংসরন্ধন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের ভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তার সুললিত কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, শব্দবিন্যাসের ছটা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়,—

* ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বর্দ্ধমান ষ্টেসনের প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমদিকবর্ত্তী। এখানে মীননাথের প্রতিষ্ঠিত এক শিবের মঠ আছে।

বন্দির জগৎমাতা,　　বিষ্ণুমায়া গিরিজাতা,
নিজঘটে দেহ পদ ভার।

*　　*　　*　　*

ত্রিদশতটিনীতটে বান্ধা কালীঘাট।　　বিরাজে কালিকা যথা সদা গীত নাট॥"

এরূপ শব্দ বিন্যাস কাব্যের নানা স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির রূপবর্ণনা উপলক্ষে কবি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, অনেক কাব্যের বহু বিস্তৃত বর্ণনাতেও তাহা পাওয়া যায় না;

"তাহে জনমিলা আদ্যা সৃষ্টির কারিণী।　　পূর্ণশশধরমূর্ত্তি রাজীবলোচনী॥
চাঁচর চিকুরে শোভে বকুলের মালা॥　　আষাঢ়িয়া মেঘে যেন শোভিত চপলা॥
ললাটে সিন্দূর বিন্দু রবির উদয়।　　চন্দন চন্দ্রিকা তার কাছে কথা কয়॥
রক্তিম অধরে পক্কবিম্বকের ভ্রান্তি।　　দশন আকার কুন্দ বিনি মুক্তা পাতি॥
করিকরভের কুম্ভ জিনি পয়োধর।　　লক্ষের কাঁচলি শোভে তাহার উপর॥"

স্বভাব-বর্ণনায় কবির সিদ্ধহস্ততা দেখাইবার জন্য কয়েকটী পংক্তিমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"অতি অনুপম শোভাশোভিত কৈলাস।　　ষড় ঋতু বসন্ত সমীর বায় মাস।
কুসুম দিগন্তগন্ধা সদা বিকশিত।　　অলিগণ গায় শিব দুর্গার চরিত॥
কিন্নর করয়ে গান, নাচে বিদ্যাধরী।　　শৃঙ্গ হাতে আছে নন্দী শিবের দুয়ারী॥
কৃতাঞ্জলি আছয়ে সকল মরুদ্ভূক্।　　অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বেদমুখ॥
স্থিরছায়া তরুগণ অতিশয় শোভা।　　নানা পক্ষী কলরব জগমনোলোভা॥
মুনিগণ আনন্দে করিছে বেদধ্বনি।　　চারিদিকে বেষ্টিত স্বর্গের মন্দাকিনী॥
মূষক ভুজগ ভেক থাকে এক ঠাঞি।　　পশুগণ মানে হরগৌরীর দোহাই॥
হেমময় আসনে বসিলা ভগবতী।　　গুহ গজানন পদ্মা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
বিজয়া করিছে অঙ্গে চামর ব্যজন।　　পদ্মাবতী মাখাইছে অগুরু চন্দন॥
অবার চরণ সেবা করে জয়াবতী।　　কর্পূর তাম্বূল কেহ দেয় শীঘ্রগতি॥"

প্রসাদ গুণের পরিচয় দিবার বহুল কবিতা সত্ত্বেও কয়েক পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত হইল:—

"ভাদ্রের অসিত পক্ষ অষ্টমীর তিথি।　　রোহিণী তারকাযুক্ত অন্ধকার রাতি॥
শুভযোগে পার্ব্বতী পড়িলা ক্ষিতিতলে।　　পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অবনীমণ্ডলে॥
শোধিতকাঞ্চন জিনি দেহের বরণ।　　রূপে করিল আলো হেমন্ত ভবন॥
শুভক্ষণে অবতীর্ণ হইলা ভবানী।　　হুলাহুলি দেয় যত অমররমণী॥
বিদ্যাধরী নাচিছে কিন্নরে গায় গীত।　　মন্দ মন্দ সুগন্ধ পবন-সঞ্চারিত॥
গভীর আরবে মেঘ করয়ে গর্জ্জন।　　রাজহংস কাকলী কুহরে অনুক্ষণ॥"

গৌরীর ধূলা খেলা বর্ণনা বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে। ছন্দটিও সর্ব্বতোভাবে নূতন; প্রাচীন কাব্যে এরূপ ছন্দঃ প্রায় দেখা যায় না। কবি ইহাকে একাবলী ছন্দঃ বলিয়াছেন, এরূপ অষ্টাক্ষরে গ্রথিত একাবলী ছন্দঃ প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

"নগেন্দ্রনন্দিনী উমা। রূপের নাহিক সীমা॥
শঙ্কম বজিম কানে। কর্ণবেধ কুতূহলে॥
নানা আভরণ অঙ্গে। সমবয়সীর সঙ্গে॥
যশোদা রোহিণী রমা। চিত্রলেখা তিলোত্তমা॥
হীরা জীরা সরস্বতী। হরিপ্রিয়া হৈমবতী॥
কৌশল্যা বিজয়া জয়া। পদ্মাবতী সতী ছায়া॥
হরিশ হইয়া মনে। সবাকার যথা স্থানে॥
ধূলায় মন্দির করি। বকুলের তলে গৌরী।
খুচনী কুলাচি পাতি। সঙ্গে জয়া হৈমবতী॥
হাঁড়ী ভাঁড় হাঁড়ি চাটি। রন্ধনের পরিপাটি॥
ধূলার অন্নর করি। সবাকারে দিলা গৌরী॥
মিছা সে ভোজন সুখে। হাত না পরশে মুখে॥
আচমন মিছা জলে। তাম্বূল দাও না বলে।
সকলে বালিকা বুদ্ধি। পাতখোলা মুখশুদ্ধি॥
শয্যা কদম্বের পাতা। বিছান জগৎমাতা॥
ছুটি ছুটি এক ঠাঞি। সুখের অবধি নাঞি॥
দণ্ডে দণ্ডে দিবানিশি। আনন্দ সাগরে ভাসি॥
কেহ দেয় ছড়া ঝাঁটি। যেন গৃহস্থের বাটি॥" ইত্যাদি।

বিপদের দেবীস্তুতি বড়ই আবেগময়ী হইয়াছে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যেন উথলিয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত অসাধারণ ঐকান্তিকতা—আবার শিশুর ন্যায় আবদার,—

"শরণ লইনু জগৎ জননী, ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর॥
দুগ্ধকণ্ঠশিশু দোষ করে, রোষ না করয়ে মায়।
যদি বা জলধিে পড়িয়া কান্দিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥
হরিহর ব্রহ্মা যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি।
বিপদসাগরে তনয় ডুকারে বুঝিয়া যা কর তুমি॥"

যদি পৌত্তলিকতার অন্ধতমসের ভিতর হইতে হিন্দুধর্ম্মের সারভূত অদ্বৈতবাদ কেমন স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া আদ্যশক্তি বা প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব দুই চারিটি কথায় কত সংক্ষেপে বুঝাইয়া গিয়াছেন,—

নম নম নারায়ণী,　　সদানন্দ-স্বরূপিণী,
　　পদ্মযোনিসহায়নী শিবা ।
তুমি হেতু সবাকার,　　বিরাটের মূলাধার,
　　নিমেষয়ে তুমি রাত্রি দিবা ॥
বিস্তারিয়া গুণত্রয়,　　কর সৃষ্টি স্থিতিলয়,
　　আরোপিয়া অনাদি পুরুষে ।
সংসার কৌতুকাগারে,　　শিশু যেন ক্রীড়া করে,
　　স্মরে তোমা দেবতা মানুষে ॥
তুমি শালগ্রাম শিলা,　　তাহাতে করিলে লীলা,
　　আকৃতি পুরুষ নানা ছলে ।
মোহনে মোহিনী হৈয়া,　　গোকুলে পুরুষ পায়্যা,
　　মুরলী বাজালে তরুমূলে ॥
আপনি গোপিনীবেশে,　　বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে,
　　সেবা কৈলে ব্রহ্মা রাত্রি দিনে।
বিস্তারিয়া গুণলেশ,　　পাল্যা মহা পরিতোষ,
　　আত্মারাম আপনার মনে ॥
কেহ বলে রাধাশ্যাম,　　কেহ বলে সীতারাম,
　　কেহ বলে শঙ্কর ও বাণী ।
ভুবনে ভকত ধন্য,　　যাহার ভজন জন্য,
　　একমূর্ত্তি অনন্তরূপিণী ॥
আগমশাস্ত্রের উক্তি,　　হ'লে পুরুষের শক্তি,
　　প্রধানতা পূর্ণ করিবারে ।
শক্তিসনে হৈলে জড়,　　পুরুষে প্রবর্ত্ত বড়,
　　শক্তিহীন নড়িতে না পারে ॥
শক্তিরূপ অগম্যয়,　　জানে যেই মহাশয়,
　　হরিভক্তি লভে অনায়াসে ।
শীঘ্র যোগ সিদ্ধ করি,　　সংসার-সাগর তরি,
　　মুক্ত হৈয়া যায় কর্ম্মপাশে ॥
তুমি না ভাঙ্গিলে ধন্ধা,　　কর্ম্মপাশে থাকে বান্ধা,
　　লোচন থাকিতে হয় আন্ধা ।
অনেক পুণ্যের ফলে,　　তোমাতে ভকতি হল্যা,
　　ভক্ত দেখে ভেঙ্গে যেয় ধান্ধা ॥

যে কিছু সকলি তুমি, সকলের জন্মভূমি,
পুরুষ প্রকাশ তুয়া গুণে।
অজ্ঞানে বুঝিতে নারে, তব অনাদর করে,
অধঃপাতে যাবার কারণে ॥"

যৎকালে সিদ্ধযোগী মীননাথ কামিনী রাজ্য "কদলী-পাটনে" উপস্থিত, তৎকালে তত্রত্য অধীশ্বরী মীননাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বশীকরণ জন্ত যে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া ছিল, তাহাতে কবিত্বের বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি আছে,—

"যেখানে সন্ন্যাসী বসি কদম্বের তলা। সখীগণ সঙ্গে তথা আইলা প্রমীলা ॥
প্রণাম করিয়া রামা কহে কৃতাঞ্জলি। বঙ্কিম নয়নে চাহে কনক পুতলী ॥
অকালে বৈরাগ কেন দেখি মহাশয়। নবীন বয়সে হেন উপযুক্ত নয় ॥
কদলী নগরে থাক হৈয়া মহারাজা। ষোলশত কামিনী তোমার হবো প্রজা ॥
তুমি রাজা হবে আমি হবো পাটরাণী। সদাই সুখেতে রব দিবস যামিনী ॥
অবিরত যোগাব অনেক উপহার। কানন ভ্রমিয়া কষ্ট কেন পাবে আর ॥
কুমকুম কস্তুরী মাখাব সোণা গায়। কাঞ্চন মাদুলী করি পরিব গলায় ॥
নবীন লাবণ্য সদা হেরিব নয়নে। করিয়া চাঁপার মালা পরিব লোটনে* ॥
আমি হবো শতদল তুমি সে ভ্রমর। তুমি চাঁদ হবে আমি হইব চকোর ॥
প্রমীলার বচন শুনিয়া যোগীবর। ঈষৎ হাসিয়া তবে দিলেন উত্তর ॥"

যোগীর প্রত্যুত্তরে সংসারে নিতান্ত অনাসক্তি জানাইলেন,—

"প্রমীলে আমার বোলে কর অবধান।
সংসার আমার ধন, না লয় আমার মন,
নিস্তার কারণ ভগবান ॥
মিছা মায়া মধুরসে, বন্দী হয়্যা মায়াপাশে,
হরিপদে না রহে ভকতি।
গুসরের পোকা যেন, লুতায় বন্দিয়া কেন,
নিজ সূতে মজে লঘুগতি ॥
যোগীর পরম ধন, গোবিন্দের পদে মন,
শুনেছি সনক সনাতন।
না শুনি ব্রহ্মার কথা, সবে হলো উর্দ্ধরেতা,
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ ॥

* চুলের খোঁপায়।

মস্তকেতে জটা ধরি, গাছের বাকল পরি,
বিভূতি ভূষণ ধরি গায়।
কি করিব রাজ্যধন, পরম সুন্দরীগণ,
উহা কি আমারে শোভা পায়॥
কাননে করিয়া বাস, সুখে থাকি বার মাস,
গোবিন্দ ভজনে নিরন্তর।
তোমায় কহিনু দড়, মোর অভিলাষ ছাড়,
যাহ ধনী আপনার ঘর॥
মধুর বচন তোর, লোভ মোহ কাম মোর,
নাহি, কেন বাড়াও জঞ্জাল।
কেন চাহ মোর পানে, বঙ্কিম নয়ন কোণে,
হায় হায় আমার কপাল॥
হৈয়া জটাবল্কধারী, যে জন পরশে নারী,
নাহি পাপী তাহার সমান।
ও রসে বঞ্চিত আমি, আর কত বল তুমি,
মোরে না শোভয়ে হেন কাম॥
প্রমীলা যতেক ভণে, মীননাথ নাহি শোনে,
ভাবে রামা কি করি উপায়।
দ্বিজ সহদেব ভণে, বিল্বমূলে যেই জনে,
দয়াবান্ হৈলে কালুরায়॥"

ভগবতীর অভিশাপ আছে, মীননাথ যতই কেন করুন না, পরিশেষে তাঁহাকে প্রমীলার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইতে হইল। কদলী-পাটনে তাঁহাকে প্রমীলাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই ভুলিতে হইল। তিনি যোগের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হারাইলেন, কবি বলিয়াছেন, তাঁহায় দেবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিল,—

"দূরে গেল মহাজ্ঞান পাইয়া যুবতী। আনন্দিত রঙ্গ রসে কেবল দিবারাতি॥
মাকড়ের জালে যেন বান্ধা গেল হাতী। বজ্র যেন ভাঙ্গে ঠেকে মণ্ডুকের অস্থি॥"

কিছু কাল পরে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ সন্ধান পাইয়া যখন উদ্ধারার্থ উপস্থিত হয়েন, কবি তখন তাঁহার মুখ দিয়া যে কয়েকটি কথা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে গ্রাম্যতা-দোষ থাকিলেও বড়ই সুমিষ্ট ও সময়োচিত হইয়াছে,—

"গুরুদেব নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
গুড়কীর ডুবে সিন্ধু উথলিল, পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে বুঝহ আপন গুণে।

শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মঞ্জরিল,
পাষাণ বিন্ধিল স্বপে॥
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্ম্মমণ্ডিত কায়া,
ঘর ঘর বাঘিনী গোয়ে॥
শিল নোড়াতে কন্দল বাধিল, নরিয়া ধরাধরি করে,
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল পুইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আঁকাটি বাঝিয়া প্রসব হইল, ছেলে চায় পায়রার দুধ।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু, কাঁকড়া ধরিয়া কাছি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল, ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল, মাঝে বায় উড়িল ধূলা।
শরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাহি, ডুবিল দেউল চূড়া॥
বাঘে বলদে হাল জুড়িনু মর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর ছড়া ঝাড়ি গেল মূষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে শোলের পোনা মরছান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে কই মৎস্য মুড়লি পঙ্গুপলুই লয়্যা ধায়॥
মধ্য সমুদ্রে ফুয়াড়ি পাতিনু সারুকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল হরিণী পলায় লাখে লাখ॥
তৈল-থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার হৈল পুরী।
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী॥"

রাজার রাজ্যত্যাগ ও বনগমনে রাজভক্ত প্রজার দুঃখ বর্ণনাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতের প্রজা চিরদিনই এইরূপ রাজার দুঃখে দুঃখী ও রাজার সুখে সুখী,—

"মহারাজা বনে যাবে পড়িল ঘোষণা। অমরার ঘরে ঘরে পড়িল ক্রন্দনা॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া কাঁদে, হাতীশালে হাতী। পঞ্চপাত্র কাঁদে শোকে লোটাইয়া ক্ষিতি॥
সভাসদ্ দ্বিজ কাঁদে নাহি বাঁধে বুক। যোড়হস্তে কান্দে দুঃখে যতেক ভিক্ষুক॥
গাভী কান্দে তৃণমুখে পক্ষী কান্দে ডালে। বৎস কান্দে স্তনমুখে, মীন কান্দে জলে॥
ধুলায় লোটায়ে কান্দে যত প্রজাগণ। কেন বা ধর্ম্মের ঘর ভাঙ্গিলে রাজন॥
ধর্ম্মনিন্দা করিলে কখন নহে ভাল। ধর্ম্মহিংসি দুর্য্যোধন রসাতলে গেল॥
ধর্ম্মনিন্দা রাজার করিল এতখানি। রাজারে বেড়িয়া রহে একশত রাণী॥
বলিতে বলিতে অস্ত গেল দিবাকর। বিদায় লইয়া পঞ্চপাত্র গেল ঘর॥
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব গায়। যার যে অদৃষ্টলিপি তাই হতে চায়॥"

সে কালের কবি বীর বালকের মৃত্যুকালীন উক্তিতে কেমন উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছেন তাঁহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"পুরাণের কথা কিছু জননীরে কয়। জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়॥
কোথা গেল কুম্ভকর্ণ, কোথা ইন্দ্রজিৎ। কোথা গেল দশস্কন্ধ, কোথা পরীক্ষিৎ॥
অভিমন্যু মৈল দেখ ভারতের রণে। কৃষ্ণের ভগিনী প্রাণ ধরিল কেমনে॥
কোথা গেল বাণ দেখ, কোথায় মান্ধাতা। জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু লিখিল বিধাতা॥"

সহদেব বঙ্গদেশের কবি, তাই তিনি এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এদেশের ডোম, ধীবর, গোপাদি ধর্ম্মসেবক পণ্ডিতগৃহে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে; বঙ্গবাসী মাতৃভাষার আদর করিতে শিখিতেছেন; উহার অঙ্গসৌষ্ঠব রূপলাবণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; প্রাচীন কবির পুরাতন কাব্যের উদ্ধার সাধন হইতেছে; এরূপ অবস্থায় আশা করা যায়, সহদেবের ধর্ম্ম-মঙ্গল অচিরেই বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম-গৃহে বিরাজ করিবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক।

শ্রীবাটী-নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু রামরামচন্দ্র কাঁটোয়া হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী বরগ্রামে মাটি খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে পিত্তলনির্ম্মিত এই ফলকখানি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৫ সালের জুন মাসে তিনি ইহা আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। এখানি জৈনদিগের নৌপদজী অর্থাৎ নবপদপূজাপ্রতিমা। শ্বেতাম্বর জৈনেরা মনে করেন যে ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত যত জিনদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা করিলে যে ফল হয়, আশ্বিনমাসে নবপদজীর পূজা করিলেও সেই ফল হয়। নবপদজী চব্বিশজন জিনের সংক্ষিপ্তসার মাত্র।

নবপদের প্রথমপদ অরিহন্ত অর্থাৎ অর্হৎ। এই প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে পাঁচটি অর্হ-তের মূর্ত্তি আছে। ইঁহারা শ্বেতাম্বরীদিগের ঠাকুর, এই জন্য ইঁহাদের পরিধানে কৌপীন আছে। ইঁহাদের সর্ব্ব মধ্যস্থলের ঠাকুরটীর মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার। ইনি বীরাসনে উপবিষ্ট, পাণিদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়দেশে স্থাপিত, ইনি সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন। ইঁহার বামে ও দক্ষিণে দুইটি থাম, থামের উপর সেকালের মুসলমানী ধরণের খিলান, খিলানের উপর দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তী। হাতী দুইটি আপন আপন শুঁড় উঁচা করিয়া আছে, শুঁড় দুইটি প্রায় পরস্পর ঠেকিয়াছে, শুঁড় দুইটির নীচে খিলানের উপরিভাগে

ঠিক মধ্যস্থলে উঁচা চূড়া দেওয়া বাটির মত কি একটি পদার্থ আছে। খিলানের নীচে অরিহন্তের মস্তকের উপর এবং তাহার দুইপার্শ্বে লতার মত তিনটি পদার্থ আছে। অরিহন্তের বামপার্শ্বে একটি ছোট খিলান, তাহাতে দুইটি মূর্ত্তি, একটি অরিহন্তের ঠিক প্রতিরূপ, আর একটি দণ্ডায়মান অরিহন্তের মূর্ত্তি। অরিহন্তের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দিগম্বর জৈনদিগের দণ্ডায়মান-মূর্ত্তি উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরদিগের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বিরল হইলেও যথায় আছে, তথায় কৌপীনধারী, আমাদের এ মূর্ত্তি কৌপীনধারী, ধ্যানস্থ, বাহুদ্বয় দেহ পার্শ্বে লম্বমান, মস্তক মুকুটহীন, পাদুটি জোড়া।

মূল অরিহন্তের দক্ষিণপার্শ্বেও দুই মূর্ত্তি, একটি উপবিষ্ট অপরটি দণ্ডায়মান। অরিহন্তের এই পাঁচ মূর্ত্তি প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। জৈনগণ একস্থানে পঞ্চমূর্ত্তি রাখিতে পারিলে তাহাকে পঞ্চতীর্থ কহেন্ এবং বিশেষ আদর করেন্। কলিকাতায় কোথাও পঞ্চতীর্থ নাই, এক জায়গায় তিনটি জৈনমন্দির আছে, আর দুইটি হইলেই পঞ্চতীর্থ হয়। কিন্তু আমাদের নবপদজীর মধ্যস্থলে একটি পঞ্চতীর্থ আছে, উহা জৈনদিগের বড়ই আদরের। এই পঞ্চতীর্থের দুইপার্শ্বে দুইটি থাম এবং উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান, নীচে একটি রেখা। অবশিষ্ট আটটি পদ ইহার চতুর্দ্দিকে স্থাপিত।

দ্বিতীয়পদ—নাম সিদ্ধ। অরিহন্তের মস্তকোপরি স্থাপিত, ইহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে কুণ্ডল, উত্তান বাহুদ্বয় অঙ্কোপরি স্থাপিত, ইনি বীরাসনে উপবিষ্ট।

তৃতীয়পদ—নাম আচার্য্য। ইহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে কুণ্ডল, ইনি যোগাসনে উপবিষ্ট, ইহার এক হস্তে পুস্তক অপর হস্তে কিছুই নাই।

চতুর্থপদ—নাম উপাধ্যায়। অরিহন্তের নিম্নদেশে অবস্থিত, মুণ্ডিত মস্তক, যোগাসনে উপবিষ্ট, হস্তদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পঞ্চমপদ—নাম সর্ব্বসিদ্ধ, মুণ্ডিত মস্তক, কর্ণে কুণ্ডল, যোগাসনে উপবিষ্ট, এক হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অপর হাত ক্রোড়দেশে স্থাপিত।

ষষ্ঠপদ—নাম সম্যক্। সিদ্ধ ও আচার্য্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, ইহার আকৃতি নাই। ইহার ঘরে লেখা আছে "নমো সংম্যগস্স" অর্থাৎ নমঃ সম্যক্বায়।

সপ্তমপদ—নাম জ্ঞানপদ। আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের মধ্যস্থলে খালি ঘরে লেখা আছে "নমো নাণস্স" অর্থাৎ নমো জ্ঞানায়।

অষ্টমপদ—নাম চারিত্র, উপাধ্যায় ও সর্ব্বসিদ্ধের মধ্যস্থলে খালি ঘরে লেখা আছে "নমো চারিত্তস্স" অর্থাৎ—নমশ্চারিত্র্যায়।

নবমপদ—নাম তপঃ। সিদ্ধ ও মহাসিদ্ধের মধ্যস্থলে খালি ঘরে লেখা আছে—"নমো তবস্স" অর্থাৎ নমস্তপসে।

নবপদের নাম (১) অরিহন্ত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্য্য (৪) উপাধ্যায় (৫) সর্ব্বসিদ্ধ (৬) সম্যক্ (৭) জ্ঞান (৮) চারিত্র (৯) তপঃ।

প্রতিমার নীচে দুই কোণে দুই গণধরের মূর্ত্তি। গণধর অর্থাৎ গুরু। অনেক শিষ্যের গুরু হইলে তাঁহাকে গণধর বলিত। গণধরেরা মুণ্ডিতমস্তক, কুণ্ডলধারী, ইহারা জোড়হাতে বসিয়া আছেন, পরিধানে কৌপীন, একটি হাঁটু ভূমির উপর, পদদেশ পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপিত, অপর পদের পদতল ভূমির উপর, হাঁটুটি উচ্চভাবে অবস্থিত।

প্রতিমার নিম্নভাগে অতি অস্পষ্টভাবে কয়েকটি অক্ষর লেখা আছে। যথা—

সংবৎ ১৯২৩..............শ্রী.................পভজী——

প্রতিমার পৃষ্ঠদেশে—প্রথম সূক্ষ্মাক্ষরে কিছু লেখা আছে তাহার পর স্থূলাক্ষরেও কিছু লেখা আছে। সূক্ষ্মাক্ষরে যথা—

৯০০০ সংবৎ ১৯২৩ মাঘ সুদি ১৩ মকররাশিসংস্থিতে ঘস্রাধিপতৌ শুক্রবারে—

ইদং চক্রমণ্ডলং পূজা শান্তি···শ্রীঃ ইন্দ্রেশ্বরে জৈনক্ষেত্রে···স্বর্গস্থানে—

স্থূলাক্ষরে যথা—

৯০০০ নবসহস্র বিম্বজ—নিহিত সর্ব্বসূরিণঃ সংবৎ ১৯২৩ মাঘ শুভদি ১১ বুধে দেশসসিন প্রতাপসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ভৃগু মঘ তপন সিংহদাহাল জৈনেন সহ সঙ্গত সহিতেন ভট্টতীর্থিন—

ওঁ নবপদঃ

সকল লিপিরই সম্বৎ মিলিল, ১৯২৩ হইল, কিন্তু ইহা বিক্রম সম্বৎ নহে। যেরূপ প্রাচীন স্থান হইতে এ প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায় তিনশত বৎসর হইল, নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ইহা জিন-সম্বৎ হইবার সম্ভাবনা। জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রিলোকসারে লিখিত আছে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে (৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী নির্ব্বাণলাভ করেন। বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণদিবস হইতে অব্দ গণনা করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ জৈনেরাও মহাবীরের নির্ব্বাণ দিবস হইতে একটি অব্দ গণনা করিয়া আসিতেছেন।

এখন জৈনাব্দ ২৪২৩ হইবে। যদি জৈনাব্দের ১৯২৩এ এই প্রতিমা স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে ইহা ২৪২৩—১৯২৩=৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার স্থাপনার স্থান ইন্দ্রেশ্বর। প্রতিমাস্থ লিপিতে ইন্দ্রেশ্বরকে জিনক্ষেত্র ও স্বর্গস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন এই ইন্দ্রেশ্বর কোথায়? রামরাম বাবু বলিয়াছেন, যে বরগ্রামে এই প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ইন্দ্রেশ্বর। তিনি যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ দিয়াছেন, তাহা ও আমরা এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমরা রামরাম বাবুর সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়াছি।

রামরাম বাবু বলেন, অনেক পরগণারই পরগণার নামে একটি প্রধান নগর থাকে যেমন পলাশী পরগণার প্রধান নগর পলাশী, হাভিসহর পরগণার প্রধান নগর হালিসহর,

কলিকাতা পরগণার প্রধান নগর ডিহি কলিকাতা, সেইরূপ ইন্দ্রাণী পরগণার ইন্দ্রাণী নামে একটি প্রধান নগর ছিল। ইহার প্রমাণও অনেক পাওয়া যায়—

যথা—চৈতন্যভাগবতে—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাঁটোয়া নামে গ্রাম। তথা আছেন কেশবভারতী শুদ্ধ ধাম॥"

মুকুন্দরামের চণ্ডীতে আছে—

মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আইসে যাহার স্মরণ॥"

কাশীরাম দাস বলিতেছেন—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

সুতরাং ইন্দ্রাণী নামে পরগণা ছিল এবং উহাতে ইন্দ্রাণী নামে একটি প্রধান নগরও ছিল জানা গেল। ইন্দ্রাণী তুলনায় কাঁটোয়ার একটি সামান্য নগর তাহাও জানা গেল। তথায় ইন্দ্রেশ্বর নামে হিন্দুর দেবতা ছিলেন, ইহা আমরা বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল হইতে জানিতে পারিয়াছি। যথা—"উজবনি ক্রম বাই, শিবা নদী পাথাই, গুধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।"

এই ইন্দ্রাণী নগর ও ইন্দ্রেশ্বর কোথায় ছিল? রামরাম বাবু তাহার ঠিকানা দিয়াছেন। বিপ্রদাসও দিয়াছেন। রামরাম বাবু কবিকঙ্কণ হইতে দেখাইতেছেন—

"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বরের পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপানি।
ভাউসিংহের ঘাটখান ডাহিনে এড়াইয়া। মেটেরী সহরখান বামদিকে থুইয়া॥"

মেটেরী সহর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বামদিকে মেটেরী ডানদিকে কিছু উজাইয়া ভাউসিংহের ঘাট, আরও কিছু উজাইয়া ইন্দ্রেশ্বর, আরও কিছু উজাইয়া মণ্ডলঘাট। তাহা হইলে মণ্ডলঘাট ও ভাউসিংহের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রেশ্বর। এখন এই দুই জায়গার ঠিক মধ্যস্থলে বরগ্রাম, এই বরগ্রামই ইন্দ্রাণী অথবা ইহার অতি সন্নিকটেই ইন্দ্রাণী অবস্থিত ছিল। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনে উহা এখন গঙ্গা হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে। বিপ্রদাস বলেন, কাঁটোয়া ছাড়িয়া ইন্দ্রেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর ছাড়াইয়া শিবানদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিবানদী আছে, কিন্তু গঙ্গা দূরে পড়ায় তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়ালনালা হইয়াছেন। ইন্দ্রাণী পরগণায়—

"বার ঘাট, তের হাট, তিন চণ্ডী, তিন শ্বর, এ যে জানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।"

যে পরগণায় তের হাট থাকে সে একটা বড় বাণিজ্যের স্থান, এখন সে গঞ্জ কাঁটোয়ায় হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা ইন্দ্রাণীতে ছিল, ব্যবসায়ের জায়গা হইলেই জৈনেদের বড়ই প্রতিপত্তি হয়, ইন্দ্রাণীতেও ছিল। তাই একজন জৈন এই প্রতিমা ইন্দ্রাণীতে স্থাপন করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে ভাণ্ডসিংহের ঘাট, ভূগুসিংহের ঘাট, ভাউসিংহের ঘাট বা ভাউ ঘাট হইয়াছে। ফলকে লিখিত ভূগুসিংহই এই ঘাটের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(১)

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং।" আমাদের বাঙ্গালা পুস্তক সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ইংরাজাধিকারে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যে সকল পুস্তক বাহির হইয়াছে, সে সকলের কথা বলিতেছি না। বাঙ্গালা-মুদ্রাযন্ত্র হইবার পূর্ব্বে যে সহস্র সহস্র বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি।

অনেকেরই বিশ্বাস, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় শতাধিক পুস্তক ছিল কি না সন্দেহ! এত যে সাহিত্য-চর্চ্চা, এত যে অভিনব বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার, তাহা ইংরাজ-প্রভাবের ফল। বাল্যকালে আমাদেরও এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু বহুদিবস হইতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে।

এখন যেরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে, যেরূপ সন্ধান পাইতেছি, প্রতিদিন যেরূপ পুথি সংগৃহীত হইতেছে, এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মোটামুটী বলিতে পারা যায়, বাঙ্গালার নানাস্থানে বিভিন্ন লোকের যত্নে রচিত এখনও দশসহস্রাধিক বাঙ্গালা পুথি রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। বাঙ্গালা দেশে এমন বিশিষ্ট পল্লী নাই, যেখান হইতে না দুই চারি জন পল্লী-কবি আবির্ভূত হইয়াছেন।* এমন দিন গিয়াছে, প্রত্যেক গ্রামবাসী স্ব স্ব পল্লী-কবির মহিমায় আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। সেই সকল পল্লী-কবির প্রভাবে শান্ত শিষ্ট গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন মত-প্রচলন, বিভিন্ন ধর্ম্মের উত্থান-পতন, জাতীয় শক্তি-সংগঠন, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন এ সমস্তই পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন। বিভিন্ন সময়ের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস কিরূপ ছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন কিরূপে গঠিত হইয়াছে, প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার, রীতিপদ্ধতি, ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল ও কিরূপে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাঙ্গালা পুথিসমূহ হইতে সেই অতি প্রয়োজনীয় কথা উদ্ধার করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ হইতেছে। কেবল ইহাই নহে। যাঁহারা ভাষা-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা বঙ্গভাষার উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে চাহেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির অনুসন্ধান ও প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি-পরিদর্শন তাহাদের

---

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালা পুথি-সংগ্রহে সাধারণের যত্ন বৃদ্ধি হইবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, ভাবিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

আপাততঃ আমরা আমাদের আয়ত্তাধীন বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের পুথির কথাই বলিব। অতঃপর অপরাপর মহাত্মাগণের সংগৃহীত পুথির তালিকাও প্রকাশ করিব।

এ পর্য্যন্ত বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে পাঁচ শতের অধিক বিভিন্ন বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। এখন যেরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে, যদি এইরূপ ভাবে পুথি সংগ্রহ হইতে থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, এক বর্ষের মধ্যে প্রায় ২।৩ হাজার বিভিন্ন নামধেয় পুথি আমাদের হস্তগত হইতে পারিবে।

আপাততঃ ২০৪ খানি পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অকারাদি বর্ণানুক্রমে প্রকাশ করিলাম *। ইচ্ছা ছিল, এই সমস্ত পুথি সমালোচনপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও ভাষার পরিচয় প্রকাশ করিব; কিন্তু সময়াভাববশতঃ এবার তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বারান্তরে অবশিষ্ট পুথিরও এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

অবশেষে সাধারণের প্রতি নিবেদন,—যাঁহার নিকট প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি আছে, তিনি সেই সেই পুথির প্রারম্ভ ও শেষ কবিতাগুলি, গ্রন্থকারের পরিচায়ক শ্লোকসমূহ, পুথিলেখকের নামধাম, পুথি নকলের তারিখ, শ্লোকসংখ্যা বা পত্রসংখ্যা, এবং পুথির অধিকারীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। তাঁহার প্রেরিত প্রাচীন অথবা সাধারণের অজ্ঞাত বাঙ্গালা পুথিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইবে।

---

* প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি মাত্রই বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ইচ্ছা ছিল, যে পুথিতে যেরূপ লেখা আছে, অবিকল তাহাই উদ্ধৃত করিব; কিন্তু সেই উদ্ধৃত কবিতাগুলি অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তজ্জন্য কেবল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হইল। কিন্তু ব্যাকরণগত যেরূপ প্রাচীন পদাদি ও বিভক্তি আছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না।

১ । অক্রূর আগমন । কবিচন্দ্র ও শঙ্কর ।

আরম্ভ—

নারদ আসিল তথা কংসরাজে কয় ।
দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ।

মধ্য—

হইলা বামন কায় বলিরে ছলিলে ।
পরশুরামের রূপে ক্ষত্রীকুল সংহারিলে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ব্যাসের আদেশে ।
স্বপ্নে কৃপা কৈল যারে ঠাকুরের বেশে ॥

শেষ—

দরশন দিয়া কুব্জির কুজ মোচন কৈল ।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ শঙ্কর রচিল ॥

ইতি অক্রূর আগমন সমাপ্ত ।

(শ্লোকসংখ্যা প্র. ১৫০। ইহার আর একখানি পুথি আছে, তাহা ১০৯০ সনে লিখিত ।)

২ । অঙ্গদের রায়বার । ঘোষাল শর্ম্মা ।

আরম্ভ—

সমুদ্র পার হোকে রাম থাপা হোকে বৈঠা ।
আগো পর বুঝি লিকুলে মাঙ্গার রজিন চোট্টা ॥

শেষ—

ভণয়ে ঘোষাল শর্ম্মা আপুকে জহুদার ।
অবমকো প্রভু করব হুকুম হোয়ে বন্দিয়া উতর পার ॥

ইতি ঘোট্টা অঙ্গদের রায়বার সমাপ্ত ।

পাত্রসায়ের গোপীনাথপুর সন ১০৮৮ সাল তারিখ ২৮শে কার্ত্তিক রোজ সোমবার তিথি শুক্লা সপ্তমী বেলা তৃতীয় প্রহরে লেখা হইল । (শ্লোক সংখ্যা ১০০ ।)

৩ । অজামিলের উপাখ্যান । কবিচন্দ্র ।

আরম্ভ । (প্রথম পাত নাই, ২য় পাত হইতে)

মধ্য—

এই সব শোক করি, অন্তরে স্মরয়ে হরি,
দ্বিজ যোগে তনু তেয়াগিল ।

শেষ—

এতদূরে অজামিল উপাখ্যান সায় ।
অদ্ভুত ভারত কথা কবিচন্দ্র গায় ॥
লিখিতং শ্রীনিমাই চন্দ । সন ১০৮৭ সাল ।

৪ । অধ্যাত্ম-রামায়ণ । শ্রীলক্ষ্মণ দাস ।

(আদিকাণ্ড ।)

আরম্ভ ।—(প্রথম পাত নাই ২য় পাত হইতে)

মধ্য—

দ্বিতীয় কাণ্ডে অযোধ্যা রাম বনবাসী ।
অরণ্যেতে বনে বনে সন্তাষেণ ঋষি ॥

শেষ—

আধ্যাত্মিক রামায়ণ আদিকাণ্ড সায় ।
রামপদরজ আদি শ্রীলক্ষ্মণ গায় ॥

(শ্লোক সংখ্যা ৮০০ ।)

৫ । অধ্যাত্ম-রামায়ণ । শ্রীলক্ষ্মণ দাস ।

(অযোধ্যা কাণ্ড ।)

(১ম পাত নাই । ২য় পাত হইতে)

এইরূপে দিন যায় আনন্দ সতত ।
শাসন করেন পুণ্য রাজা দশরথ ॥

ভণিতা—

শ্রীরাম চরণ-পদ্মে নিবেদিয়া মন ।
ব্যাস বাল্মীকির মত বলে শ্রীলক্ষ্মণ ॥

শেষ—

রামের পাদুকা তায় করিল স্থাপন ॥
ভরত ধরেন ছত্র পাদুকা উপর ।
শত্রুঘন মহাবীর ঢুলায় চামর ॥
রাজ্যচর্চ্চা পাদুকায় নিবেদন করি ।
বিচারেন ভরত শ্রীরাম পদ স্মরি ॥
এত দূরে অযোধ্যা কাণ্ডের কথা সায় ।
অভিপ্রায় ব্যাসের মত শ্রীলক্ষ্মণ গায় ॥

(শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০ ।)

৬ । অভিরাম-বন্দনা । রাইচরণ দাস ।

আরম্ভ—

বন্দিব শ্রীগুরু যাহা কল্পতরু
সর্ব্বসিদ্ধি যার পদে ।
যাহার কৃপাতে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে
মিলে ঘুচে অপরাধে ॥

* * * *

বন্দিব আনন্দ মনে বৃন্দাবনচন্দ্র।
বীরসিংহ গ্রামী যার প্রকট আনন্দ ॥
গ্রাম পূর্ব্বদিকে হয় যার শ্রীমন্দির।
দরশনে সুসৌষ্ঠব অতি মনোহর ॥

ভণিত—

এ রাইচরণ দাস সদা করে অভিলাষ-
কবে দাস হইব তোমার ॥

মন্তব্য।—(এই গ্রন্থে অভিরাম গোস্বামী ও জাহ্নবা ঠাকুরাণীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে ও পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিজ রামপ্রসাদ কবির পদও উদ্ধৃত আছে। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪২০।)

ইহার আর একখানি পুথি আছে, তাহা ১০২৫ সনে লিখিত।

৭। সমুক্তরসাবলী।—

আরম্ভ—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দ, সাবধান হৈঞা বন্দ,
যাহা হৈতে তিমির বিনাশে।
করুণা কর নিজ গুণে, মহিমা লেখুক সর্ব্বজনে,
এই নিবেদন করু দাসে ॥

মধ্য।—সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল।
সহজ না জানিলে অনর্থক হৈল।
বস্তু প্রকাশিব আমি যেই যেই হয়।
শ্রীবৃন্দ লেখাঞাছেন হইয়া সদয় ॥
কবিরাজ গোসাঞীকে যবে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
গ্রন্থ বর্ণন কর তাহারে কহিল।
গোসাঞি কহেন বুঝি করি নিবেদন।
আমার শক্তিতে গ্রন্থ না যায় বর্ণন ॥
নিতাই কহেন তুমি অন্যথা কর মনে।
চৈতন্য লেখাবে তোমারে আসিয়া আপনে ॥
তাঁহার আজ্ঞাতে কৈল গ্রন্থ-বিরচন।
যে লিখাইল তাহা করিল লিখন ।১
তার মধ্যে আর এক বস্তু কৈল সার।
প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা হইল আমার ।২
তাহা লাগি সেই তত্ত্ব করিল প্রচার ।৩
নিষেধ করিল নিতাই না লিখিল আর ॥
ভক্তিকল্পলতিকাতে দেখ বিচার করিয়া।
সহজ লিখিতে প্রভু কলম লৈল কাড়িয়া ।৪
চৈতন্যচরিতামৃতে সহজ সংক্ষেপে লেখিল।
জীব তরে গোসাঞি জীউ লেখিয়া রাখিল ।৫
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জীবের লাগিয়া।
দেশে দেশে ফেরেন প্রভু প্রেম প্রচারিয়া ।৬
জীবের মনে সহজ বস্তু সামান্য হইবে।
সামান্য জ্ঞান হৈলে জীব অধোগতি যাবে ।৭
প্রেমরত্নাবলী গ্রন্থে সহজ ভাঙ্গিতে।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে ॥
দিবারাত্রি হঞা গেল কিছুই না জানে।
আপনে নিতাই আসি কহিল স্বপনে ॥
দেখিয়া তাহার দশা আজ্ঞা কৈল তারে।
সহজ বস্তু প্রকাশ কর করিয়া প্রচারে ।৮
তবে শ্রীরূপ ঠাকুর আজ্ঞা মাগি নিলা।
যেই বাঞ্ছা হয় তবে তাহারে আজ্ঞা দিলা ।৯
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব স্বরূপ গোসাঞি জানে।
রঘুনাথে শিখাইলা করিয়া যতনে ॥
সেই রঘুনাথ দাস তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
কৃপা আজ্ঞায় গোসাঞি মুকুন্দে কহিলা ॥
মুকুন্দদেব তবে গোসাঞির আজ্ঞা পেঞা।
সহজ বস্তু লিখিলেন সংস্কার করিয়া ।১০
সেই পুথি দয়া করি দিলেন আমারে।
সংস্কার বুঝিতে বোঝা দিয়া দিলা তারে ॥

(১) লিখাইল নিতাই তাহা করিল লিখন।
(২) তার মধ্যে এক বস্তু অতি যে বিস্তার।
(৩) তাহা নাকি সতেক তত্ত্ব করিল প্রচার।
(৪) সহজ লিখিতে প্রভু কলম নিল কেড়া।
(৫) জীবের ভয়েতে গোসাঞি লিখিয়া রাখিল।
(৬) দেশে দেশে বেড়াইল প্রেম প্রচারিয়া।
(৭) জীবের মনে সহজ সামান্য জ্ঞান হয়।
সামান্য বলিলে জীব অধোগতি যায় ॥
(৮) সহজ বস্তু পৃথক্ করি করহ বিচার।
(৯) যেই বাঞ্ছা হয় তোমা আজ্ঞা তারে দিল।
(১০) সহজ তত্ত্ব লিখিলেন সংস্কার করিয়া।

তবে মুকুন্দদেব বুঝি আমার মন ।
বিচার করিয়া তাহা করিলা লিখন ॥
মোর হাতে কলম দিয়া লিখাইল আপনে ।
বাক্য করণ নহে মনের করণে ॥
গোসাঞি মুকুন্দ বলে সহজ বস্তু বলি ।
শ্লোকার্থ ভাঙ্গিয়া দিয়া লেখহ সকলি ॥[১১]

শেষ—

অমৃত রসাবলী এই গ্রন্থ মহাশূর ।
রসিক ভক্তের নিকট অভক্তের বহু দূর ॥

* * * *

শ্রীমুকুন্দদেবের আজ্ঞায় লিখিলাম আমি ।
কত না দিবার বেলা যে মানা কৈলেন তিনি ॥
অতএব প্রাণ তোকে কৈলাম সমর্পণে ।
প্রাণ নিকটে ইহা রাখিবি গোপনে ॥

ইতি অমৃতরসাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। তাত্র মাসে সতর তারিখে লিখেছি। লিখিতং পিয়ারী দাস নাড়া। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩২০।)

৮। অম্বরীষ উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুক কহে শুন পরীক্ষিত নরপতি ।
বৈষ্ণব যাহারে কোপে তার নাহি গতি ॥
মন দিয়া শুন তুমি নবনের কথা ।
ব্যাসের বর্ণন বৈষ্ণবের গুণ গাথা ॥
অম্বরীষ নামে রাজা ছিল পুণ্যবান্ ।
দান ধর্ম্ম পূজা করে কৃষ্ণগুণ গান ॥

শেষ—

বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তি কবিচন্দ্র গায় ।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

সন ১০৮০ সাল তাং ১৮ই ফাল্গুন বৈকালে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনিমাইদাস চন্দ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

৯। অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা কহ তপোধন ।
তার পর কি করিলা পিতামহগণ ॥

শেষ—

অর্জ্জুনে বিদায় দিলা প্রভু যদুরায় ।
ব্যাসের আদেশে দীন কবিচন্দ্র গায় ॥
ইতি অর্জ্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ সমাপ্ত ।

স্বাক্ষরমিদং শ্রীনন্দচন্দ্র মণ্ডল সাং রাউতখণ্ড। সন ১২৫৫, তারিখ ২০শে জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা ২০০)

১০। অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

রাজা বলে মুনিবর জিজ্ঞাসি তোমারে
তার পর কি করিলা পঞ্চ সহোদরে ॥

শেষ—

হনু আগে অর্জ্জুন তবে হইল বিদায় ।
এত দূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্রে গায় ॥
অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা সমাপ্ত ।

লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম সরকার, সাং পাত্রসায়ের। এই পুস্তক শ্রীগঙ্গানন্দ দেঁদ তন্তুবায়ের। ইতি সন ১১০১ সাল ২৫শে মাঘ রোজ শুক্রবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৩০।)

১১। আটি রস। গোবিন্দদাস।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
শ্রীনিত্যানন্দ পর মোর স্ফুরুক অন্তরে ॥
দুই প্রভুর অঙ্গ পাঞা করঞ প্রণতি ।
সবে মোরে কর দয়া তবে যে পীরিতি ॥

মধ্য—

গোবিন্দদাস কহে একহি বিচার ।
টুটিল বাণ বিষে লোচন ভার ॥

শেষ—

খণ্ডিত (১২ পাতের পর আর নাই।)

---

(১১) শ্লোকার্থ ভাঙ্গিয়া জেধার সকলি ॥

এই সকল পাঠান্তর আর একখানি ২০১ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে দেওয়া গেল।

১২। আত্মজিজ্ঞাসা *। শ্রীকৃষ্ণদাস।

আরম্ভ।—অথ আত্মজিজ্ঞাসা লিখ্যতে। তুমি কে? আমি জীব। কোন্ জীব? তটস্থ জীব। থাক কোথা? ভাণ্ডে।

শেষ—

সহচরী সহ আস্বাদিতে মোর চরণ আশ।
জিজ্ঞাসাতত্ত্বসারাংসার কহেন শ্রীকৃষ্ণদাস॥
ইতি আত্মজিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ।

লিখিতং শ্রীরূপদাস দাড়া, সাং রসোড়া। ইতি সন ১২৫২ সাল আশ্বিন্নি তারিখ ৩রা বৈশাখ।

---

* নরোত্তম রচিত দেহকড়চের সহিত ভণিতা ছাড়া অন্য সকল অংশে মিল আছে। (পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই গ্রন্থ কৃষ্ণদাস বা নরোত্তম কাহার রচিত, তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, এখানি প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ হইলেও অপর কোন ব্যক্তি কৃষ্ণদাস বা নরোত্তমের নামে মেকী চালাইয়াছেন। কেহ বলেন, দেহকড়চ স্বরূপকল্পতরু নামক গ্রন্থের এক সামান্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু আমরা ছয়খানি নরোত্তমের ভণিতাযুক্ত দেহকড়চ ও তিনখানি কৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা পুথির সন্ধান করিয়াছি, তদ্দ্বারা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থ কোন বৃহৎ গ্রন্থের অংশ মাত্র। স্বরূপ-কল্পতরু একখানি আধুনিক সংগ্রহগ্রন্থ। সুতরাং সেদিনকার পুথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেহকড়চ বা আত্ম-জিজ্ঞাসাকে কোন গ্রন্থের অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা দুই শত বর্ষের লেখা দেহ-কড়চ পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বের লেখা স্বরূপকল্পতরুবৎ পুথি না পাইলে এই গ্রন্থ কোন বৃহৎ পুথির অংশ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনেকের বিশ্বাস আলোচ্য গ্রন্থখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের লেখা। গৌরাঙ্গদেব যাঁহার পদাবলী শুনিয়া বিমুগ্ধ হইতেন, সেই চণ্ডীদাসও একজন সহজ সাধক। অনধিকারীর সহজ মত বুঝিবার সাধ্য নাই। সহজ মত এখন নেড়ানেড়ীর হাতে পড়িয়া ভ্রষ্ট হইয়াছে।

১৩। আত্মনিরূপণ। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য চেতন জনয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরুমহাশয়॥

মধ্য—

জগত জীবন প্রভু ভকত হৃদয়।
কেমনে আছয় তাহা শুনহ নির্ণয়॥

শেষ—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
আত্মানিরূপণ কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি আত্ম-নিরূপণ সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীকেশবলাল সরকার। নিবাস বিষ্ণুপুর সন ১২১৮ সাল তারিখ ১৬ই শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১১২।)

১৪। আনন্দ-ভৈরব। প্রেমদাস।

আরম্ভ—

প্রেমাঙ্কুরৈঃ ক্ষোভগাকারিকাঃ স্পর্শ-ইচ্ছা রসাসনাধিকাঃ॥
যথা রাগ।

পদ্মাবতী কহে যুক্তি করি নিবেদন।
এই শ্লোকের অর্থ কর শুনিতে হয় মন॥
কান্ত শ্লোকার্থ করিয়ে স্মরণ।
যাহে শান্তি হয় যায় অমনের করণ॥
অনাদি ব্রহ্মার ধ্যানে শক্তির জনম।
তার রূপে তার মন কৈল আকর্ষণ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা হৈল সঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হৈল জনম॥
মুখে ব্রহ্মা বুকে বিষ্ণু শিব জগদ্বারে।
ক্রমে ক্রমে প্রবল হৈলা তিন সহোদরে॥

শেষ—

শ্রীগুরুপদারবিন্দ হৃদে করি আশে।
আনন্দভৈরব কহে প্রেমদাস॥
ইতি আনন্দভৈরব সমাপ্ত।

বৈরাগী বৈষ্ণবের এ পথ নহে রসিকের কারণ।
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রেম-প্রয়োজন॥

শ্রীপিয়ারিদাস দাড়া। সাং পাত্রসায়ের।

(শ্লোকসংখ্যা ৩৫০।)

১৫। আনন্দলতিকা।—লোচন দাস।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই ভাই।
অবনীমণ্ডলে দোঁহে সুখে গুণ গাই॥

শেষ—

যত দোষ না লইবা সাধুমহাজন।
বিনতি করিয়া কহে এ দীন লোচন॥
ইতি আনন্দলতিকা সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকান্ত দেবশর্ম্মা সাং খানজুই। শ্রীতিলকরাম নন্দী সাং জামকুণ্ডী লিখিয়া সমাপ্ত করিনু। সন ১০৮০ সাল তাং ৫ই শ্রাবণ। রোজ মঙ্গলবার বেলা ছয় দণ্ডের সময়। শ্রীরঘুনাথ কুণ্ডুর পাঠশালে দক্ষিণমুখে বসিয়া লিখিয়া সমাপ্ত হইল। পুস্তক শ্রীচৈতন্যচরণ দেবশর্ম্মা নিবাস দক্ষিণপাড়া। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০। ইহার আর দুইখানি প্রাচীন পুথি আছে।)

১৬। আশ্রয়নির্ণয়।—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

অথ আশ্রয়নির্ণয়। আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নামাশ্রয় ১, মন্ত্রাশ্রয় ২, ভাবাশ্রয় ৩, প্রেমাশ্রয় ৪, রসাশ্রয় ৫, এই পঞ্চপ্রকার।

শেষ—

অষ্টপদ্ম চরণে ২, মুখে ১, নেত্রে ২, নাভি ১, কর ২, শ্রীমতীর হারমালা, মুক্তামালা, কাঞ্চনমালা এবং শ্রীমতীর বনমালা এক। বৈজয়ন্তিমালা, মুক্তামালা।
ইতি আশ্রয়নির্ণয় সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীমথুরদাস বৈরাগী। সন ১২১৯, ২৭শে পৌষ শনিবার রাত্রে সমাপ্ত। (১০৯৮ সনে লিখিত আর একখানি পুথি আছে।)

১৭। উজ্জ্বলনীলমণি।—

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত মূলের অনুবাদ।

আরম্ভ—

জয় সনাতন গৌর পরম সুন্দর।
এক আত্মা প্রকট দুই কলেবর॥

শেষ—

ভাষাচ্ছন্দে কিঞ্চিৎ কহিল স্বল্পাক্ষরে।
বৈষ্ণব ঠাকুরদাস জেনিবে আমারে॥
ইতি উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ইতি সন ১২৬৯ সাল ২৭শে বৈশাখ। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৩৫।)

১৮। উঞ্ছবৃত্তির পালা।—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

মন দিয়া শুন সবে ভারত পুরাণ।
শ্রবণে কলুষ নাশ অন্তে মুক্তি স্থান॥

শেষ—

হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হৈল সায়।
ভারত শ্রবণে নর চতুর্ব্বর্গ পায়॥
ইতি উঞ্ছবৃত্তির পালা সমাপ্ত।

পাত্রসাএর গ্রামের শ্রীগোকুলদাস বৈষ্ণবের লিখিত। ইতি সন ১০৬১ সাল। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৩০।)

১৯। উদ্ধবদূত।—মাধব গুণাকর।

আরম্ভ—

গোপীকার প্রাণবন্ধু কৃপা অম্বুধি।
প্রণয় পটুতা তিঁহ সর্ব্ব গুণনিধি॥
প্রেমসিন্ধু আদেশেতে আইলা গোকুল।
গোপগোপী দুঃখ দেখি হইলা আকুল॥

শেষ—

তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম।
কবিশিখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম॥
তার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর।
পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্বগুণধর॥
গজসিংহ নামে রাজা ছিল বর্দ্ধমানে।
তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে॥
উদ্ধবদূত গ্রন্থ করিল রচন।
তাহা শুনি মুগ্ধ হয় যত সভাজন॥
(শ্লোক সংখ্যা ৭৮০।)

২০। উদ্ধবসংবাদ।—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৃন্দাবন পাশরিতে নারেন মাধবে।
নবীন কুঞ্জ বৃন্দাবন জাগে॥

তাহাতে বসিলেন কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিলা কিছু গোপীর হিত॥

শেষ—

এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিলা।
শুনিয়া সভার প্রেম ভাবিতে লাগিলা॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে।
দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধব গমনে॥

ইতি শ্রীউদ্ধবসংবাদ সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীজগন্নাথ সরকার, সন ১১০২ সাল। তাং ৭৩শে চৈত্র রোজ বুধবার, তিথি চতুর্দ্দশী, বেলা ৬ দণ্ডে সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ৫০০।)

২১। উদ্ধবসংবাদ।—দ্বিজ নরসিংহ।

আরম্ভ—

এক দিন বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিল কৃষ্ণ গোপীর চরিত॥
গোকুলে গোপীর সঙ্গে যত কৈল লীলা।
সে সব সোঙরি কৃষ্ণ বিবশ হইলা॥

শেষ—

এতেক কহিল সখা ব্রজের কথন।
তোমা না দেখিয়া সবার বিকল পরাণ॥
দ্বিজ নরসিংহ বলে গোপীপদতলে।
অন্তকালে স্থান দিহ চরণ-কমলে॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২২। উপাসনা-পটল।—নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে শ্রীরূপং শ্রীসনাতনং।
শ্রীগোপালভট্টং বন্দে শ্রীজীবং শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করং॥ — see note
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু রূপসনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীব চরণ॥

মধ্য—

অপ্রাকৃত প্রেম কেমনে স্ফুরে জীবে।
এ কারণে শিক্ষাগুরু মহান্ত স্বরূপে॥

শেষ—

তোমা সভার পদরজ চিত্তে অভিলাষ।
উপাসনা-পটল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি উপাসনা-পটল সমাপ্ত।

লিপিকরিয়ং শ্রীপ্যারীমোহন দাস বাড়ৈ, সাং প্রাম সাএর গোবিন্দপুর। তাং ১৯শে আষাঢ়, তিথি কৃষ্ণাষ্টমী। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৮১০।)

২৩। একাদশীব্রত পালা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুক বলে পরীক্ষিৎ ধরহ বচন।
একাদশীব্রত রাজা কর আরম্ভণ॥
রুক্মাঙ্গদপুরে রাজা সঙ্গে সন্ধ্যা রাত্রি।
পাত্রমিত্র পুরজন সভাকারে আনি॥

শেষ—

এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অন্তর্ধ্যান।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে করিলা পয়ান॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় কাংসের বাঞ্ছা পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায়॥

ইতি রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশীব্রতের পালা সমাপ্ত। সন ১০৮৭ সাল। তাং ৭ই পৌষ (শ্লোক-সংখ্যা ২৫০।)

২৪। কংস বধ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বাদ্য বাজাইতে মানা করে কংসাসুর।
কৃষ্ণে পুরী হইতে করি দেহ দূর॥

শেষ—

দুই ভাই প্রেমাবেশে হাত ধরাধরি।
পিতামাতা স্থানে গেল যেথা অন্তঃপুরী॥
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
শুনিলে কংসের বধ যমের নাহি দায়॥
কৃষ্ণের পীরিতে হরি বলহ সভায়।
এত দূরে কংসবধ পালা হল সায়॥

লিখিতং শ্রীগৌরমোহন শর্ম্মা। সাং পাত্রসায়ের মৌজে বৈকুণ্ঠপুর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০।)

২৫। কণ্বমুনির পালা। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—১ম পাত নাই।

মধ্য—

ধ্যান ভঙ্গ হইল মুনির প্রকাশ নয়ন।
দেখে পাতে অন্ন খায় শ্রীনন্দের নন্দন॥

শেষ—

কৃষ্ণদাস বিরচিত ভক্তের ভগবান।
নন্দ আদি সকলে হইলা বিস্ময়ন॥
ইতি শ্রীকণ্বমুনির পারণ সমাপ্ত
(শ্লোকসংখ্যা ১৬০।)

২৬। কণ্বমুনির পারণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুক কহে শুনক আদি নিবেদি সভারে।
বিহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে॥

শেষ—

অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
ভক্তহীন মুক্তি পায় ব্যাসের নন্দন॥
রাধার মঙ্গল গীত কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি পারণ-পালা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামকান্ত দত্ত। সাং পাত্রসায়ের। এ পুস্তক শ্রীবিশ্বম্ভর বাতি ভত্তরায়ের। সাং মাজপার। ইতি সন ১২২০ সাল, তারিখ ৫ কার্ত্তিক, রোজ সোমবার, তিথি শুক্লা প্রতিপদ, নক্ষত্র শতভিষা, বেলা ৫ দণ্ডে সমাপ্ত হইল।

২৭। কপিলামঙ্গল। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—কপিলামঙ্গল।

শুন সর্ব্বজন মন দিয়া ইতিহাস।
শুনিলে সকল পাপ হইব বিনাশ॥
কপিলামঙ্গল গীত শুনিতে রসাল।
শুনিলে সকল পাপ হরেক তৎকাল॥

শেষ—

লীলাবতী কপিলার চরণ ধরিয়া।
কপিলার পূজা কৈল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
এই পুথি যতনে যেবা রাখে নিকেতনে।
অষ্টশত পাল তার বাড়ে দিনে দিনে॥
এই মত রহিল গাই মধুরামণ্ডলে।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে বলে॥
(শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

২৮। কপিলামঙ্গল। খুদিরাম দাস ও কেতকাদাস।

আরম্ভ—

নারদ বলেন বোল করিতে বিড়ম্বনা।
ব্রহ্মমূর্ত্তি হতে মোর নাঞ্চক বাসনা॥
ব্রহ্মমূর্ত্তি হইয়া যার কপিলা ছলিতে।
গোবাগা বলিয়া মোরে বুঝিবে জগতে॥

শেষ—

দিতে নিজ পরিচয় চলে মুনি মহাশয়।
সুকবি কেতকা দাস কয়॥

*　　　*　　　*

রামের সনে যাব সনে বলিছেন লক্ষণ।
ক্ষুদিরাম দাসে মাগে চরণে স্মরণ॥

ইতি কপিলামঙ্গল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমধুসূদন কুণ্ডু। সন ১২২৮ সাল, তারিখ ১৩ বৈশাখ, রোজ বুধবার, বেলা আড়াই প্রহর হইতে সমাপ্ত হইল।
(শ্লোকসংখ্যা ১৫০।)

২৯। কালিকামঙ্গল। ভারতচন্দ্র।

আরম্ভ—অথ কালীমঙ্গল লিখ্যতে।

ভবানন্দ মজুমদারের * * * হরি।
বর চাহ মনমত তাহা দিতে পারি॥

*　　　*　　　*

সাঙ্ক্ষেপে কহিতে হইল কহিতে বিস্তর।
অতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর॥ * * *॥
প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের সমর॥ * * *॥
ত্রিপদী ছন্দ॥ * * *॥
যশোর নগর ধাম, প্রতাপআদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।

*　　　*　　　*

শেষ—

ভারত কহেন নিত্য বিহরয় রায়।
এত দূরে কালিমঙ্গল জাগরণ সায়॥

ইতি কালিকামঙ্গল জাগরণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল। সাকিম নন্দীপুষ্করণী। পাঠক

শ্রীব্রজমোহন চন্দ্র, সাং গাঁজদোনা। সন ১২৪৮ সাল, তারিখ ২৮ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

মন্তব্য।—ইহার আর একখানি পুঁথি আছে, তাহার আরম্ভ নাই, কিন্তু শেষে কেবল জাগরণ নহে সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ আছে।

ইতি হইল সায়, ভারত সঙ্গীত গায়,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিয়া।
ভুরশুট্যা পরগণায়, ব্রাহ্মণ নরেন্দ্র রায়,
সুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তার, কালিকামঙ্গল সার,
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীরামকুমার মজুমদার, সাং বহলোলপুর, পং খণ্ডঘোষ সন ১২২৮ সাল। তারিখ ৩ কার্ত্তিক।

৩০। কালিকাবিলাস। কালিদাস।

আরম্ভ—

কহিল ভাগুরি মুনি, কহ ত শুনি,
মার্কণ্ডেয় মহামুনি।
অষ্টম মন্বন্তরে, যে হইল ছত্রধরে,
কি পুণ্য কৈল সেইজন॥

ভণিতা—

কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
রচিলা শ্রীকালিদাস কালিকাবিলাস।

শেষ—৩০ পাতের পর খণ্ডিত। যে অবধি আছে, তাহার শ্লোকসংখ্যা ১৭৪০।

৩১। কালীয় দমন। দ্বিজ পরশুরাম।

আরম্ভ—

ধেনুক অসুর মারি প্রভু মহাবল।
নিউয়ে সকল লোক খায় তার ফল॥

* * *

শেষ—

এইরূপে রহিলা সভে সেই বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে দ্বিজপরশুরাম ভণে॥

ইতি কালীয়দমন সমাপ্ত, সন তাং ২৩ মাঘ শকাব্দা ১৬৭১।

৩২। কুঞ্জ-বর্ণন। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

* * *

বন্দিব শ্রীগুরুদেব আনন্দ করিয়া।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করো ভূমিতে পড়িয়া॥
যাহার প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধি অব্যাহতি।
তাহার চরণ বিনু অন্য নাহি গতি॥

* * *

পদ্মের লহরী কিবা ভাল সুশোভিত।
চাতকাদি পক্ষি শব্দ করে সুললিত॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখ কোটীচন্দ্র শোভা।
চকোর চকোরী তাহে অতি মনোলোভা॥

শেষ—

শ্রীলোকনাথ গোসাঞি পাদপদ্ম করি আস।
কুঞ্জবর্ণন গায় নরোত্তম দাস॥
ইতি কুঞ্জবর্ণ সমাপ্ত। (শ্লোক প্রায় ১৫০।)

৩৩। কুন্তির শিবপূজা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি আদিপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারতের কথা শুনে জন্মেজয়॥

শেষ—

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
এতদূরে পালা সায় কবিচন্দ্রে ভণে॥

ইতি শ্রীকুন্তির শিবপূজা সমাপ্ত। ইতি সন ১০৭৯ সাল, তাং ১৮ই ভাদ্র বেলা ১ প্রহরে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনিমাইচরণ দাস, সাং বনবিষ্ণুপুর—সম্প্রতি পাতসায়ের (শ্লোকসংখ্যা ১০০।)

৩৪। কৃষ্ণকর্ণামৃত। যদুনন্দন দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি।

* * *

বন্দ গুরু পাদপদ্ম প্রণাম অবলে।
যাতে হইতে বিঘ্ননাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে॥

* * *

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু,
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ।
এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা।
সারঙ্গরঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা॥
তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু চৈতন্য গোসাঞি।
যার গুণে কলির জীব তরিল সভাই॥

শেষ—

কৈল আমি যে বকনে সব প্রভুর শ্রীচরণে।
এ যদুনন্দন গেল ভুলে॥

*　　*　　*

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে সংস্কৃতবর্ণনে শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যানং প্রাকৃতভাষান্বিতং শ্রীযদুনন্দনদাসেন কৃতং অষ্টমপ্রকাশসম্পূর্ণং।

বাটী হইতে কার্য্য অন্তে দিনাজপুর গমন।
আমানি-গঞ্জে করিলাম পাণিগ্রহণ॥
আমার শ্বশুর বন্ধ আছেন কোম্পানি কাটিকে।
তেকারণে স্থিতি মোর হৈল চার মাস।
তেঁহ আদেশ কৈলা পুস্তক লিখিতে আমাকে।
খালাস হইয়া তেঁহো গেলেন কলিকাতা।
এ সনে আমার গ্রন্থ লেখা হইল সমাপ্ত॥

স্বাক্ষরমিদং শ্রীশচীনন্দন মিত্র। সাকিম বর্দ্ধমানের কটারোড়া। ইতি সন ১১৯০ তারিখ ১২ই ভাদ্র রোজ শনিবার দশ দণ্ড বেলা।

৩৫। কৃষ্ণমঙ্গল। দ্বিজ জীবন।

আরম্ভ—

শুন শুন শ্রোতাগণ হয়ে এক চিত।
শুকদেব কহে কথা শুনে পরীক্ষিৎ॥
দরিদ্র সুদামানাম এক দ্বিজবর।
অবন্তীনগরে মুনি বহুকাল ঘর॥

ভণিতা—

শুন বন্ধু ভবসিন্ধু যদি হবে পার।
রচিল জীবনদাস কৃষ্ণকথা সার॥
দ্বিজ দামোদর বলে শুন চন্দ্রমুখী।
নয়ান বয়ান কেন মলিন দেখি॥
হয়পৃষ্ঠে আরোহণ হইল ব্রাহ্মণ।
রচিল জীবন দ্বিজ ভারত কীর্ত্তন॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষ নাশ স্বর্গে গমন॥
এইখানে রহিল ভাই কৃষ্ণকথা বাণী।
পূর্ণ বদনে ভাই কর হরিধ্বনি॥

(শ্লোকসংখ্যা ৩২০০।)

৩৬। কৃষ্ণমঙ্গল। দ্বিজ মাধবদাস।

আরম্ভ—

পাঁচালিচ্ছন্দঃ সঙ্গীতং এতন্মাধবশর্ম্মণা।
আজৌ গণপতিং বন্দেবৈষ্ণবং বিঘ্ননাশনং।
লম্বোদরং কুঞ্জরাস্যং সুন্দরং গৌরীনন্দনং।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ ত্রিতিন লোচন।
মদজলগণ্ডযুক্ত চলহ শমন॥

*　　*　　*

ভাগবত সংকেত না বুঝে সর্ব্বজন।
লোক ভাষারূপ কহি সেই পরায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নাম মধুর সংগীত।
লাচাড়ি * * * প্রবন্ধে হৈব বিদিত॥
বিশেষ পাইল আমি চৈতন্য আদেশ।
সেই ভরসায় যার না জানি বিশেষ॥

শেষ—১ হইতে ৩১৩ পাত পর্য্যন্ত আছে, তৎপরে খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা ৮০০০।

৩৭। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—প্রথম পাত নাই।

তার পর আলা তথা ব্রহ্মাদি দেবতা।
কৃষ্ণেরে কহয়ে ক্রমে সন্তাষে প্রণত॥

শেষ—

ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

লিখিতং শ্রীনিমাইদাস চন্দ্র। সাং পাত্রসায়ের

বনভূমি তমালের বর্ণ সর্ব্বস্থানে।
শ্যাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে॥
যদি বল মনুষ্যের গমনাগমনে।
যেমনে চলিবে তার শুন বিবরণে॥
অন্ধকার অভিসারের বেশভূষা করি।
চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥
আনন্দ নিদেশ পাইয়া চলে দুই জন।
প্রতিকুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে দুই জন॥
অধ্বকুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে।
চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহারে॥
প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেইকালে।
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে॥
মেঘাবৃত চন্দ্র পুন রহে সেইখানে।
টীকার এই মত অর্থ করএ ব্যাখ্যানে॥

শেষ—
অতি দীন অতি হীন রসময় দাস।
শ্রীগীতগোবিন্দ তার করিলা প্রকাশ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ৭ই আষাঢ়। লিখিতং শ্রীপার্ব্বতী দাসী।

৪৩। গীতগোবিন্দ। (পদ্যানুবাদ।)

আরম্ভ—সংসারার্ণবতারণৈকতরীঃ ইত্যাদি।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

দেখ মেঘ আচ্ছাদিল সকল আকাশ।
তাথে হৈতে সূর্য্যের না হয় পরকাশ॥
বৃক্ষ সব তমালে করিল অন্ধকার।
দেখিতে না পায় অন্ত অন্যের আকার॥
অতএব মিলন করহ দুইজন।
কৃষ্ণের বিরহ তাপ করহ খণ্ডন॥
হেন আনন্দিত স্থান হইতে রসাবেশে।
অতি হরষিতে সোহে বন পরদেশে।
কিবা সে বনের শোভা কহনে না যায়।
কুসুমিত বন সবভ্রমে ভৃঙ্গ তায়॥
মন্দমন্দ সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে।
অতি সুখী সুমুখীগণ কেহো কেহো কহে॥
অত্যন্ত নির্জ্জন বন যমুনার কূলে।
জলচর বনচর ডাকে কুতূহলে॥
অতিপুলকিতচিত্ত হইয়া রাধা কানু।
পথে কুঞ্জ দ্রুম দেখি সঙ্কে হৃষ্টতনু॥
রহঃস্থলে কুতূহলে রাধিকার সনে।
নির্ভরে করে ক্রীড়া সেই কুঞ্জবনে॥
রাধিকা কৃষ্ণের শোভা না যায় বর্ণন।
তড়িতে জড়িত যেন নব ঘনে ঘন॥
রাধামাধবের রতিকেলি নানামত।
অতিশয় উৎকণ্ঠাতন্ম অবিরত॥

শেষ—শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামদেব্যাত্মজশ্রীজয়দেবস্য পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু।

হেন জয় দেব কাব্যরচনা সংস্কৃতে।
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংকৃত প্রাকৃতে॥
এই দোষ ক্ষেমিবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা হেতু আমার রচন॥
সমাপ্ত করিল গজ ইষুরসসোমে। (১৬৫৮)
কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥
পটের তৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার।
সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বাধার॥
ইন্দ্রের বাহনপরে দময়ন্তীপতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিলা বসতি॥

৪৪। গুরুদক্ষিণা। স্বরূপরাম।

আরম্ভ—
শুন শুন কৃষ্ণ কথা ভাই দুই বন্ধুজনা।
আরাধনে শুন সভে গুরুর দক্ষিণা॥

শেষ—
কবি স্বরূপরামে বলে শুন জ্ঞানগণ।
গুরুর চরণ সেবা কর সর্ব্বক্ষণ॥

ইতি গুরু দক্ষিণা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মা সাং কুণ্ডপুর সন ১২০২ তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ। বেলা এক প্রহরে সমাপ্ত।

৪৫। গুরুশিষ্য সংবাদ—

আরম্ভ—বন্দেহহং শ্রীগুরুমিত্যাদি। অজ্ঞানমিত্যাদি।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সদারহে স্থিতি।
বৃন্দাবন পরিত্যেজ্য নাহিহ শকতি॥
শিষ্য বলে কেবা তবে মথুরাকে গেলা।
কুবজায় মালাপরি কংসধ্বংস কৈলা॥

শেষ—

সেবা হাতে লও তবে সখি সঙ্গে যাবে।
নিত্যস্থানে রাধাকৃষ্ণ দরশন পাবে॥

ইতি গুরু শিষ্যের কথা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২৬ ভাদ্র রোজ লক্ষীবার তিথি পঞ্চমী লিখিতং শ্রীপীতাম্বর দাস সাং পাকনাড়ের। (শ্লোক-সংখ্যা ২৫৭২)। ইহার আর একখানি ১০৯০ সনের অতি জীর্ণ পুথি আছে।)

৪৬। গেড়ুচুরী। কবিচন্দ্র কৃত।

আরম্ভ—

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্বকথন।
কহ কহ কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ॥
শুকদেব বচনে রাজা পরিক্ষীৎ বলে।
কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥

শেষ—

যশোদা বিদায় জটিলার পাশে হৈল।
এমন কৃষ্ণের লীলা জটিলা ভুলিল॥
ভবিষ্য পুরাণ কথা কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

গেড়ুচুরী পুস্তক সমাপ্ত হৈল বেলা আন্দাজ এক প্রহর সময় সন ১২৮০ সাল ৯ ফাল্গুন পাঠনার্থে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কর সাং বীরসিংহা ডাকঘাড়ী পীঁড়াতে রোজ সোমবার। (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

৪৭। গোপীভক্তি রস বা কৃষ্ণলীলা। অচ্যুত দাস।

আরম্ভ—প্রথম তিনপাত নাই। তৎপর ৪র্থ পাত হইতে

* * *

———— চক্ষুর গোচরে।
এখনে দেখিবি যদি আর মোরপুরে॥
পশ্চাৎ কহিবি মোরে মিথ্যা কহিস তোরা।
দেখিঞা দমন কর শাস্ত হউ মোরা॥

ভণিতা—

মজিয়া অচ্যুতদাস সেই রাঙ্গাপায়।
গোপীভক্তিরস-গীত আনন্দেতে গায়॥

শেষ—১৫২ পাতের পর খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা ২১০০। পুথির আকার দেখিলে প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

৪৮। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা। বাসুদেব ঘোষ প্রণীত।

আরম্ভ—

রাগ করুণাশ্রী।
জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥

ভণিতা—

"বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।"
"বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুটি কর।"

ইত্যাদি।

মন্তব্য—পুঁথিখানির লেখা পরিষ্কার। কবিত্ব অতি সুন্দর। এই গ্রন্থে গৌরাঙ্গের বাল্যজীবনী পদাবলী আকারে লিখিত। প্রত্যেক কবিতা পদাবলীসুলভ রাগ-রাগিণী সংযুক্ত। যে পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৬৬টি পদ সম্পূর্ণ আছে।

৪৯। গোলক বস্তু বর্ণন। শ্রীগোপালভট্ট।

আরম্ভ—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে হই বড় কথানয়।
মূক শ্রুতি হয় নিত্যানন্দের কৃপায়॥

শেষ—

অতএব নীলাচলে বসে গৌরহরি।
আস্বাদিল নিজবাঞ্ছা মনের মাধুরী॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিরচিতং শ্রীগোলোকবর্ণনং চৈতন্যনিত্যানন্দজাহ্নবীতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ। (শ্লোকসংখ্যা ১০০।)

৫০। গোবিন্দ রতিমঞ্জরী। ঘনশ্যাম দাস।

আরম্ভ—স প্রেমানিহ দিব্য গন্ধগণবৃন্দামধৈত নাম প্রভুঃ নিত্যানন্দরসপ্রবন্ধু করুণশ্যামান্তঃপ্রকাশকঃ।

* * *

কামোদরাগ।

কো কহ অপরূপ প্রেম সুধানিধি
কো কহত রস মেহ।
কোই কহত ইহ মোই কলতরু
মঝু মনে হোত সন্দেহ॥

শেষ—

হাম পুন কি কহি কাহা আছয়ে
অনুভবি ওর না পাই।
কহ ঘনশ্যাম দাস জগ মাহুব
মোহন মোহিনি রাই॥

গোবিন্দ শরণং।

গোবিন্দঃ শরণং মমাস্তু হৃপদেগোবিন্দমীড়ে মুদা
গোবিন্দেন বিধাস্যতে হিতমতস্তস্মৈ সদেহং মনঃ।
গোবিন্দাৎ পরমোনবন্ধুরতিতস্তস্যৈব হেতো রতী
গোবিন্দে হখিলকারকত্বমিতি চেৎ গোবিন্দকার্যক্রিয়া॥

ইতি গোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং শ্রীঘনশ্যামদাসকৃতে গোবিন্দরত্যামোদনাম পঞ্চমঃ স্তবকঃ। সমাপ্তাচেয়ং গোবিন্দরতিমঞ্জরী॥

৫১। গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন দাস।

আরম্ভ—

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতম্॥

* * *

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপ করিয়া।
লেখিমাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥

* * *

না জানি শ্লোকার্থগণ, যৈছে তৈছে সংঘটন,
কৃবি গুরু বৈষ্ণব বলিয়া।
গোবিন্দ লীলামৃতসার, ভক্তে বুঝে অর্থ তার,
না বুঝে পণ্ডিত হৈঞা॥

ভণিতা—

(১) গায় যদু নন্দন হরিষে॥
(২) নিজ দোষ নিবেদয় যদুনাথ দাস॥
(৩) গোবিন্দ-চরিতামৃত যদুনন্দন দাসে॥

শেষ—

শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরে, হৈলা গ্রন্থ সুবিস্তারে,
গোবিন্দ লীলামৃত কাব্যসার।
ত্রয়োবিংশতিসর্গে, সম্পূর্ণ হইল পর্ব্বে,
বিস্তারিতে অনন্ত অপার॥
শ্রীচৈতন্যদাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস,
আচার্য্য আনিল হৈয় লতা।
তাঁর পাদপদ্মে আশ, এ যদুনন্দন দাস,
অষ্ট প্রাকৃতে কহে কথা॥

* * *

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে॥
শ্রীগোবিন্দার্পিতমস্তু চরিতামৃত।
মদীশ্বররূপেণ কৃষ্ণদাস কবিনৃপ-
স্যৈব নব সনাথ স্তবেন মম সঙ্গতিঃ॥
হে কৃষ্ণ কবিরাজাগ্য রাধাকৃষ্ণবিরূপিণে
নিবেদয় দুঃখী জীবে করুণামচরণাঙ্কিকম্॥

ইতি ত্রয়োবিংশতিসর্গ গ্রন্থ সমাপ্ত। তারিখ পৌষে ২৩ সন ১০৭২ সাল।

মন্তব্য—পুথি খানি খণ্ডিত, মধ্যে কয়েক পাত নাই। (শ্লোকসংখ্যা ৩৫০০।)

৫২। গোবিন্দ-বিজয়। অভিরাম দাস।

আরম্ভ—

প্রণমহ গণ রায় হরের নন্দন।
একদন্ত গজবক্ত্র মূষিক বাহন॥

* * *

বন্দিব গৌরাঙ্গ গুরু জগো জিনি বিদ্যাধরী।
বিধুমুখি খঞ্জন নয়ানি।

ভণিতা—

গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ পানে।
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ মকরন্দ পানে।
অবোধ জনম অভিরাম দাস গানে॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ পানে।
গোবিন্দ বিজয় অভিরাম দাস ভণে॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ অভিরাম গায়।
গোবিন্দ বিজয় গীত এতদূরে সায়॥

শকাব্দা ১৬৭৩। সন ১১৫৮ সাল। এই গ্রন্থের ৪ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

৫৩। গৌরগণাখ্যান। দেবনাথ।

আরম্ভ—জয়তি জয়তি দেব শ্রীযুগ ইত্যাদি।

বন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু রসময় তনু,
সর্ব্বঅবতার শিরোমণি॥
দীন জনে কর দয়া ও পাদপদ্ম দিয়া
মোরে নেহ দাস করি কিনি॥

শেষ—

শ্রীমুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
ইহা সভার পাদপদ্ম মোর নিজধন॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম করি নিতি ধ্যান।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ গৌরগণাখ্যান॥
শ্রীনরহরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
দেবনাথ দাস কহে গৌরগণাখ্যান॥

ইতি শ্রীগৌরগণাখ্যানে সপ্তদোদ্দেশ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। যাকের শ্রীচৈতন্যচরিতাভিধেয়স্ত পাত্রসায়ের। শ্লোকসংখ্যা ৩২০।

৫৪। চাটু পুষ্পাঞ্জলি। রূপগোস্বামী।

আরম্ভ—

নবগোরোচনাগৌরী প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবকবিদ্যোতি বেণীব্যালকুলাফণাং॥

* * *

জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম
জিনি শোভা শ্রীমুখমণ্ডল

শেষ—যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ঐকান্তিকসুতাময়িতিঃ।
সুবক্তাস্তুত্যা তাসাং কৃপায় কুর্ব্বীত নিশ্চয়ং।

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্রং সম্পূর্ণং। ইতি।

৫৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুকদেবে তারপর মহারাজা কয়।
মোর মনে সন্দেহ হইল মহাশয়॥

ভণিতা—

(১) ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান॥
(২) অষ্টম স্কন্ধের কথা চৌদ্দ অধ্যায়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

শেষ—

চিত্রকেতু উপাখ্যান কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

এই পুস্তক শ্রীনিমাইচন্দ্রের। সাকিন পাত্রসায়ের। (শ্লোকসংখ্যা ২৫০।)

৫৬। চৈতন্যপ্রেম বিলাস। লোচনদাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই, ২য় পাত হইতে আছে)

চরণমাধুরী দুই অপ্রবন কহি।
যাহাতে গমন করে নেত্রপদ্ম দুই॥

শেষ—

নরহরি পাদপদ্ম হৃদে করি আশা।
অতএই ইহা বিনু নাহিক ভরসা॥
চৈতন্যপ্রেমবিবর্ত্তবিলাস এই হও।
ইহা বিনু অন্ত কিছু মনে সব নও॥
শ্রীচৈতন্যপ্রেমবিলাস শুনে যেই জন।
অনায়াসে পাও সে চৈতন্য চরণ॥
ভক্তপাদপদ্ম হৃদয়ে করি আশ।
চৈতন্যপ্রেমবিলাস কহে এ লোচন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-প্রেমবিলাস সমাপ্ত। সন ১২১৯ সাল ৩রা ফাল্গুন। লিখিতং শ্রীমধুরদাস বৈরাগী। সাং মুণ্ড কাটা। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০।)

৫৭। চৈতন্যমঙ্গল। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই) ২য় পাত হইতে
গদাধর প্রাণনাথ॥

শ্রীপণ্ডিত গোসাঞি বন্দো বন্দ নিরন্তর।
যার প্রেমে পূর্ণ হৈল জঙ্গম স্থাবর॥

শেষ—

চিন্তিঞা চৈতন্য গদাধরপদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল নবখণ্ড সমাপ্ত।

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। শ্রীধর্ম্মদাস আচার্য্যকস্য লিখনমিতি। শকাব্দা ১৬০১। মাহ চৈত্র বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী দিবসে তৃতীয় প্রহরে শ্রীযাদবদাসের পুস্তক সাঙ্গ হৈল॥৹॥ ইতি ২সন৯ম তেরিখ ১৯ চৈত্র॥

(এই পুথিখানির বিবরণ পরিষৎপত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পর কবি জয়ানন্দের রচিত আরও কএকখানি প্রাচীন পুথি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দিতেছি) ঃ—

৫৮। চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশখণ্ড। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—

আনন্দে প্রকাশখণ্ড শুন সাবধানে।
ক্ষেত্রের মাহিত্র গোসাঞি কহেন যথাক্রমে॥
একদিন নীলাচলে চৈতন্য গোসাঞি।
দেখিবারে গেলা তারে শীঘ্র কানাঞি॥

শেষ—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধরপদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে প্রকাশখণ্ড গায় জয়ানন্দ॥
এই অবধি সে প্রকাশখণ্ড সাঙ্গ।
তীর্থযাত্রা করিলেন ঠাকুর গৌরাঙ্গ॥
ইতি প্রকাশখণ্ড সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীগৌরচরণ শর্ম্মা, সাং পাত্রসাএর। সন ১১০৯ সাল। ২৫ মাঘ। রোজ শনিবার।

৫৯। চৈতন্যমঙ্গল বৈরাগ্যখণ্ড। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—

একদিন গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে নাচে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥

শেষ—

আগম নিগম বেদ পুরাণের সার।
বৈরাগ্যখণ্ড শুনিলে জীবের নিস্তার॥
জয়ানন্দে আশীর্ব্বাদ করহ হরিষে।
চৈতন্যমঙ্গল যেন গায় দেশে দেশে॥
ইতি বৈরাগ্যখণ্ড সমাপ্ত॥

লিখিতং শ্রীরামচরণ কস্য। সাং বীরসিংহা। সন ১১৬৫ সাল। ৩ অগ্রহায়ণ। বেলা তিনদণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল॥

(ইহার একখণ্ড কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে।)

এ ছাড়া জয়ানন্দরচিত ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্রের পুথি পাওয়া গিয়াছে। (৮৯ ও ১০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ দেখ।)

৬০। চৈতন্যমঙ্গল (মধ্যখণ্ড)। লোচনদাস।

আরম্ভ—

আর একদিনে সেই কেশব ভারতী।
আইলা সন্ন্যাসীবর অতি শুদ্ধ মতি॥

শেষ—

চৈতন্যচরিত্র কথা চৈতন্যপ্রকাশ।
মধ্যখণ্ড সাঙ্গ কহে এ লোচনদাস॥
ইতি শ্রীমধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

দস্তখত শ্রীকাশিরাম শর্ম্মা পুস্তকমিদং শ্রীবৈকুণ্ঠরাম দেবশর্ম্মা সন ১০৪৭ সাল তারিখ ৪ বৈশাখ রোজ শনিবার।

(আরও তিন সেট চৈতন্যমঙ্গলের পুথি আছে, কিন্তু সে কয়খানি অধিক প্রাচীন নহে। উক্ত পুথিখানি অতি প্রাচীন বলিয়াই উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছি। ১১০৬ সনের পুথির শেষে লোচনদাসের এইরূপ পরিচয় আছে—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামনিবাস।
মাতা সতী সুরপতি অরুন্ধতী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে গাই গোরা গুণগাথা॥

সংসারে জন্ম দিল এই মাতা পিতা।
মাতামহকুলের মোর শুন কিছু কথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহ হয় মোর পরমানন্দগুপ্ত।
নানা তীর্থপূত তিঁহো তপস্যাতে তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক পুত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথা যাই দুলাল্য করে মোরে।
দুলাল লাগিয়া কেহো পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাহার চরণে মুই কর্ঁয়ো নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্র লেখা কৃপায় তাহার॥
বড় কৃপা করিলেন শুন তাঁর কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
তাহার কৃপাতে যেবা করিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥

৬১। জগন্নাথমঙ্গল। দ্বিজ মুকুন্দ।

আরম্ভ—

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে ইত্যাদি।
* * *
অতসীকুসুমনিন্দি শরীরের আভা।
ইন্দীবর নিন্দি দুই লোচনের শোভা॥

শেষ—

বৈকুণ্ঠের পদরেণু বন্দিয়া মাথায়।
জগন্নাথ-মঙ্গল মুকুন্দ দ্বিজ গায়॥

উৎকলখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে শ্রীজগন্নাথ লীলা সমাপ্ত। তারিখ ৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার; শকাব্দা ১৭৩৪। শ্রীরামধনমিত্র বাবাজীউ। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০।)

৬২। জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব) দ্বিজ অভিরাম।

আরম্ভ—

করপুটে বন্দি গুরুদেবের চরণ।
অজ্ঞান তিমিরাক্ষে দিল জ্ঞানাঞ্জন॥
* * *
চৌদিকে বেড়িয়া ভক্ত করে হরিধ্বনি।
নাচে গৌরচাঁদ অবতার-শিরোমণি॥
ক্ষণেক মুদিত আঁখি ক্ষণেক প্রকাশ।
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে ক্ষণে মন্দ হাস॥
ভাবের আবেশে গোরা আপন না জানে।
অবনী পবিত্র কইল নিজ নাম গুণে॥
* * *
কুরুগণ নিধন করিয়া যদুরায়।
পঞ্চ পাণ্ডব সঙ্গে আসি হস্তিনায়॥
অভিষেক কৈল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরে।
* * *
সবিশেষ উপদেশ শুন মহাভাগ।
ত্বরিত হইয়া কর অশ্বমেধ যাগ॥

শেষ—

জৈমিনি-ভারত-পোথা পীযূষের সার।
কৃপাতে যে ফল সখি চিত্তে যে যাহার॥
সর্ব্বতীর্থ করি ভ্রমে অবনীমণ্ডল।
গোকাঞ্চন কোটি কন্যাদানে সেই ফল॥
ততোধিক ফল পায় শুনিলে এ কথা।
রোগ শোক দুখ তাপ হরয়ে সর্ব্বথা॥
যেবা গায় গাওয়ায় এই কৃষ্ণ বল।
পায় সে অচলা ভক্তি ধন ধর্ম্ম যশ॥
দ্বিজ অভিরাম কহে করি পরিহার।
এ ভব সংসারে পার কর এই বার॥
একান্তে চিন্তিয়া সদা কৃষ্ণের চরণ।
মুখ ভরি বল হরি যত বন্ধুজন॥

ইতি জৈমিনিভারত সংপূর্ণ। সন ১২৫৮ সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র বুধবার॥ (শ্লোকসংখ্যা ৫০০০।)

৬৩। জৈমিনি-ভারত। মিশ্র অনন্ত।

আরম্ভ—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি * * *
প্রণমহ নারায়ণ চরণ যুগল।
ত্রিজগত নাথ প্রভু সৃষ্টি অনুবল॥
* * *
পুণ্য শ্লোক উপাখ্যান ভক্তিভাবে মানি।
পুনর্জন্ম নহে যদি শুদ্ধ হেন জানী॥

আশ্চর্য্য শ্রবণহেতু মোক্ষনিদান।
সর্ব্বলোক শুনে যেন পায় পরিত্রাণ॥
তে কারণে শ্লোক অর্থ পাথায় রচন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শুনিলে কথন।
বাপ কৃষ্ণানন্দ বসু * মাতা সংজ্ঞাজননী।
কৃষ্ণপরায়ণ চিত্তে রচিয়া বাখানি॥
দুইলোক শুদ্ধ হয় শুনিলে কথন।
মিশ্র অনন্তে কহে কৃষ্ণের বচন॥

শেষ—

দুই লোক শুদ্ধ হয় শুনিলে কথনে।
মিশ্র অনন্ত কহে ভারত বচন॥

ইতি জৈমিনিভারত পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬২১। ২১ ভাদ্র বুধবার লিখিতং শ্রীরাঘবেন্দ্র দেব মোকাম বিষ্ণুপুরা পরগণে গঙ্গারামপুর। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৮০০)।

৬৪। তরণীবধ পালা। কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—

রাম রাম প্রভু রাম কমল-নয়ন।
সীতার প্রাণনাথ রাম রাজীব-লোচন॥

শেষ—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বচন।
যে জন প্রচার কৈল গীত রামায়ণ॥

ইতি তরণীবধ পালা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ বিশ্বা সাং ঘোড়নালকী। পটিনার্ষ শ্রীমহাদেব চক্র সাং চক রায়। সন ১০৮৩ সাল। তাং ২৮ অগ্রহায়ণ রোজ শুক্রবার। (শ্লোক সংখ্যা ৭৫০।)

৬৫। তত্ত্বকথা। যদুনাথ দাস।

আরম্ভ—

কর জোড়ে বন্দো বৈষ্ণব চরণ।
শ্রীগুরুচরণ বন্দ এক করি মন॥
শ্রীচৈতন্য বন্দ আনন্দিত মন।
যাহার প্রসাদে আপনে পাইল চেতন॥
শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
আনন্দে ভজ হরি কৃষ্ণের চরণ॥

ভণিতা—

যদুনাথ দাস কহে হরি বল মুখে।
তরিবে শমন-দায় বৈকুণ্ঠ যাবে সুখে॥

শেষ—(৮ পাতের পর খণ্ডিত। আদ্যাংশের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০৫।)

৬৬। তরণীবধ। দ্বিজ দয়ারাম।

আরম্ভ—

লঙ্কাপুরে রাজপাট বসিয়াছে রাবণ।
বীরবাহুর মরণ শুনিল ততক্ষণ॥

শেষ—

দ্বিজ দয়ারাম কন লোকে অতি পাপ।
পূর্ণপাপ হৈলে জীবের সন্তাপ॥
শ্রীদেবীচরণ বলে দ্বিজ পদে লিপ্ত।
তরণির বধপালা হৈল সমাপ্ত॥

ইতি তরণীবধ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা সাং গোপালপুর। সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

৬৭। তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ অনাদ্য নিধন।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয় যাহার কারণ॥

ভণিতা—

কংসারি পণ্ডিতের পুত্র দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে শুনিলেন তুলসীর মাহাত্ম্য॥

শেষ—

তুলসীর মহিমা কত কে কহিতে জানে।
দ্বিজ ভগীরথে কহে কৃষ্ণের চরণে॥

ইতি তুলসীর মাহাত্ম্য সমাপ্ত। সন ১২৫৩ সাল। ২৭ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোক সংখ্যা ১৮০।)

৬৮। ত্রিগুণাত্মিকা।

আরম্ভ—চর্ম্ম মাংস রেতঃ অস্থি মজ্জা মতি এই ছয় ধাতুত। ইহার কোন ধাতুতে কোন্ বস্তু হয়? চর্ম্ম মাংস রেতঃ এই তিন ধাতুতে মাতারূপস্থ হয়।

শেষ—আপনি সাধক সাধ্য সখী সাধন। ...

* ১২১ সংখ্যক নাম দেখ।

প্রবর্ত্ত দেহ ভজন দেহ প্রবর্ত্ত দেহ গুরুর আশ্রয় সেব্য সেবক সম্বন্ধ ভজ ভক্ত সম্বন্ধ সখী সম্বন্ধ এই ত্রিগুণাত্মিকা সমাপ্ত। সন ১১১২।

৬৯। দণ্ডাত্মিকা। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—দণ্ডাত্মিকা লিখ্যতে॥

প্রাতঃকালে উঠিয়া রাধা ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনক্রিয়া সারিলা আপনি॥
তবে রাই প্রাতঃস্নান কৈলা আচমন।
পুরি মিঠাই কিঞ্চিৎ করিলা ভক্ষণ॥

শেষ—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনথরাদাস বৈরাগী সাং মুড়াকাটা পাঠক শ্রীকেনারাম সেন সাং নিউগ্রাম।

৭০। দণ্ডীপর্ব্ব। কবি মহীন্দ্র।

আরম্ভ—

একাদশ স্কন্ধে পুরাণে শ্রীভাগবতে।
শুকদেব কহে শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥
দণ্ডী নৃপতির কথা সংক্ষেপে শুনিল।
বিস্তারিয়া কহ রণ কিরূপে হইল॥

শেষ—

পরীক্ষিৎ শুনে কথা শুক মুনি বৈল।
দণ্ডীরাজার কথা এত দূরে সাঙ্গ হৈল॥
একাদশ স্কন্ধে শ্রীভাগবত-তত্ত্ব।
শ্লোকশ্রীতে করিল ব্যাসের কবিত্ব॥
সেই শ্লোক এই রচিয়া পয়ার।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে লোক বুঝিবার॥
ভাগবত-পুণ্য-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুক মুনি কহে কথা পরীক্ষিৎ শুনে।
কহেন মহীন্দ্র কবি এই সমাধানে॥

ইতি সন ১২৫৮ সাল তা ২৫ কার্ত্তিক। লিখিতং শ্রীনন্দলাল। (শ্লোক সংখ্যা ১৫০০।)

৭১। দর্পণচন্দ্রিকা। নরসিংহদাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

* * *

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শেষ—

শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সদা যার আশ।
দর্পণচন্দ্রিকা কহে নরসিংহ দাস॥

ইতি শ্রীমদ্দর্পণচন্দ্রিকা সমাপ্ত। সন ১২৬৭ সাল তারিখ ১১ পৌষ বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০। এই গ্রন্থের আরও দুই খানি পুথি আছে।)

৭২। দশমপুরাণ। কবিচন্দ্র।

(প্রথম তিন পাতা নাই চতুর্থ পাত হইতে)

আরম্ভ—

বসুদেব দৈবকী করিল সম্প্রদানে॥
ইহার কারণে মুঞি আসি আছি হেথা।
দাঁড়াইয়া কহ পুন আপনার কথা॥

শেষ—

সর্ব্বলোক শুন সভে কর অবধান।
কৃষ্ণের রহস্য শুন দশম পুরাণ॥

ইহার বাকী পুস্তক আছে। লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত। সাং পাড়লাগ্রাম, পুস্তক শ্রীমোহনপোদ্দারের, সাং নিজ গ্রাম, সন ১২১৬, তারিখ ২৮ আশ্বিন, রোজ মঙ্গলবার মোকাম নাটমন্দির। (প্রাপ্তাংশের শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ৫৫০।)

৭৩। দাতাকর্ণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—অথ দাতাকর্ণের পালা লিখ্যতে॥

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারত রাজা শুনে জন্মেজয়॥
একদিন বাসুদেব ভাবিত অন্তরে।
কর্ণ সে কেমন দাতা বুঝিব তাহারে॥

ভণিতা—

সেই মুণ্ড লয়ে পুনঃ রাজহ অম্বল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দ মঙ্গল॥

শেষ—

কর্ণ পদ্মাবতী দোঁহে হইল বিদায়।
এতদূরে দাতাকর্ণের পালা হৈল সায়॥ * ॥

ইতি দাতাকর্ণের পালা সমাপ্ত। পুস্তকমিদং শ্রীপাঁচু সেঁন। সন ১০৭৫ সাল তিতারিখ ৫ পৌষ রোজ শনিবার। লিখিতং শ্রীগোবিন্দ রাম সরকার সাং চাকদহ। (২০০ শ্লোক। ১০৭২ সনের লিখিত আর একখানি দাতাকর্ণ আছে।)

৭৪। দাসগোস্বামীর সূচক। রাধাবল্লভ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য আদি পদ,
মল প্রায় সকল তেজিল॥

শেষ—

সেই রঘুনাথ দাস, পুরাও মনের আশ,
সেই মোর আছে বড় সাধ।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস, মনে কৃপা অভিলাষ,
সভে মেলি করহ প্রসাদ॥

ইতি দাসগোস্বামীর সূচক সংপূর্ণ। তারিখ ১৬ ভাদ্র ১২৫৬ সাল। (শ্লোক ২০।)

৭৫। দিবারাশ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

এক দিন শ্রীঘরে নিশায় যদুপতি।
পালঙ্কে শুতিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণী সংহতি।
আবেশে অবশ রস হৈল কলেবর।
করিলা ব্রজলীলা কৌতুক বিস্তর॥

শেষ—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পুরাণে প্রকাশ।
এতদূরে সমাপ্ত হইল দিবারাশ॥

ইতি শ্রীশ্রীদিবারাস নামক গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবিপ্রপ্রসাদ রায় সাকিম ডোঙ্গাজল পাঠক শ্রীনফর শর্ম্মাণী সাং বীরসিংহ সন ১২৪৯ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৮৫।)

৭৬। দীপকোজ্জ্বল। বংশীদাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই।)

ভনিতা—

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সদা যার আশ।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশীদাস॥

শেষ—(১৯ পাতের শেষে)

সবদেহ বিনু নহে রস আস্বাদন।
ঈশ্বর দেহেতে নহে রসের করণ॥ (খণ্ডিত)

৭৭। দুই দশার আখ্যান।

আরম্ভ—আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ

*　　*　　*

আদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঁইর চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥

শেষ—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে করিল দুই দশার আখ্যান॥

ইতি সন ১২৬৭ সাল পৌষ।

৭৮। দুর্লভসার। লোচনদাস।

আরম্ভ—

এক নিবেদন করি শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরা শুনে মূর্খ জন॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠয়ে তাই বলি না উঠয়ে ডর॥

শেষ—

আমার বচন তুমি করিহ বিশ্বাস।
আনন্দহৃদয় কহয় এ লোচনদাস॥

*　　*　　*

ইতি লোচনানন্দ বিরচিত শ্রীশ্রীদুর্লভসারসংগ্রহং সম্পূর্ণং। ইতি সন ১০৮২ সাল তাং ২৩ ফাল্গুন। (শ্লোক সংখ্যা ৯৫০। এই গ্রন্থের আরও তিনখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।)

৭৯। দেহভেদতত্ত্ব নিরূপণ।

আরম্ভ—

পঁচিশ প্রকৃতি ২৫ পঞ্চ আত্মা ৫ তার বিবরণ। এই পাঁচ পাঁচে পঁচিশ প্রকৃতি। পঞ্চ মন ছয় রিপু দশ ইন্দ্রিয় ১০।

পাঁচ অঙ্গের নিরূপণ কহি বিবরিয়া।
পাঁচ পাঁচে পঁচিশ সভার শুন মন দিয়া।

শেষ—

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই নেত্র হয়।
সজল নয়নে যারে ভাবে প্রেমে আস্বাদয়॥
ইতি দেহভেদতত্ত্বনিরূপণং সম্পূর্ণং।

৮০। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারত শুনে রাজা জন্মেজয়॥
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিলা সভায়॥

শেষ—

পরকতি পরনিন্দা করে যেই জন।
মরিলে না মুক্ত হয় নরকে গমন॥
এত শুন্যা জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ-মঙ্গল॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত সাং পাজনাগর রঘুনাথপুর। পুস্তক শ্রীবংশী-বদন দত্ত সাং দিজগ্রাম সন ১২০৯ সাল তাং ১৫ আশ্বিন রোজ শুক্রবার বেলা ২ দণ্ডের সময় সমাপ্ত করিলাম। যো নাটমন্দির।

৮১। দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন বলে শুনে জন্মেজয়।
তবে কতকদিন বই যুতরাষ্ট্র মহাশয়॥

ভণিতা—

আদি পর্ব্বে ভারত কথা, ব্যাসের বর্ণনা গাথা,
কবিচন্দ্র করিল প্রকাশ॥

শেষ—

বিপ্র বস্তু অর্জ্জুনেরে বেড়্যা লয়্যা যায়।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর এতদূরে সায়॥
(শ্লোক সংখ্যা ১৬০।)

৮২। দ্বাদশপাট-নির্ণয়। নীলাচলদাস।

আরম্ভ—

দয়ালুঃ শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদীনবন্ধু মঃ...।
জাহি মাং করুণাদৃষ্টৈঃ অতিদীন দয়ানিধেঃ॥
খানাকুল কৃষ্ণনগর ঠাকুর অভিরামের পাট।
এমন পাট কোথাও নাই জগতে বিখ্যাত॥

শেষ—

শ্রীরূপসনাতন পাদপদ্ম করি আশ।
কিছু না জানি বর্ণন করে নীলাচলদাস॥

* ॥ * ॥ * দ্বাদশপাটের নির্ণয়॥ আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল কৃষ্ণনগর।১। অম্বিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।২। আকনা মাহেশ পণ্ডিত ঠাকুর।৩। ঠাকুর কৃপারানন্দ হলদা মহেশপুর।৪। উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রাম।৫। কাল্যা কৃষ্ণদাস আকাই হাটের।৬। এই ছয় পাট॥ নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর।১। কমলাকর পিপলাই।২। ধনঞ্জয় পণ্ডিত।৩। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর।৪। মুকুন্দদাস ঠাকুর।৫। কাশীশ্বরদাস ঠাকুর।৬। জোড়াসে মাধীদাস ঠাকুর।৬। নবদ্বীপে ছয় পাট॥৬॥ উপসংহার গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রদ্বীপ॥১॥ তমলুকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর।২॥ মাধবঘোষ ঠাকুর গৌরাঙ্গপুর।৩॥
(শ্লোক সংখ্যা ২১০।)

৮৩। দ্বারকা-বিলাস। দ্বিজ জয়নারায়ণ।

আরম্ভ—অথ দ্বারকাবিলাস লিখ্যতে॥ শ্রীশ্রীগণেশায়।

খর্ব্বস্থূল লম্বোদর গজেন্দ্রবদন।
স্বাহি পূর্ণব্রহ্ম কর বিঘ্ন বিনাশন॥
* * *
বৈশম্পায়ন প্রতি বলে জন্মেজয়।
শুনাকে ভারতামৃত জুড়াক হৃদয়॥

ভণিতা—

(১) পয়ার প্রবন্ধে জয়নারায়ণে কয়।
(২) দ্বিজবর প্রকাশিল দ্বারকাবিলাস।
(৩) রাধাকৃষ্ণদাস ভাবে দ্বারকাবিলাস।
(৪) দ্বারকাবিলাস রচে জয়নারায়ণ॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গযাত্রা করিয়া শ্রবণ।
স্বর্গ যান যুধিষ্ঠির তেজি সিংহাসন॥
(খণ্ডিত)　*　*　*
হরি হরি বল সভে পালা হল সায়॥

ইতি লিখিতং শ্রীরাজীবলোচন গো * * * সাকীম নবজীবনপুর সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৩ বৈশাখ। (শ্লোক সংখ্যা ২০০০।)

৮৪। ধর্ম্ম-মঙ্গল। দ্বিজ রূপরাম।

(বাঘ জন্ম ও আখড়ার পালা।)

বাঘবধ পালার আরম্ভ—নাই। (খণ্ডিত কেবল ৪ পাত পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য—

কায়স্থ সজ্জন ধীর মহাজন আর।
অকালে ভাঙ্গিল গোরাচাঁদের বাজার॥
*　*　*
কুসমেট্যা তেঁতুল্যা বাগদী স্বাদি খুল্যা।
সভারে খাইল বাঘ চাঁপাকলা বল্যা॥

ভণিতা—

(২) অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥
(২) ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥

শেষ—

ফুরাল বাঘের কথা বলিল কর্পূর।
বসিতে লাগিল কিছু ময়নার ঠাকুর॥
এখানে রহিল গীত সভে বল হরি।
রথ চড়ে ধর্ম্মঠাকুর গেল স্বর্গপুরি॥
দ্বিজ রূপরাম গান অনাদ্যের পায়।
আসর সহিত ধর্ম্ম হবে বরদায়॥

ইতি বাঘ জন্ম সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকালীচরণ শর্ম্মা সাং বোড়কি।

আখড়ার পালার আরম্ভ—

আখড়ায় পালা লিখ্যতে।
লাউসেন কর্পূর হইল এগার বৎসর।
গুরুর মন্দিরে পাঠ পড়ে নিরন্তর॥

শেষ—

হরগৌরী দুজনে বসিলা একাসনে।
ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম ভণে॥
ইতি পালা সমাপ্ত।

মন্তব্য—কেবল এই পালাটীর শ্লোকসংখ্যা ২০০।

৮৫। ধ্রুবচরিত্র। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—(প্রথম পাত নাই।)

শেষ—

সফল কামনা ধ্রুব ভক্তি স্রোতে ভাসে।
জয়ানন্দ বলে ধ্রুব পরমানন্দে ভাসে॥
গৌরাঙ্গ মোর আরে প্রাণবে॥

ইতি ধ্রুবচরিত্র সম্পূর্ণ। সন ১২০৩ সাল তাং ১২ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫১২।)

৮৬। ধ্রুবচরিত্র। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—ধ্রুবচরিত্র লিখ্যতে॥

শুক কহে পরীক্ষিৎ কহি তোরে শুন।
স্বয়ম্ভু মনুর বংশ মন দিয়া শুন॥

শেষ—

ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এত দূরে ধ্রুবের চরিত্র হইল সায়॥

ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২০ আশ্বিন। লেখক শ্রীধনঞ্জয় চৌধুরী। (শ্লোকসংখ্যা ২১১।)

৮৭। নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—নন্দবিদায়ের পালা লিখ্যতে॥

চিকণকালা চিকণকালা।
কালার গলে দুলিছে বনমালা॥
কৃষ্ণ কংসাসুরের করিল সৎকার।
কুলোচিত কার্য্য ক্রিয়া করাইল গঙ্গার॥

শেষ—

দশমস্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে নন্দের বিদায় হইল সায়॥

স্বাক্ষর শ্রীরামেশ্বর দাস আইচ সাং রামচন্দ্রপুর পরগণে সবরসাহী চাকলে বর্দ্ধমান সন ১২১৬ সাল তারিখ ২৮শে মাঘ রোজ মঙ্গলবার। এই পুস্তক

আদর্শ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম সরকার সাং কেশবপুর। (শ্লোকসংখ্যা ১৪১) আর একখানি প্রাচীন পুথির শেষে—

এই মত সকলে রহিল ব্রজপুরে।
বসুদেব নানা কাব্য নানা রস করে॥
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়॥

সন ১১৬৫ সাল। পাঠার্থে শ্রীবৃন্দাবন জৈন সাং বীরসিংহপুর। তারিখ ১৯ জ্যৈষ্ঠ।

৮৮। নবদ্বীপপরিক্রমা।

আরম্ভ—

শ্রীগৌরগোবিন্দদেববিলাসস্থলমুত্তমং।
নবদ্বীপব্রজং নিত্যং বন্দে তত্ত্ব স্থলাদিকং॥
জয় জয় গৌরগোবিন্দ।
ব্রহ্মাদি আরাধে তুয়া চরণারবিন্দ॥

শেষ—(৮ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত। ৮ পাতের শেষ)

করুণা করহ গৌর হরি।
অতি দীন হৈঞা যেন পরিক্রমা করি॥

(পুথির আকার দৃষ্টে দেড়শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।)

৮৯। নামামৃতসমুদ্র। নরহরিদাস।

আরম্ভ—

সংসারাসারবোধপ্রদমুদনদনশ্রীগুরোঃপ্রেমকন্দ-
শ্রীরাধানাথকৃষ্ণপ্রবরসময়শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রাঃ।
* * *
শ্রীগুরু শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত গোসাঞি॥

শেষ—

আর কি বলিব গৌরপ্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥

ইতি শ্রীনামামৃতসমুদ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ। (প্রার্থ নাম্ব ২৯০।)

৯০। নারদপুরাণ। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ আদি সনাতন।
ক্ষীরোদ সাগরে বটপত্রেতে শয়ন॥
নমঃ নমঃ সত্যযুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥

শেষ—

দোষাদোষ দোষ না লইবে কৃপা করি।
রচিলাম যেমন ঘটে বুদ্ধি দিলা হরি॥
রচিলাম শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায়।
নারদপুরাণ হৈল এত দূরে সায়॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥ ৬ *॥
অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার।
সুবর্ণবণিক কুলে উৎপত্তি আমার॥
পৈত্রিক বসত পূর্ব্বে অম্বিকানগর।
হালপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর॥
পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন।
পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥
এ সকল পুণ্যবান আছে পূর্ব্ব কীর্ত্তি।
এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্ত্তি॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নাম ছিল রাম নারায়ণ।
ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥
রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান্।
স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান॥
আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম।
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥
সন দশ শত নিরেনব্বই সালে।
মাহ জ্যৈষ্ঠ মধ্যে এই পুস্তক রচিলে॥

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত। সাং গাঙ্গসায়ের মৌজে রঘুনাথপুর সন ১১০৮ সাল। তাং ৯ কার্ত্তিক রোজ রবিবার।

৯১। নারদসংবাদ। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—অথ নারদ সংবাদ লিখ্যতে॥ *।

নমহ নমহ প্রভু আদি সনাতন।
ক্ষীরোদসাগরে বটপত্রেতে শয়ন॥
নমোনমঃ সত্যযুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥

ভণিতা—

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি ধ্যান।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

শেষ—ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত। সন ১২০৮ সাল ২৭ ফাল্গুন (অস্পষ্ট)। (প্রায় ৩০০০ শ্লোক।)

মন্তব্য—পাঠান্তর স্বীকার করিলে কৃষ্ণদাসের নারদপুরাণ ও নারদসংবাদ একই পুস্তক বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থের চারিখানি পুথি আছে।

৯২। নিগম গ্রন্থ। গোবিন্দদাস।

আরম্ভ—

শিক্ষাগুরুকে না ভজিয়ে অজ্ঞানে ভজে।
সে জন পশুর প্রায় রৌরবেতে মজে॥
প্রভুর পূরণ পূর্ণ। প্রেম লীলা অবতীর্ণ॥
প্রকটিত নিজ নাম। সব লীলা অভিরাম।
সঘনে কীর্ত্তন রঙ্গে। কীর্ত্তন আনন্দ রঙ্গে॥

শেষ—

কহয়ে গোবিন্দদাস ভক্ত আর নাঞি।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি॥

কেবল নিগম গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইতি সন ১২০৫ সাল তারিখ ২রা ফাল্গুন। লেখক শ্রীগোপীনাথ দাস। পাঠক শ্রীবলরাম কুণ্ডু। (শ্লোকসংখ্যা ১৪০।)

মন্তব্য—ইহার আর একখানি পুঁথি আছে, সেখানি ১২৫৫ সালের ২৩ ফাল্গুনে লিখিত। সেখানির লেখক "শ্রীগোপাল গরাই।"

৯৩। নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীজীবগোস্বামী।

আরম্ভ—

জিহ্বার রহিতে আসক্ত সহিতে
পূর্ব্বখ্যাতি রস তায়।
শ্রীজীব যাহার জিহ্বা স্থিতিময়
অধরে অধর চায়।

শেষ—

শ্রীজীবগোস্বামী একান্ত ভাবেন
যাই আজ সব পুর।
শ্রীমতী দেহেতে প্রাপ্তি অভিপ্রায়ে
শ্রীমতী জিহ্বাতে রইল।

ইতি শ্রীনিত্যবর্ত্তমান সম্পূর্ণ।

৯৪। নৌকাখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভ—অথ নৌকাখণ্ডলিখ্যতে।

গোপীরে করিতে পার, চলে কৃষ্ণ কর্ণধার,
তরি লয়া চলিল আপনি।
জানিয়া প্রভুর ছল, যমুনা অগাধ জল,
অতি বেগে বহে তরঙ্গিণী॥

ভণিতা—

চক্রবর্ত্তী নারায়ণ তস্য পুত্র জীবন
বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষনাশ পাপবিমোচন॥

পাঠক শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী সাং মাঙ্কুড়ি লিখিতং শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল সাং খাতড়ুরে রাজপলী গঞ্জি-পুষ্করণী। তিথি তৃতীয়া বার বুধবার শুক্লপক্ষ। (শ্লোকসংখ্যা ১৭৫।) ইহার আরও ২ খানি পুথি আছে, তন্মধ্যে একখানির লিখন-কাল সন ১১০৩ সাল ৭ আশ্বিন বুধবার।

৯৫। নৌকাখণ্ড। হরিবোলদাস।

আরম্ভ—

উজন বলে শুন বাছা ভগবান।
তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন॥

শেষ—

আলিঙ্গন কৈল কৃষ্ণ গোপিকার সঙ্গে।
হরিবোল দাসে কহে নৌকাখণ্ড সাঙ্গে॥

ইতি সন ১২০৩ সাল তারিখ ৯ শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা ১২০০।)

৯৬। পদ্মপুরাণ। ষষ্ঠীবরদাস।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার কারণ॥

যেন প্রভু নারায়ণ বন্দিয়া সানন্দে।
পদ্মপুরাণ ছায়া রচি রামানন্দে॥

ভণিতা—

কহে কবি যতীবর সরস পয়ার।
* * * * নাচাড়ি চরণে মনসার॥
(১২ পাত পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।)

৯৭। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—ব্রহ্মশাপ লিখ্যতে।
সূত কহে শৌনকাদি শুন সবিশেষে।
ভূপ যজ্ঞ তোমরা কহ সার দেশে॥

শেষ—

এক নামের মহিমা কহনে না যায়।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় পালা হৈল সায়॥

এই পুস্তক শ্রীনিমাঞি চন্দের সাকিম পাত্রসাএর।
(শ্লোকসংখ্যা ১২৫।)

৯৮। পারিজাতহরণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

মন দিয়া শুনু সবে ভারত কথন।
এক মনে শুন সবে পারিজাতহরণ॥
একদিন নারায়ণ মৈনাকপর্ব্বতে।
বেহারে করেন কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিতে॥

শেষ—

শুনরে ভক্তগণ হইয়া এক মন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় পারিজাতহরণ॥

ইতি পারিজাতহরণ সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ১২ ভাদ্র রোজ রবিবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৩০)

৯৯। প্রকাশুনির্ণয়।

আরম্ভ—১ম পাত নাই।

শেষ—

বৃন্দাবনে কর্ত্তা হইলে অনঙ্গমঞ্জরী।
ভূতপাদনিভিত শ্রীনিধুবন পুরী॥
বৃন্দাবনের প্রকাশ্য গেলেন নবদ্বীপে।
আকুল চিন্ময় রস ভজে সর্ব্বলোকে॥
ব্রজপুরে প্রকাশ করিলা সনাতন।
যত্ন করি লৈল তাহা দাস বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন দাস হইতে শ্রীরূপ পাইল।
রঘুনাথ দাস প্রতি রূপ গোসাঞি দিল॥
পাইল গোপালভট্ট রঘুনাথ স্থানে।
রাধাকুণ্ডে বাস করি রহিলা নির্জ্জনে॥

ইতি প্রকাশুনির্ণয়ঃ সর্ব্বতত্ত্বসম্মিলিতঃ সিদ্ধি পটলং সম্পূর্ণঃ।

ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামী * * * স্বাক্ষর মিদং শ্রীবৃন্দাবন দাস ইতি সন ১০৮২ সাল তাং ২২ ফাল্গুন।
(গদ্য ও পদ্যে লিখিত।)

১০০। প্রহ্লাদচরিত্র। জয়ানন্দ।

(কেবল দুই পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে, আদ্যন্ত নাই। পুথির আকার দৃষ্টে শতাধিক বর্ষের পুরাতন বলিয়া বোধ হয়।)

১০১। প্রহ্লাদচরিত্র। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

প্রহ্লাদচরিত্র শুন শুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে গন্ধর্ব্ব জিনিল পূর্ব্বে॥

শেষ—

কবিচন্দ্র দ্বিজ ভনে ভাবি রমাপতি।
মেরুর দক্ষিণে ঘর পাণ্ডুয়া বসতি॥

ইতি প্রহ্লাদচরিত্র সায় হইল। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।) আরও চারিখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি পুথির শেষে—

প্রহ্লাদচরিত্র যেবা একচিত্তে শুনে।
কৃষ্ণভক্তি সর্ব্ব সিদ্ধ হয় দিনে দিনে॥
সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে প্রহ্লাদ চরিত্র হইল সায়॥

ইতি সন ১০৭১ সাল তারিখ ৩ চৈত্র শুক্রবার।

১০২। প্রহ্লাদচরিত্র। ভরতপণ্ডিত॥

আরম্ভ—(প্রথম ৩২ পাতা নাই। তৎপরে)
নারায়ণ দেহ হৈল সেই দ্বিজবর।
পীতবাসঃ চতুর্ভুজ শ্যামল সুন্দর॥

ভণিতা—

ভরত পণ্ডিত বলে শুন সর্ব্বজন।
যে মতে জিয়াইল শিবা মৃতক ব্রাহ্মণ॥

শেষ—

প্রহ্লাদে ঠাকুরে হইল কথোপকথন।
ত্যজিল নৃসিংহরূপ দেব নারায়ণ॥
সাম্য হইয়া প্রভু আছেন সেই স্থানে।

৭৬ পাতের পর খণ্ডিত। পুথির আকার দেখিলে ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

১০৩। প্রেমতরঙ্গিণী। ভাগবতাচার্য্য।

(শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ।)

আরম্ভ—

তং বেদ শাস্ত্র পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রা
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাং॥
গান্ধাররাগ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুল নন্দন।
বৃন্দাবন চন্দ্র ব্রজরমণীজীবন॥

ভণিতা—

ভাগবতাচার্য্যের মধুরসবাণী।
পরীক্ষিত দেহত্যাগ প্রেমতরঙ্গিণী॥

শেষ—দ্বাদশ স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত। ৩৮৭ পাতের পর খণ্ডিত। (প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৭০০০।)

১০৪। মনসামঙ্গল। ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই)

ভণিতা—

নগরী নিকট আইলা পাটজ পাতলা।
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া কমলা॥

শেষ—

চম্পানগর মাঝে, বিশাল বাজনা বাজে,
চাঁদবেণ্যা পূজে বিষহরি॥
অষ্টমঙ্গলা কৈয়া, বেহুলা লখাই লইয়া,
মনসা চলিলা স্বর্গ পুরী॥
ক্ষেমানন্দ রস গাএ, অষ্টমঙ্গলা সাএ,
সাঙ্গ হৈল দেবীর মঙ্গল।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০।)

১০৫। প্রেমদাবানল। নরসিংহদাস।

আরম্ভ—

প্রথমে বন্দিব মুই দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ যত দেবগণ॥

শেষ—

রাধা কহে হাস শুন বিরহ সকল।
দাস নরসিংহ কহে প্রেমদাবানল॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০।)

১০৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তমদাস।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দ্বব্রহ্মশঙ্করসেবিতম্॥
জয়তি সাধবঃ সর্ব্বে ন ভজন্তি দুরাশয়াঃ॥
শ্রীচৈতন্যে মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স্ব পদান্তিকম্।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দ মুক্তি সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥

শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বোলান বাণী।
কি বলিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তমদাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। তাং ২১ আশ্বিন সন ১১৬৫ সাল।

১০৭। প্রেমবিলাস। নিত্যানন্দদাস।

আরম্ভ—নাম্নাশ্রিতং কলিযুগে ইত্যাদি।

* * *

জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণলীলা যার হইলেক প্রাণ॥

আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হইল যেমতে।
ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিতে॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে দিলা পাঠাইয়া।
চৈতন্য গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া॥
গৌড়দেশ হইতে যেই বৈষ্ণব আইসে।
জিজ্ঞাসেন মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥

শেষ—(১০১ পাতার পর আর পাতা নাই ১০১ পাতের শেষ এই—

কৃপা করি কহে শুন নিত্যানন্দ দাস।
এই এই স্থানে কৃষ্ণের সদাই বিলাস॥
পঞ্চক্রোশ প্রায় বৃন্দাবনের ঘটন।
মাঝে রাজা আছে মহাপ্রভুর স্থাপন॥
মুদ্রিত প্রকাশ হয় দুইত প্রকার।
নিবাসে মুদ্রিত হয় লীলার বিস্তার॥

এইরূপ হন সব গমনাগমন। (প্রাপ্তাংশের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৩০০০।)

১০৮। ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবনদাস।

আরম্ভ—আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতা ইত্যাদি।

শুন শুন আরে লোক শুন সাবধানে।
গৌরচন্দ্র অবতার অপূর্ব্ব শ্রবণে॥

শেষ—

দেখিয়া শুনিয়া যার মনে নাহি ধরে।
সে জন তরিতে কিছু নাহি পর কারে॥

পঞ্চদশাধ্যায়। ইতি শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিত ভক্তিচিন্তামণি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগোপীমোহন দাস সন ১২১৪ সাল তারিখ ২১ পৌষ রোজ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা ৯০০।)

১০৯। ভক্তিরসাত্মিকা। দীনকৃষ্ণ দাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

* * *

নিত্যানন্দ বলে প্রভু করি নিবেদন।
জীবের নিস্তার প্রভু কেমন প্রকারে॥

শেষ—

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে দীনকৃষ্ণ দাস॥
ইতি ভক্তি রসাত্মিকা সম্পূর্ণ।
যতনে রাখিব যেন না হয় প্রচূর্ণ॥

ইতি ১০৮৮ সাল। (শ্লোকসংখ্যা ১০৮।১০৮৫ সনের আর একখানি পুঁথি আছে।)

১১০। ভক্তিলতিকা। নরোত্তমদাস।

আরম্ভ—আজানুলম্বিতভুজৌ (ইত্যাদি)।

* * *

প্রণমহঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
প্রণমহঁ নিত্যানন্দ ভক্তি কৃপালয়॥

শেষ—

এই ভক্তিলতিকা গ্রন্থের রহিল নাম।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিঞা স্মরণ॥
বর্ণন করিল মনে করি অভিলাষ।
ভক্তিলতিকা কহে নরোত্তমদাস॥

ইতি ভক্তিলতিকা গ্রন্থ সংপূর্ণ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৮০।)

১১১। ভগবত্তত্ত্বলীলা (আগম)। যুগলদাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরিত্যাদি॥

জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।
জয় জয় চৈতন্যচন্দ্র প্রেমের সিন্ধু॥

* * *

শিবরহস্যাগমে এক যে কথা শুনিল।
পার্ব্বতীরে সদাশিব সে কথা কহিল॥

* * *

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আদি কহিবে আমারে।
যদি দাসী হেন কৃপা থাকে মোর তরে॥

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ হৃদে করি আশ।
এই তত্ত্ব বিরচিল যুগলের দাস॥

ইতি শ্রীহরপার্ব্বতী সম্বাদ পয়ার প্রবন্ধে ভগবত্তত্ত্ব লীলা সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ২৫০।) ইহার আরও

তিনখানি পুথি আছে। তন্মধ্যে ১০৮৩ সনে লিখিত একখানি।)

১১২। ভরত উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ভাগবতামৃত।
পঞ্চম স্কন্ধের কথা শুনিতে অমৃত ॥
দিনে দিনে মৃগ শিশু হয় বলবান্।

শেষ—

এতদূরে ভরতের উপাখ্যান সায়।
পঞ্চম স্কন্ধের উক্তি কবিচন্দ্রে গায় ॥

লিখিতং শ্রীনিমাইচন্দ্র। (শ্লোকসংখ্যা ৩০০।)

১১৩। ভাগবতামৃত। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

একদিন নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি।
তপ জপ সাঙ্গ করি সবে আছে বসি ॥

ভণিতা—

(১) দেবাসুরে কলহ হইল তার পর।
কবিচন্দ্রের কথা গাইল শঙ্কর ॥
(২) চক্রবর্ত্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম,
তস্য সুত কবিচন্দ্রে গায় ॥

শেষ—

এত বলি দেব ঋষি হল্যা অন্তর্দ্ধান।
এতদূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র গান ॥

সন ১০৮০ সাল তারিখ ১০ ভাদ্র হল সায়। লিখিতা শ্রীনিমাইদাস চন্দ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০)

১১৪। ভাগবতের অর্থবিসম্বাদ।

আরম্ভ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥
যার কৈল অম্বরীষ একোন উচিত।
যার ভয় ত্রিভুবন হয় কম্পান্বিত ॥

শেষ—

ভজ ভজ আরে ভাই বৈষ্ণব গোসাই।
এ ভব সংসারে যেন পুনঃ তরি যাই ॥

শ্রীভাগবতে অম্বরীষ সম্বাদ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

১১৫। ভাষাপরিচ্ছেদ। (সংস্কৃত ভাষা-পরিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া রচিত।)

আরম্ভ—গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় ? তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার। দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

মধ্যে—মীমাংসা মতে কণ্ঠাদ্যভিব্যঙ্গ্য শব্দ নিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ জন্য বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না। অতঃপর কর্ম্মের পরিচয় কহিতেছি। * * * ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ। কারণ জন্য হইয়া কার্য্যজনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন পর্ব্বতে বহ্নি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে কারণ যে হয় সে অবশ্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেতে থাকে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির স্মৃতি পরে পরামর্শ। তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ সে ক্ষণে সংশয় থাকিল না। জ্ঞান ইচ্ছা দ্বেষকৃত যত্ন দুঃখ। ইহারা ত্রিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ, ত্রিক্ষণে নষ্ট হয় জানিবে।

শেষ—(নাই। খণ্ডিত। ১৫ পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তারিখ আছে শুভমস্তু সন ১১৮১।)

১১৬। ভ্রমরগীতা। জগন্নাথ দাস।

আরম্ভ—বন্দেঽহং করুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যদয়ানিধিং

*   *   *

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
ভ্রমর দেখিয়া যে কহিল গোপীগণ ॥

শেষ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করি ধ্যান।
মাথুর বর্ণন কহে জগন্নাথ দাস ॥

ইতি ব্রজগীতায়াং গোপী উক্তি মাথুরবর্ণনা নাম পঞ্চম অধ্যায়। সন ১২২০ সাল শাকের শ্রীরামনারায়ণ দাস ভক্তঃ তারিখ ১৬ মাঘ রোজ সোমবার অটিদণ্ড গতে সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ১৫০।)

১১৭। মঙ্গলচণ্ডী। রঘুনাথ দাস।

আরম্ভ—

প্রণমহ গণপতি বিঘ্নবিনাশন।
প্রণতিপূর্ব্বক বন্দ শিবাশিবচরণ॥

শেষ—

শিবদুর্গাপাদপদ্ম নিত্য মোর আশ।
দ্বিজ রঘুনাথে কহে বাধ নিজ দাস॥

ইতি দ্বিজত মঙ্গলচণ্ডিকা পাঁচালি সমাপ্ত শুভমস্ত শকাব্দা ১৬৬১। সন ১১৪৮ তাং ২৭ আষাঢ় মোদপুর নগর মৌজে দেনগ্রাম। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০॥)

১১৮। মনঃশিক্ষা। (দাসগোস্বামী কৃত মূল ও প্রেমদাস কৃত তাহার অনুবাদ।)

আরম্ভ—গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েষু স্বজনে (ইত্যাদি)
অস্যার্থ। গুরু শব্দে গুরু গোসাঞি উপদেষ্টা প্রভু।
দম্ভ ছাড় তাহে রতি না ছাড়িহ কভু॥

শেষ—

শ্রীদাসগোসাঞির পদ হৃদে আশ কৈল।
দ্বাদশ শ্লোকের অর্থ মন বুঝাইল॥
বৈষ্ণব গোসাঞি পাদপদ্ম হৃদি আশ।
মনঃশিক্ষা সংক্ষেপার্থ কহে প্রেমদাস॥

ইতি মনঃশিক্ষা সমাপ্ত॥ সন ১১৫৫ সাল ১৩ বৈশাখ রোজ সোমবার॥ (শ্লোকসংখ্যা ৩৩।)

১১৯। মনঃশিক্ষা। (অনুবাদ) গিরিধর দাস।

আরম্ভ—

শ্রীগুরুচরণে ব্রজে ব্রজবাসীগণে।
বৈষ্ণবচরণে আর ব্রাহ্মণের গণে॥

শেষ—

যেই জনে গায় উচ্চ মধুর করিয়া।
সেই জন যশ শ্রীরূপানুগ হৈয়া॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সেবারস লভে।
গিরিধর দাস ইহা গাইল এই লোভে॥

অপর একখানি পুথির আরম্ভ—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েষু স্বজনে (ইত্যাদি)
চরণে ধরিয়া বহু যাঞ্চা করিয়া।
এই ভিক্ষা মাগ্র অহে শুন মন ভাইয়া॥

(শ্লোকসংখ্যা মূল ও অনুবাদ সমেত ৪৮।)

১২০। মনসামঙ্গল (পদ্মপুরাণ)। জগন্নাথ।

আরম্ভ—(১ম পাতা নাই, ২য় পাত হইতে)
সর্ব্বলোকে তুয়া সেবি, প্রত্যক্ষ দেবতা কলিযুগে॥
ঋষিগণ সুরাসুরে, সর্ব্বদাএ স্তুতি করে,
না জানন্তি মহিমা তোমার।

ভণিতা—

বৈদ্যশ্রীজগন্নাথে রচিল পুরাণ।
সুরচিত কহি শুন নাচাড়ীর ছান্দ॥

শেষ—(৪০ পাতের শেষে)

কেমতে যাইব কালিকা জনকবাড়ী।
কোন ছলে মুণ্ডিব আপনা ছোর দাড়ী॥

(তৎপরে খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৬০০।)

১২১। মনসামঙ্গল। জগমোহন মিত্র।

আরম্ভ—

অগ্রজন্মা-অঙ্ঘ্রি অব্জ উত্তমাঙ্গে ধরি।
গ্রন্থ গ্রহনের জন্য আজ্ঞাচ্যুত করি।

শেষ—

চতুর্দ্দশ পালা সাঙ্গ হইল পুস্তকে।
সপ্তদিন সপ্তরাত্র গাইবে গায়কে॥
আমি মূর্খ মূঢ়মতি অতি অপ্রবীণ।
ভরসা মনসাপদ সম্পদবিহীন॥
নিজ বংশাবলী বলি বিস্তার করিয়ে।
কন্যাগ্রে রাখিবে মাতা পদছায়া দিয়ে॥
বড়িশা সমাজ মাঝে মহামতিমান।
গৌড়েশ্বর মিত্র নাম তেজস্ক প্রধান॥
সেই বংশে জন্ম মিত্র হরিনারায়ণ।
বালাগ্রার গোপালপুরেতে নিকেতন॥

আদ্য পক্ষে দুই পুত্র গুণে গুণধাম।
অগ্রজ ধরণীধর অনুজ শ্রীরাম॥
শেষ পক্ষে পঞ্চসুত সর্ব্বপরায়ণ।
প্রথমে শ্রীধর পরে কমল নয়ন॥
নানাজাতি যশভাতি রাখি চারিজন।
লীলা সম্বরিয়া স্বর্গে করিলা গমন॥
ধরণীধরের দুই পুত্র বিচক্ষণ।
গঙ্গানারায়ণ আর রামনারায়ণ॥
শ্রীধরের বংশধর সর্ব্বগুণধর।
রামচন্দ্র পীতাম্বর পুত্রে বিশ্বম্ভর॥
কমলনয়ন সুত হরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ।
আদ্যপক্ষে আবির্ভাব ভৈরব কনিষ্ঠ॥
এই ভিক্ষা মাগি মাগো চরণ-কমলে।
সর্ব্বজনে সর্ব্বগণে রাখিবে কুশলে॥
শ্রীরামের চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ আমি দীন।
স্বকর্ম্মে প্রবৃত্তিহীন অকর্ম্মে প্রবীণ॥
নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন।
অন্ধের যেমন নাম কমললোচন॥
অনিত্য সম্পদে নিত্য চিত্ত নিমগন।
আশা করি তব পদে সদা থাকে মন॥
অনুজ ভ্রাতার নাম মদনমোহন।
ঐহিকে সম্পদ দিবা চরমে চরণ॥
তৃতীয় সোদর শোকে বিকল অন্তর।
মথুরামোহন নাম অল্পে লোকান্তর॥
তস্য সুকুমার সূর্য্যকুমার শৈশব।
পিতৃহীনে দিবে মাতা অতুল বৈভব॥
কনিষ্ঠ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধামোহন।
নিজ দাস বলি যেন সদা থাকে মন॥
অধমের তিনপুত্র তব প্রসাদাৎ।
জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয় কালীনাথ॥
নাম তারা বিলাস কনিষ্ঠ বংশধর।
সকলের প্রতি দয়া থাকে নিরন্তর॥
মধ্যম ভ্রাতার তিন গুণীর সন্তান।
যথাক্রমে সকলের লিখি অভিধান॥
প্রথমে সারদা ভগবতী সতী নাম।
পরম্পর শ্রীচরণ মোহন বিশ্রাম॥
অনুজ অগ্রজ দুই তত্ত্ব পরিচয়।
পরার্থে কুমারনাথ পিতে চন্দ্রময়॥
সবাকার বস্ত্র ভাগ্যে নব অনুরাগ।
গোষ্ঠীপতি জামাতা প্রসন্নচন্দ্র নাগ॥
প্রত্যেকে লিখিলে নাম বাহুল্য আমায়।
বান্ধব বর্গেতে মাতা রাখিবে ও পায়॥
অতঃপর গ্রন্থ সাঙ্গ কাল নিরূপণ।
ঋতু রস সিন্ধু শশী ক্রমেতে গণন॥
শর শশী বাণপক্ষ তত্ত্ব তদন্তরে।
অঙ্ক অস্ত্র বামাগতি যাত্তু চরাচরে॥
মুর্খের হইবে দুঃখ সুখ ভাবনায়।
প্রকাশ করিয়া তাই লিখি পুনরায়॥
শকাব্দ শতত্রয়োশত ছেষট্টী জানিবে।
সন ধরো বারশত একাত্ত গণিবে॥
আছয়ে কবির নাম ভাষায় বিদিত।
ভজন শুনয়ে বলি সঙ্কেতে কিঞ্চিৎ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৭০০।)

১২২। মনসার পাঁচালী (পদ্মপুরাণ)।

নারায়ণদেব।

আরম্ভ—

সরস্বতী পদযুগ করি নমস্কার।
সেবকেরে দয়া করি রাখহ সংসার॥

ভণিতা—

নারায়ণদেবে কহে সরস পাঁচালী।
বেউলার কথা শুন এক যে নাচাড়ি॥

শেষ—(৪২ পাতের শেষ)

গঙ্গা বোলে শুন হনুমান্।
একে একে তুলি দেহ ডিঙ্গা চৌদ্দখান॥
গঙ্গার বচনে বীর নৌকা কইল স্থির।
নৌকা তুলিবারে লাগে কানি বস্ত্র জল॥

(তৎপরে খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪৮০।)

১২৩। মনসাপাঁচালী। জানকীনাথ।

আরম্ভ—নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদি।

প্রণমহ নারায়ণ জগৎজীবন।
সৃজন-পালক যেই করএ পালন॥

শেষ—

শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার করিয়া পদবন্ধে।
পণ্ডিত জানকীনাথে রচিল সানন্দে॥

* * *

বিপ্র জানকীনাথ মনসার দাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে পোথা করিল প্রকাশ॥

* * * * * বাঙ্গলামাহে ১৫ই চৈত্র তিথি শুক্লপক্ষের বিজয়া অষ্টমী রোজ বুধবার অক্ষর পুস্তক শ্রীগণেশর স্বরদাস মোকাম বালিয়াচোং সরকার শ্রীহট্ট। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬০০০।)

১২৪। মহাভারত। বিজয়পণ্ডিত।

তৃতীয় বর্ষের সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা দ্রষ্টব্য। এই পুথি মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই পরিষৎকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

১২৫। মহাভারত। কাশীরামদাস।

১০৮১ সনের পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রিত পুথি হইতে তিনগুণ বড়।

১২৬। মহাভারত। (বিরাটপর্ব্ব) সঞ্জয়।

আরম্ভ—

বনপর্ব্ব কথা যদি হৈল সমাধান।
বিরাটপর্ব্বের কথা কর অবধান॥
তবে জন্মেজয় রাজা কান্দি জিজ্ঞাসয়।
তারপরে কিবা হৈল কহ মতিময়॥

শেষ—১৮ পাতের পর খণ্ডিত।

১২৭। মহাভারত। (পরাগলী) কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

আরম্ভ—(১ম ২০ পাত নাই। ২১ পাত হইতে)

লোমে লোমে ধর্ম্ম গলে তেজি অহঙ্কার।
লজ্জায় খসিল সব রাজার কুমার॥
কেহো শক্ত নহিল ধনুতে দিতে গুণ।
ব্রাহ্মণ সমাজ হৈতে উঠিলা অর্জ্জুন॥

ভণিতা—

ভারতের কথা সার, যেহেন অমৃতধার,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস॥
যদি শুনে একমনে, বৈকুণ্ঠে হয় গমনে,
পড়িলে সকল পাপক্ষয়।
অদ্ভুত ভারতকথা, কবীন্দ্র রচিল পোথা,
নাম তার পাণ্ডববিজয়॥

(কর্ণপর্ব্বের শেষ)

শেষ—(২৯২ পাতের শেষে)

মালিনী আমার কন্যা অতি রূপবতী।
তাহাকে করিব দান শুন মহামতি॥
রাজার বচন শুনি নারদ চলিল।
হস্তিনাপুরী গিয়া যমেক কহিল॥

মন্তব্য—(আদি পর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের শেষ ভাগ হইতে অশ্বমেধপর্ব্বের বীরবর্ম্মার যজ্ঞ কথা পর্য্যন্ত আছে। ১৯২ পাতের পর খণ্ডিত। পুথিখানি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাঁকসায়ের গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০।)

১২৮। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—যং ব্রহ্ম বেদান্তবেদে বদন্তি পরং ইত্যাদি।

* * *

প্রথমেত গুরুপাদ পদ্ম (ধরি শিরে।
যার অনুগ্রহ মতি হৈল বিশেষরে॥

* * *

ব্যাসদেব রচিলেন ভারত কথন।
সে কথা বুঝিতে নাকি পারে সর্ব্বজন॥
ভারত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
পয়ারকৃত করিয়া কহি বুঝ মহাসুখে॥

ভণিতা—

বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন ওরে ভাই হইয়া এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারতকথন॥

মন্তব্য—(৫১ পাতের পর খণ্ডিত। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্য্যন্ত। এই ৫১ পাতের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৩২৫০।)

১২৯। মহাভারত (স্ত্রীপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—নারায়ণং নমস্কৃত্যাদি।

বৈশম্পায়ন মুখে, আজ্ঞা শুনেন কৌতুকে,
জিজ্ঞাসা করিলা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হৈল, যত ক্ষত্রিগণ গেল,
পাণ্ডবের ঘুচিল সংশয়॥

শেষ—

বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
ব্রাহ্মণের পদরজ করিয়া ভাবন।
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারত কথন॥
রচিলাউ যুক্ত ভাই না করিহ হেলা।
এতদূরে স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত হইলা॥

ইতি শ্রীমহাভারতের স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীসদানন্দ সরকার। সাং ডাণ্ডাপাড়া। সন ১০৮২ সাল তাং ৫ শ্রাবণ॥ (বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে এই স্ত্রীপর্ব্বের ১০৮৩ সালের একখানি এবং তৎপরবর্ত্তী বিভিন্ন সনের দুই খানি পুথি আছে। শ্লোকসংখ্যা ১৫০০।)

১৩০। মহাভারত (বৃহৎ শান্তিপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—বৃহৎ শান্তি লিখ্যতে।

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
রাজা হৈল যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥

শেষ—

নিত্যানন্দ দাস কহে পাঁচালীর মত।
শান্তিপর্ব্ব এত দূরে হৈল সমাপ্ত॥

বীরসিংহ সন ১২৩৭ সাল তাং ২৯শে ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০০। ১২৩৭ সালের আরও একখানি পুথি আছে।)

১৩১। মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—(প্রথম তিনপাত নাই ৪র্থ পাত হইতে)

ক্ষত্রিয়ের হৈল ক্ষয়, শত্রু হইল জয়,
তব পুত্র কালে কৈল বশ।

ভণিতা—

শুন শুন আরে ভাই হঞা এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন॥

(যে কয় পাতা আছে, তাহার মোট শ্লোকসংখ্যা ১৮০০)

১৩২। মহাভারত (বিরাটপর্ব্ব) গঙ্গাদাস সেন।

আরম্ভ—বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

সভাসদ পুন সব কর অবধান।
চিত্ত দিয়া শুন কহি পরীক্ষিত যে পুরাণ॥

শেষ—(৫৬ পাতার পর খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৪০০।)

১৩৩। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

ভীষ্মেরে চাপাইয়া রথী রূপ আন ঘরে।
শুভযোগে শান্তনু রাজত্ব দিল তারে॥
শান্তনু নৃপতি স্নান করিবারে যায়।
যমুনার তীরে কন্যা দেখিবারে পায়॥

শেষ—

এই কথা দুর্য্যোধন শুনে ঘরে ঘরে।
ভাবনা হইল বড় রাজার অন্তরে॥
বিমনা হইয়া মনে ভাবেন রাজন।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে শুন ভক্তগণ॥

সন ১০৮৩ সাল তারিখ ২১ জ্যৈষ্ঠ। শ্রীনিমাইচন্দ্র।

১৩৪। মহাভারত (কিরাতার্জ্জুনীয়)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বসিয়া আছে পাঁচ ভাই দ্রৌপদী সহিতে।
হেনকালে অর্জ্জুন কহেন জোড় হাথে॥

পূর্ব্বে নারদমুখে শুনাছি বিবরণ।
পাণ্ডুপাত বাণে শস্য রাজার মরণ॥

শেষ—(খণ্ডিত) ৬ পাত মাত্র, পরে নাই।

১৩৫। মহাভারত (বনপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয়।
কাম্যবনে যুধিষ্ঠির বৃকোদরে কয়॥

শেষ—

এত বলি বৃহদশ্ব আশ্বাসিয়া যায়।
বনপর্ব্বে চিত্র-কথা কবিচন্দ্রে গায়॥ ৬॥

ইতি সন ১০৮৫ সাল লিখিতং শ্রীনিমাঞি চন্দ্র সাকিম পাঞ্জসায়ের। (শ্লোকসংখ্যা ২৯০।)

আর একখানি পুঁথির শেষে—

পাণ্ডবেরে বিদায় দিয়া করিল গমন।
কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে ভাই পঞ্চজন॥
কোথা গেলে অহে প্রভু দেব যদুরায়।
হাহাকার ক'র্য়া সর্ব্বে কান্দে উভরায়॥
বনপর্ব্বের কথা এত দূরে সায়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

১৩৬। মহাভারত (উদ্যোগপর্ব্ব) কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—উদ্যোগপর্ব্ব লিখ্যতে।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
কৃষ্ণরে সম্ভাষি যুধিষ্ঠির কয়॥

শেষ—

ঢাল খাঁড়া ধনু তীর গায়ক দিবেক।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা সেই গাওয়াবেক॥
ভারত শ্রবণে দেহ হয় পুলকাঙ্গ।
এতদূরে উদ্যোগপর্ব্বের কথা সাঙ্গ॥
কবিচন্দ্র বলে দ্বিজ ব্যাসের কিঙ্কর।
ভীষ্মপর্ব্ব মন দিয়া শুন তারপর॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

১৩৭। মহাভারত (ভীষ্মপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
ভারতশ্রবণে হয় পুণ্যের উদয়॥
কৌরব পাণ্ডব রণে সাজে দুই দল।
পৃথিবীর রাজা যত আইল সকল॥

শেষ—(খণ্ডিত।)

১৩৮। মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব) কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

প্রভাতে সঞ্জয় যায়্যা ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
কালিকার যুদ্ধের কথা শুন মহাশয়॥
অভিমান করি দুর্য্যোধন কহে দ্রোণে।
পাণ্ডবের জয় দেখি কি কাজ জীবনে॥

ভণিতা—

দ্রোণপর্ব্বের কথা কবিচন্দ্র কয়।
যে জন গায়ায় তার সর্ব্বত্র হয় জয়॥
শ্রীযুত গোপালসিংহ নৃপতির আদেশে।
সংক্ষেপে ভারতকথা কবিচন্দ্র ভাষে॥

শেষ—(খণ্ডিত। মোট শ্লোক ১৫০।)

১৩৯। মহাভারত (১ কর্ণপর্ব্ব) কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহি যে তোমায়।
দ্রোণের মরণে কুরু নিদ্রা নাহি যায়॥
প্রভাতে কর্ণেরে রাজা করি সেনাপতি।
পাণ্ডবে জিনিতে যায় কৌরবের পতি॥

শেষ—

কর্ণপর্ব্বে যে জন গায়ায় গায় শুনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় সেই জনে॥
এই পর্ব্ব যেবা জন গায়ায় সাদরে।
বাস ভূষা দক্ষিণা দিবেক গায়কেরে॥
ইহার উত্তর গাব শল্যপর্ব্বের কথা।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের গুণ গাথা॥
হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হল সায়।
অভিমত বর পায় যে জন গাওয়ায়॥

ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিক ২৮ কার্ত্তিক বেলা চারি দণ্ডে সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীনিমাঞিদাস চন্দ্র সাকিম পাঞ্জসাএর।

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
কর্ণ মলো তবে কি করিল দুর্য্যোধন॥

বৈশম্পায়ন বলে রাজা করহ শ্রবণ।
হা কর্ণ হা কর্ণ বলি কান্দে দুর্য্যোধন ॥ ৪ ॥
(শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

(২ কর্ণপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি কহে শুনহ রাজন।
বিস্তারিয়া কর্ণপর্ব্ব করি যে বর্ণন ॥

শেষ—

কর্ণ যুদ্ধ এত দূরে হইল সমাপন।
ইহা পর শল্যপর্ব্ব করিবে শ্রবণ ॥
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে কর্ণপর্ব্ব পালা হৈল সায় ॥

ইতি সন ১০৮৮ সাল তারিখ ১৮ পৌষ তিথি কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী মঙ্গলবার বেলা দুয় দণ্ডে সমাপ্ত হইল। শ্রীনিমাঞি চন্দ্র সাকিম পাত্রসায়ের। (শ্লোকসংখ্যা ১৭৫।)

১৪০। মহাভারত (শল্যপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

হা কর্ণ হা কর্ণ বল্যা দুর্য্যোধন ডাকে।
সাগরের মাঝে ফেল্যা গেলে ভাই মোকে ॥

শেষ—

শল্যপর্ব্বের কথা এত দূরে সায়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

সন ১০৮৩ সাল তারিখ ১৫ বৈশাখ। লিখিতং শ্রীনিমাইদাস সাকিম পাত্রসাএর। (শ্লোকসংখ্যা ১৭০।)

১৪১। মহাভারত (গদাপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

ধৃতরাষ্ট্র বলে সঞ্জয় জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃপ আদি কি কার্য্য করিল তারপরে ॥
গদা কান্ধে কর্যা ভীম চল্যা একা।
ব্যাধ সঙ্গে দৈবযোগে পথে হৈল দেখা ॥

ভণিতা—

দারুণ পুত্রের শোকে, বুকাঘা হারিল লোকে,
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভানে ॥

শেষ—

সেবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র গায়।
গদাপর্ব্বের কথা এতদূরে সায় ॥

ইতি সন ১০৮২ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ লিখিতং শ্রীনিমাঞিচন্দ্র সাকিম পাত্রসাএর, বেলা তৃতীয় প্রহরে সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা ১৭০।)

১৪২। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)। কৃষ্ণানন্দ বসু।

আরম্ভ—(১ম চারি পাত নাই, তৎপরে)

কি কারণে তাহা নাই কহিলে রাজনে ॥
সুলভ গোবিন্দভক্তি কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহাত মানিলে বিপর্য্যয় ॥
পরহিংসা পরদ্রব্য কেলে অপকার।
ছাড় ইচ্ছা করিয়া পুষিল প্রতদার ॥

শেষ—

মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
এক মনে একচিত্তে শুনে যেইজন।
সর্ব্ব দুঃখ হরে সেই ব্যাসের বচন ॥
নমস্কারে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়পদদ্বন্দ্ব।
পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ ॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০।)

১৪৩। মুক্তাচরিত্র। নারায়ণ দাস।

আরম্ভ—

লীলাম্বুজস্মিতাং ভক্তিস্থানপরিস্তুং স্থিতৌ।
উদিতঃ যে শচীগর্ভতোয়াধি পূর্ণবিধুঃ ভজে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু চৈতন্য ঈশ্বর।
অবতীর্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ শশধর ॥

শেষ—

প্রভু শ্রীরূপ গোপানন্দ পাদপদ্ম আশ।
মুক্তার চরিত্র কহে নারায়ণ দাস ॥
ঋতু বেদ অষ্টচন্দ্র (১৬৪৬) গণনা শকেতে।
মুক্তাচরিত্র ভাষা হৈল বিদিতে ॥

ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্রে ব্রজবাসী ভাবনিরূপণং ষষ্ঠঃ স্তবকঃ। সন ১১০৬ সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র পাঠক শ্রীচৈতন্য দাস সুবর্ণ বণিক। সাং পীরনিরো। লিখিতং শ্রীপরমানন্দ বিশ্বাস। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০।)

অতি দীন হীন মুঞি নিত্যানন্দ দাস।
রসকল্পসার এই করিল প্রকাশ॥

জয় রাধা সখ্যাখ্যাতা তত্র রাসপদাশ্রয়ঃ পূর্ব্বোক্তানঙ্গমঞ্জরীচৈব ইশ্বরী জাহ্নবা স্থিতা। ইতি রসকল্পসার গ্রন্থ সমাপ্ত। শক ১৭০১। (শ্লোকসংখ্যা ৮০।)

১৫০। রসকল্পসার। বৃন্দাবন দাস।

আরম্ভ—

আদৌ ব্রহ্মা ততঃ কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ ততঃপরম্।
সখী দেহাদুদেহশ্চ পঞ্চধা কথ্যতে ভক্তঃ॥

* * * *

বৃন্দাবন কুঞ্জ মধ্যে রসাবেশ হৈঞা।
পরম আত্মা হইতে নিত্য শক্তি প্রকাশিয়া॥
সেই শক্তি হইতে হয় আনন্দের ধাম।
সেই শক্তি পূর্ণকর গোবিন্দের কাম॥

শেষ—

নিত্যানন্দের দাস মুঞি নিত্যানন্দের দাস।
জন্মে জন্মে হয় যেন তার পায় আশ॥
অতিদীন অতি হীন বৃন্দাবন দাস।
রসকল্পসারতত্ত্ব করিল প্রকাশ॥
(শ্লোকসংখ্যা সাধ্যা ৩০।)

১৫১। রসভক্তিলহরী। শ্রীকৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—(১ম ৩ পাত নাই। ৪র্থ পাত হইতে)

স্বকীয়া ভাবেতে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
এহি হেতু পরকীয়া করহ আশ্রয়॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শেষ—

এই অষ্ট অবস্থাতে হয় অষ্ট সখী।
সহায় করেন সবে কভু না উপেখি॥
শ্রীপদ্মমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ।
চরণে স্মরণ মাগে শ্রীকৃষ্ণদাস॥

ইতি রসভক্তিলহরী সমাপ্ত। সাক্ষর শ্রীতপস্তারাম সাকিম সরগাওে তিসিনা রাজধানী শ্রীশ্রীযুত রাজধরমাণিক্যদেব মহারাজ। ইতি সন ১২১১ ত্রিপুরাব্দ বাঙ্গলা সন ১২০৮ তারিখ ২৫ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার তিথি প্রতিপদ। (শ্লোক প্রায় ৩৭০।)

১৫২। রসোজ্জ্বল। জগন্নাথ দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতমসাচ্ছন্না জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ইত্যাদি।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈল যেই জন॥

মধ্য—

উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বরের তত্ত্ব।
অতএব এই তিন জানিবা মহত্ত্ব॥

শেষ—

রসবতী নারী আর রসিক নাগর।
রসপূর্ণ করি ভজ গুণের সাগর॥

ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ২০ ফাল্গুন লিখিতং শ্রীমথুরদাস বৈরাগী পাঠক কেশবরায় সেন সাং মুগাকাটি। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬৭০।)

১৫৩। রসোদ্গার। (বাসুঘোষ, জ্ঞানদাস, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, যদুনন্দন প্রভৃতির ৩৬টী পদ।)

আরম্ভ—অথ রসোদ্গার লিখ্যতে।

আজু গৌরাঙ্গসনে রজনী গোঙায়লু
সো সুখ কি কহব সই।
লাখ বদন যদি বিধি মোরে দেয়ত
তবে কিছু গোরাগুণ কই॥

শেষ—

কনএ বিদ্যাপতি ইহ রস গায়।
ইহ অবশেষ যদুনন্দন গায়॥

১৫৪। রাগময়ীকণা।

আরম্ভ—

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
যার কৃপায় লেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
তবে বন্দ সাবধানে বৈষ্ণব গোসাঞি।
কৃষ্ণপ্রেমধন দিতে আর কেহ নাই॥

শেষ—

বৃন্দাবনে ষোল কলা গোকুলেতে বার।
দ্বারকায় নব কলা মথুরায় সুসার॥

১২২১ ত্রিপুরাব্দে লিখিত আর একখানি পুথিতে এইরূপ আছে—

"তার বলিয়া এক অপূর্ব্ব কাহিনী।
নিত্যরূপে ভজে যেই শুনে ভক্ত গণি॥
হবে বলিয়া কৃষ্ণ হয় মহাশয়।
বিশাখা তাহার নাম জানিহ নিশ্চয়॥
হেলায় বলিএ এক অমৃতের খনি।
শ্রীজীব বলিয়া নাম জগতে বাখানি॥
কহিতে অনেক উঠে আনন্দ তরঙ্গ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু উপাসনা রঙ্গ॥
অনেক প্রকার হএ সাধন লক্ষণ।
নিজ গুরু সঙ্গে করি যাব বৃন্দাবন॥
ততেক কহিল যদি শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীরূপচরণ ভিন্ন আর গতি নাই॥
রাগময়ী গ্রন্থ তার নাম যে কহিল।
ইহাতে সাধকে কিছু বুঝিতে পারিল॥
যেই জনে না দেখিল রাগময়ীকণা।
সেইজনে কিবা জানে রসের উপাসনা॥
শ্রীরূপসনাতন পদে যার আশ।
রাগময়ীকণা লিখে শ্রীবিরিঞ্চীর দাস॥
হীন তপস্যারাম ভবের তরঙ্গ দেখি ঝরে দুই আঁখি।
হরিপদে বিনে আর উপায় না দেখি॥
সামান্য লোকের গতি করিলা উদ্ধব।
আমি অধমের হৈল এত পরাভব॥
ইতি রাগময়ীকণা সমাপ্ত। ত্রিপুরাব্দ ১২১১।

১৫৫। রাগমার্গলহরী।

আরম্ভ—বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি।

মধ্য—

শ্রীরূপগোসাঞির কথা দুর্গম অপার।
আপনে গৌরাঙ্গ কৈল শক্তির সঞ্চার॥

শেষ—

শ্রীরূপপদারবিন্দ আজ্ঞা শিরে ধরি।
কহিলাম রাগমার্গভজনলহরী॥

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে নানা সাধন-নিরূপণ রাগমার্গলহরী সমাপ্ত॥

১৫৬। রাগমালা। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য (ইত্যাদি)

প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
তাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ॥

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তাহার আখ্যান॥
প্রভু সম্মতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এই সব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি রাগমালা নাম সম্পূর্ণ॥ সন ১১০৩ সাল তারিখ ২৯ পৌষ মোকাম ভোলতা পরগণে ফতেসিংহ লিখিতং শ্রীনন্দলাল দাস আবরস শ্রীআনন্দীরাম সিংহ। (শ্লোকসংখ্যা ১৮০।)

১৫৭। রাগরত্নাবলী। কৃষ্ণদাস।

ভণিতা—

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

* * *

রাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি দুই বিধ হয়।
বামা দক্ষিণারাগ দুই বিধ কয়॥

শেষ—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগরত্নাবলী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি রাগরত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। পাঠক শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাসস্য॥ (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

১৫৮। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব। যদুনন্দন দাস (বিদগ্ধ-মাধবের অনুবাদ।)

আরম্ভ—সুধানাং চান্দ্রিণামপি মধুরিমো (ইত্যাদি)

* * *

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী   চন্দ্রমুখা উন্মাদিনী
তাহাকে দমন করে যেবা ।
রাধাহি প্রণয় তাথে   যন রসা সুভাষিতে
সে মাধুরী আস্ব করে কেবা ॥

শেষ—

শ্রীরূপপাদপদ্ম স্মরণ করিঞা ।
কৃষ্ণলীলা গান কৈল মন বুঝাইয়া ॥
শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্যঠাকুর ।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণলীলা ভাণ্ডার প্রচুর ॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেম দিল তাহার নন্দিনী ।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরাণী ॥
তেহোঁ পাদধূলি দিলু আমার মস্তকে ।
সেই সে ভরসা মোর হঞাছে অধিকে ॥
ঠাকুর বৈষ্ণবপদে কর পরণাম ।
মোর না লইবে প্রভু মাগো এই দান ॥
রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান ।
গাএ দীনহীন যদুনন্দনাভিধান ॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্বে তীর্থবিলাসো নাম সপ্তদশোহঙ্কঃ ॥ ০ ॥ লিখিতং শ্রীগোকুল দে । সন ১০৯০ সাল তারিখ আশ্বিন মাহ পঞ্চম দিবসে গ্রন্থ সমাপ্ত । বার শনিবার ।

১৫৯ । রাধারসকারিকা ।

আরম্ভ—অথ রাধারসকারিকা লিখ্যতে ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
প্রথমে বন্দিব গুরুদেবের চরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

শেষ—

রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ ।
অতএব দুইরূপ হয় একরূপ ॥

১৬০ । রাধারাগসূচক (রঘুনাথ দাস গোস্বামীর)

আরম্ভ—অথ সূচক ।

শ্রীরূপবৈরাগ্যকালে   সনাতন বন্দিশালে
বসিয়া ভাবেন হবে মন ।
স্বপেরে করুণা করি   জাগ কৃপা গৌরহরি
মউ অধমে রহিল সঙরণ ॥

মধ্য—

সেই রঘুনাথ দাস   পুরিব মনের আশ
এই মোর মনে আছে সাধ ।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস   মনে করে অভিলাষ
সবে মেলি করহ প্রসাদ ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর রাধারাগসূচক সম্পূর্ণ ।

শেষ—

পাথারে পড়িনু মুঞি গেল বহু দূর ।
কেশে ধরি উদ্ধারিল শ্রীআচার্য্য ঠাকুর ॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পদে রহু আশ ।
প্রার্থনা করএ সদা নরোত্তম দাস ॥

ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ মাহ মাঘ ১৭ রোজ সমাপ্ত । (শ্লোকসংখ্যা ৫০ ।)

১৬১ । রাধিকামঙ্গল । কবিচন্দ্র ।

আরম্ভ—

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্ব কথন ।
কৃষ্ণ কথা কহ মুনি করিএ শ্রবণ ॥
শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিৎ বলে ।
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥

শেষ—

রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ।
এত দূরে রাধিকামঙ্গল হৈল সায় ॥

ইতি সমাপ্ত । ১২৭৮ তাং ২০ ফাল্গুন । (শ্লোক সংখ্যা ২৭০ । ১০৯৭ সনে লিখিত আর একখানি পুথি আছে ।)

১৬২ । রামস্বর্গারোহণ । ভবানীদাস ।

আরম্ভ—প্রণাম জয়কালী ব্রহ্মার চরণ ।
কোটি কোটি ব্রহ্মা যার রোম কোণ ॥

*   *   *

নবদ্বীপবন্দম অতি বড় ধন্য ।
যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য ॥
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম ॥

তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম।
কতদিন আছিল সেই বদরিকাশ্রম॥
বামনদেব তথা যশোদা জননী।
সপুত্রে বনাম হবে সর্ব্বলোক জানি॥
শিশুকাল হতে মোর নাহি চিত্ত।
কর্ণে সরস্বতী বৈসে যাহার নিত্য॥
কৃত্তিবাস কবিরাজ করিয়াছি ধ্যান।
বাল্মীকিপুরাণে যেন করি আলোচন॥

শেষ—

সঙ্গতি করিয়া দেহ জিতে কাৰ্য্য নাহি।
বৈকুণ্ঠে যাইতে মোর মনে সুখ চাহি॥

শ্রীরামজোচন্দ্রবস্ত ইতি সন ১১২৫ তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০।)

১৬৩। রামায়ণ। (সুন্দরাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—

হনুমানের মুখে রাম শুনা সীতার কথা।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাম হেট কৈলে মাথা॥

শেষ—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হৈল উত্তরাকাণ্ড॥

ইতি সমাপ্ত সন ১১৮২ সাল তারিখ ১৪ চৈত্র রোজ রবিবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮০০।)

১৬৪। রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ—(বন্দনার অংশে অস্পষ্ট, শিবের বিবাহ হইতে আরম্ভ।) মোট ১৬১ পৃষ্ঠা।

শেষ—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবে রামের চরণে।
উত্তরাকাণ্ড হৈল সাঙ্গ গীত রামায়ণে॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। তারিখ ২ সন ১০০৯ সাল লক্ষ্মীবার। সাকিম খণ্ডঘোষ পাত্রসায়র। পণ্ডিত বহস্ত লিখিতং। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০। মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড হৈতে তিন গুণ বড় এবং ইহার বর্ণনার সহিত বা পাঠের সহিত কোন মুদ্রিত রামায়ণের মিল নাই। পরিষদ্ হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হইবে, এই পুথি তাহার আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।) (সম্প্রতি রামায়ণের আরও কএকখানি প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, বারান্তরে তালিকা মধ্যে উল্লেখ করিব)

১৬৫। রামায়ণ। ভবানীনাথ।

আরম্ভ—(প্রথম দুই পাত নাই তৃতীয়পাতে প্রথম)

দণ্ডচারি মহাযুদ্ধ প্রাচীন ভারতী॥
অপার সমুদ্রে যেন দশরথ গেল।
কাতর হইয়া রাজা রণে ভঙ্গ দিল॥

ভণিতা—

ভবানীনাথের বাণী অমৃত সমান জানি
শুন নর তরিতে শমন।

শেষ—৪৮ পাতের শেষ।

স্বস্ত্র দেব নেত্র এথা চন্দ্রকলা নাহি।
কেবা হরিনিল কন্তা উদ্দেশ না পাই॥
(প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৪০০।)

১৬৬। রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—(প্রথম পাত নাই)

আদেশ পাঞা সেনাপতি ধায়।
মনোহর রথ খান সারথি জোগায়॥

শেষ—(১১ পাতের পর খণ্ডিত)

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় বাল্মীকের মত।
অধ্যাত্ম রামায়ণে লেখা নাহি এত॥
পর্ব্বত আনিয়া বীর শ্রীরামেরে দিল।
কালনেমি বধ আদি সকল কহিল॥

১৬৭। রামায়ণ (অরণ্যকাণ্ড)। ভিকনশুক্র দাস।

আরম্ভ—

দশরথে আদেশি নৃপতি রঘুপতি।
বনেতে চলিল সীতা লক্ষ্মণ সংহতি॥

শেষ—

প্রচণ্ড ধনুক হাথে, বন পথে বিচরিতে,
সুগ্রীব সহিতে দরশন॥

না জানি ভাল না জানি মন্দ না জানি পদযত্ন ।
ভক্তিহীন শক্তিহীন জ্ঞান বিরহিত ।
অশুদ্ধ পাইলে দোষ না লইবে পণ্ডিত ॥

এই পুস্তক লিখিতং শ্রীভিকন শুক্লদাসস্য গুনদে শ্রীকৃপারাম শুক্ল দাসস্ত । তিথি কৃষ্ণপক্ষ বুধবার । ইতি সন ১২০৯ মাহ ১৮ আশ্বিন । (শ্লোক প্রায় ২১০ ।)

১৬৮ । রাবণবধ । দ্বিজ কবিচন্দ্র ।

আরম্ভ—

তবে দোর দিল রাম ধনুকে টঙ্কার ।
লঙ্কা ভুবনে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥

শেষ—

দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে শুন সর্ব্বজন ।
রাবণবধে সীতা লয়া দেশে আগমন ॥

ইতি রাবণবধ সমাপ্ত । পঠনার্থে শ্রীসনাতন পাল সাং কাঁঃমাড় পঃ চন্দ্রকোণা সন ১২৪৩ সাল ২৯ কার্ত্তিক সংক্রান্তি । (শ্লোকসংখ্যা ৫২ ।)

১৬৯ । রাসলীলা । কবিচন্দ্র ।

শেষ—

ত্যজিয়াছি যত তোপাদিবাসনা ।
অনুরাগে নাহি করি অঙ্গের মার্জ্জনা ।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ব্যাসের কৃপায় ।
হরি হরি বল সবে পালা হইল সায় ॥
স্বাক্ষর শ্রীজন্মেজয় আইচ । সন ১২১৬ ।
(শ্লোকসংখ্যা ৫০ ।)

১৭০ । ত্রিপুচরিত্র । বৃন্দাবন দাস ।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন ইত্যাদি ।

গুরু কৃপা হইলে নরের ঘুচয় অজ্ঞান ।
নাশ হয় তিমির সব পায় পরিত্রাণ ॥

শেষ—

যে জনে পড়িবে এহি মানের দায় ।
কুটী নাটি ভজ শ্রীগৌরাঙ্গের পায় ॥
গোবিন্দ ভাবিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ।
ত্রিপুচরিত্র গ্রন্থ হৈল সমাপন ॥

ইতি সন ১২৬৮ তাং ৩ শ্রাবণ । রোজ শনিবারে বেলা ছপ্রহরের সময় পূর্ণ । (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫)

১৭১ । রুক্মিণীহরণ (ভাগবতামৃতে) । কবিচন্দ্র ।

আরম্ভ—

বিদর্ভ নগরে বৈসে ভীষ্ম নরপতি ।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী দেশে দেশে খ্যাতি ॥

শেষ—

রুক্মিণীহরণ যেবা করএ শ্রবণ ।
রিপুজয়ী হইয়া পায় গোবিন্দচরণ ॥
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ।
হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হৈল সায় ॥

পুস্তকমিদং শ্রীনিমাইদাস চন্দ্র সাং পাকসাএর । ([illegible]সংখ্যা প্রায় ২০০ ।)

১৭২ । লক্ষ্মীচরিত্র । ভরতপণ্ডিত ।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্তপতি ।
তদন্তরে প্রণমহ দেবী সরস্বতী ॥

শেষ—

ভরত পণ্ডিত বলে বন্দি নারায়ণ ।
প্রবন্ধ করিয়া বিরচিল লক্ষ্মীপুরাণ ॥

ইতি লক্ষ্মীচরিত্র সমাপ্ত । সন ১২৪৪ সাল জেলা বালেশ্বর সাকিম পটী মতিগঞ্জের বাজারের উত্তরদিগে লিখিতং নক্ষত্রচন্দ্র বসু । তারিখ ৯ পৌষ । (শ্লোকসংখ্যা ৩০০ ।)

১৭৩ । বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান । (নাম অপ্রাপ্ত ।)

আরম্ভ—অথ রাজা বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান ।

রাজা বিক্রমাদিত্য মহাপুণ্যবান ।
প্রজার পালন করেন পুত্রের সমান ॥
কি কহিব মহারাজার সভার কথন ।
নবরত্ন পরিপূর্ণ অতি সুশোভন ॥

শেষ—খণ্ডিত । ১২ পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে ।

১৭৪ । বৃন্দাবনধ্যান । শ্রীকৃষ্ণ দাস ।

আরম্ভ—

শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে গোলকধাম মণিমণ্ডল নানারত্ন নির্ম্মিত ।
নানাকল্পতরু কতশত নানালতাপুষ্প বিকসিত ॥

* * * *

বায়ুকোণ হইতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে॥

শেষ—

শ্রীরূপসনাতন পদে যার আশ।
শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যানলীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনধ্যান সম্পূর্ণ। * * * লিখিতং শ্রীচৌধুরীক্ষেত্র সাং কোঁয়গোটি সন ১০৬৪ সাল তাং ৯ জ্যৈষ্ঠ রোজ শনিবার।

১৭৫। বৈদ্যনাথমঙ্গল। সুন্দর দ্বিজ।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিরঞ্জন।
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় যাহার কারণ॥

ভণিতা—

দ্বিজ হরিহর-সুত মূঢ় অল্পমতি।
স্মরে শঙ্কর পদে নাহিক ভকতি॥
মহামায়ার কৃপা কিছু না হৈল আমারে।
দ্বিজ মণিরাম কহে ভবানী-পয়ারে॥

* * *

বৈদ্যনাথ মঙ্গল লোক শুন এক মনে।
বোলেন সুন্দর দ্বিজ শঙ্কর চরণে॥

শেষ—

বিষম যমের সভা বড়ই দুরন্ত।
পতিতপাবন নামে রাখিবা মহন্ত।

ইতি বৈদ্যনাথমঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীমহেশরাম দাস। সন ১২১০ সাল তাং ২ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৯০০।)

১৭৬। বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকীনন্দন দাস।

আরম্ভ—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈঃ কপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
প্রাণ গোরাচান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
জগত বান্ধিলে গোরা দিয়া প্রেম ফান্দ॥

শেষ—

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোনকালে নাহি পায় কোন সে যন্ত্রণা।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি সেই লভে।
দৈবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥

ইতি বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত সন ১০৪৪ সাল ২ জ্যৈষ্ঠ মাস। আর একখানি পুথির শেষ—পাঠার্থে শ্রীবৃন্দাবন দাস দে। সাক্ষর মিদং শ্রীহরিচরণ দাস। শকাব্দা ১৬৭৭ সন্নাব্দে ১০৬২ শুক্রবার।

১৭৭। বৈষ্ণবামৃত। দীনভক্তিদাস।

আরম্ভ—

(প্রথম ৪ পাত নাই।)
শুন নাম মাহাত্ম্য সকল।
নাম পরম জপ নাম বড়ই ধর্ম্ম।

শেষ—

দীনভক্তিদাসের ভক্তি ভিক্ষার কারণে।
পাইব অচ্যুতপদ শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ পুস্তক সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামগোপালদাস সাকিম বায়ড়া গোরহাটি পুস্তক শ্রীভগীরথ মোদক সাকিম কোতলপুর সন ১০১৮ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র রোজ শনিবার টিকানা শ্রীযুত রাজারাম তেওয়ারির মহলিজ ৬ দণ্ড বেলাতে সম্পূর্ণ হইল। (শ্লোকসংখ্যা ১৪৫০।)

১৭৮। বৈষ্ণবামৃত। মুকুন্দ দাস।

আরম্ভ—

একচিত্ত হঞা কথা শুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কথা হৈল যেমনে॥

শেষ—

শুন শুন বৈষ্ণবামৃত হইবে আনন্দ।
এক মন করিয়া কহে দাস মুকুন্দ॥

ইতি বৈষ্ণবামৃত সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮১ সাল তারিখ ৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা ১৪৪।)

১৭৯। শনির পাঁচালী। (মুচুকুন্দপুরাণোক্ত)

আরম্ভ—

সরস্বতীর পদযুগ করিয়া বন্দন।
ভক্তি করি বন্দিলাম যত দেবগণ॥

শেষ—

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কথা করিয়া সাধান।
শনির পাঁচালীকথা হইল সমাধান॥
গুরু শনিরবিসুত ছায়ার নন্দন।
এ অধীনে করিলাম তোমাকে বন্দন॥

শনৈশ্চর-পাঁচালী সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮০ সাল তারিখ ২০ বৈশাখ।

১৮০। শিবরামের যুদ্ধ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—শিবরামের যুদ্ধ লিখ্যতে। রামং লক্ষণপিতাদি

নানা দুঃখ পায়্যা তবে শ্রীরাম লক্ষণ।
পম্পানদীর কূলেতে বসিল্যা দুইজন॥

ভণিতা—

সম্মুখে দেখিতে পাইল শিবের মধুবন।
রামায়ণের রামলীলা কবিচন্দ্রে গান॥

শেষ—নাই। (কেবল প্রথম ৯ পাত পাওয়া গিয়াছে।)

১৮১। শিবসংকীর্ত্তন। দ্বিজ রামেশ্বর।

আরম্ভ—অথ মৎস্য ধরার পালা লিখ্যতে।

পার্ব্বতী পদ্মারে বলে পাঠাইলাম জাত।
কি হেতু না হৈল কার্য্য না আইল নাথ॥

ভণিতা—

অজিতসিংহের সুত, যশোবন্ত নরনাথ,
রাজা রামসিংহের নন্দন।
তস্য পুত্র রামেশ্বর, তদাশ্রয় করি ভর,
বিরচিল শিব-সংকীর্ত্তন॥

শেষ—

দ্বিজ রামেশ্বরে গায় ভবানী সহায়।
এতদূরে মৎস্যধরা পালা হৈল সায়॥
ত্যাতৃকোটা দেহ লোক মনে প্রীত হয়্যা।
কনিষ্ঠে আশীষ কর খাস্ত দুর্গা দিয়া॥

ইতি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীজদয়নাথ দে সাকিম শিবরামপুর। সন ১১৭০ সাল ১১ পৌষ।

১৮২। শিবি উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—(১ম পাতা নাই)

শেষ—

শিবিরাজার উপাখ্যান যেইজন শুনে।
বিপদে হয় পার শুনে নারায়ণে॥
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সভে পালা হইল সায়॥

ইতি শিবিরাজার উপাখ্যান সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনবীনমোহন সিপাই সাং গড়ের ডাঙ্গা। খরিদার শ্রীগোপালচন্দ্র গড়েল সাং গড়ের ডাঙ্গা। সন ১২৪৭ সাল তারিখ ১ আশ্বিন। (শ্লোকসংখ্যা ১৩০।)

১৮৩। শীতলামঙ্গল। নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভ—

রঙ্গ রসে করেন স্থিতি রোগপুরপাটনে।
বসন্তকুমারী বস্তা ভাবে মনে মনে॥
ত্রণব্যাধি জ্বালে বেড়াই চৌদ্দভুবন।
সত্যত্রেতাদি নামপূজা শান্তি স্বস্ত্যয়ন॥

পরিচয়—

সৌতি সম সর্ব্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানীমিশ্র,
তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব,
যার সখা প্রভু দামোদর॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাগ্রজ,
শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাতঃ, নিত্যানন্দ নামযুত,
গাহে ভেবে শীতলাচরণ॥

শেষ—

নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুকর।
আজ্ঞামতে পূর্ণানন্দে হরি বল নর॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত লিখিতং শ্রীরামধন চোঙ্গদা সাং বেণুর সন ১২১৬ সাল তারিখ ২২ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০।)

১৮৪। শুকপরীক্ষিৎসংবাদ। হরিচরণ।

বনিব অগ্রনা-গন, অসীম যাহার গুণ,
যাঁর অনন্ত বিক্রম নাম হয়।
কালক্রমে শিশুকালে, দিবাকর ধরিল বলে,
যেন গরাসিল অর্দ্ধতনু॥

ভণিতা—

দ্বিজ মিশ্রী রমাকান্ত, কামদেব মিশ্রীতাত,
রমাকান্তসুত দাশরথী।

মুনিরাম তার সুত, কৃষ্ণ ভজে অবিরত,
সদাকাল নারায়ণে মতি॥
তাহার অনুজ ভাই, অবিরত গুণ গাই,
কৃষ্ণের চরণ অভিলাষী।
ভাবিয়া গুরুর পায়, শ্রীহরিচরণ গায়,
ঘরে বাহিরে বনে বসি॥
(৯ পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে।)

১৮৫। সত্যনারায়ণ। ফকিররাম দাস।

আরম্ভ—

করপুট করিয়া বন্দিব গজাননে।
পাণিপুটে প্রণাম পার্ব্বতী-পঞ্চাননে॥

মধ্য—

দেখ থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো।
জেহি রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো॥

ভণিতা—

ফকীররাম কবিরাজ কয়।
যাহা দেখি বড় মঙ্গলময়॥

শেষ—

ইতি সন হাজার সতর জ্যৈষ্ঠ মাসে।
সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে॥

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণের পুথি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন পাল সাকিম পাতসাএর গোপীনাথপুর। ইতি সন হাজার সন ১০৯৫ সাল তারিখ ২৮ শ্রাবণ সোমবার তিথি চতুর্থী সায় পঞ্চমী প্রবেশে এমন বেলে তিন প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল। (শ্লোক ৮৫০।)

১৮৬। সত্যনারায়ণ। নরহরি।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই; ২য় পাত হইতে)

কাঞ্চননগরে সদানন্দ নামে সাধু।
সুতাগুত নাহি নিরানন্দ সহ বধূ॥
পীরপূজা ফল প্রভৃতি শুনিয়া শ্রবণে।
যশ হেতু আরাধয়ে পীর নারায়ণে॥

শেষ—

পূজা সাঙ্গ হ'ল ভাই কহে নরহরি।
আমীন্ আমীন্ বলি সভে বল হরি॥
(শ্লোকসংখ্যা ১০৫।)

১৮৭। সত্যনারায়ণ। দ্বিজ রামকৃষ্ণ।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই, ২য় পাত হইতে)

কলির মোচন যদি কৈল নারায়ণ।
জোড়হাতে জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন॥

ভণিতা—

দ্বিজ রামকৃষ্ণ-বাণী, শুন সাধুনন্দিনী,
সত্যদেব কর আরাধন॥

শেষ—

সোয়ার ঘোড়ার পরে জিন।
সত্যনারায়ণ আসিলেন পূজার দিন॥
আসিলেন সত্যদেব বসিলেন খাটে।
সত্যনারায়ণের আজ্ঞা হৈল প্রসাদ হাটে হাটে বাটে॥

ইতি সত্যদেব ঠাকুরের পাঁচালী সমাপ্ত॥ *॥ ইতি সন ১১৪১ তাং ২৫ ভাদ্র। শক ১৬০৪ রোজ শনিবার।

১৮৮। সত্যনারায়ণ। দ্বিজ রামেশ্বর।

আরম্ভ—

সত্য সত্য সত্য পর সর্ব্বসিদ্ধি দাতা।
বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ণিতে ব্রতকথা॥

শেষ—

গ্রন্থ সাঙ্গ হইল রচিল দ্বিজরাম।
সবে হরি বল কর মজুরা সেলাম॥

এই পুস্তক সমাপ্ত হইল সন ১২১০ সাল তাং ৬ই ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

১৮৯। সত্যনারায়ণ। (বা গোবিন্দবিজয়) দ্বিজ বিশ্বেশ্বর।

আরম্ভ—

প্রণমহ লক্ষ্মীপতি গরুড়বাহন।
বৃষভারোহণে বন্দো দেব পঞ্চানন॥
প্রণমহ নারায়ণ সত্য ভগবান্।
দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডে হয় পরিত্রাণ॥

শেষ—

সমাপ্ত হইল কথা বল হরি হরি।
সত্যনারায়ণ পূজা অবিলম্ব করি॥

ইতি সত্যনারায়ণের পাঁচালি সমাপ্ত। শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৭১ সন ১১৫১ তারিখ ১৭ বৈশাখ শনিবার মোকাম পরগণে হয়নগর মৌজে দেবগ্রাম শ্রীরাঘবেন্দ্ররায়স্য সাক্ষরমিদং পুস্তকং। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৬০।)

১৯০। সত্যপীরকথা। শঙ্করাচার্য্য।

আরম্ভ নাই। (খণ্ডিত)

মধ্য—

এমত প্রকারে আমি করিব নিরূপী।
প্রমাণ মাথার কি তুমি ঠাকুরাণী॥

শেষ—

আমিন আমিন বলিয়া সভে সার কার্য্য।
আজ্ঞায় রচিল ইহা শঙ্কর আচার্য্য॥
শুনিলে সে অবশ্য হয় সিদ্ধি কার্য্য।
ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ সুখে করে রাজ্য॥

ইতি সত্যপীরকথা হইল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীজগন্নাথ বণিক॥ পাঠক শ্রীযযাতিরাম শর্ম্মা সন্ধ্যাকালে সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১০৬২ সাল তারিখ ২০ আষাঢ়।

১৯১। সদ্ভাবচন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

রাধাকৃষ্ণ প্রণিপাত জীবনে মরণে।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই পাইব সর্ব্বজনে॥

ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দাস অনুদাস।
গাহিল শ্রীনরোত্তম সেবা অভিলাষ॥

শেষ—১৬ পাতার পর আর পাতা নাই। (প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৩২)

১৯২। সনাতনগোস্বামীর সূচক। রাধাবল্লভ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞি,
বাদশার উজীর হৈয়াছিল।
শ্রীরূপের পত্র পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল॥

শেষ—

স্বপ্নবস্ত্র কাজে পায়, ভূমির শয়ন তায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
কহে রাধাবল্লভ দাস, মনে এই অভিলাষ,
কত দিনে হব তার দাস॥

ইতি সনাতন গোস্বামীর সূচক সমাপ্ত। সন ১২০৭ সাল তাং ১৮ ভাদ্র॥ (শ্লোক ৩২)

১৯৩। সাধন কথা।

আরম্ভ—শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের পৃথ্বী আদি পঞ্চভূতের অচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া, পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

শেষ—পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ কহিলেন তোমার সুজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম লক্ষণায় রসময়ী ভক্তিতে বিরাজ কর। ইতি বেদাদি যোগশাস্ত্রের অনুসারে নিষ্কামধর্ম্মের জ্ঞানাদিসাধন কথা সমাপ্ত। সাক্ষরকৃত বেদাদি শাস্ত্র শ্রীগোলকচন্দ্র কর নরাধম নিজগ্রন্থ হরিদাস ওজোইদাস সাকিম প্রয়াগন জগত মোজে মৌসায় মুক্তাশয়ে মুশয় সঙ্গরা থানায় মুক বাসাতে লেখকের। ইতি সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন।

১৯৪। সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরেত্যাদি॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

শেষ—

শ্রীরূপ পাদপদ্ম করি আশ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা। গ্রন্থ সংপূর্ণ লিখিতং শ্রীপিয়ারী দাস নাড়া সাং পাত্রসায়েরে। (শ্লোকসং ১৮২)

—

১৯৫। সাধ্যবস্তু সাধন।

আরম্ভ—শ্রীজীবগোস্বামির বরণি টীকা অনুসারে শ্রীরূপ সনাতনোবাচ।

আট বৎসর রূপ আগেলা বৃন্দাবনে।
সনাতন ধান এথা স্থণ নাহি মনে॥
রাত্রি দিবা ভাবে রূপ গৌরাঙ্গ চরণ।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন॥

শেষ—সাধ্যবস্তুসাধন বিনা আর নাহি হয়।
সাধ্যসাধন মত এইত নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন এই কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥

ইতি সাক্ষর মালিক শ্রীকিশোরদাস সাকিম তৈয়াদিগা মৌজে কুহারপাড়া ইতি সন ১২৫২ সাল। (শ্লোক সংখ্যা ৩১২।)

১৯৬। সাধ্যসাধনতত্ত্ব।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে শ্রীরূপং শ্রীসনাতনং *
তব পাদরজো মহ্যং দেহি তো কৃপয়া প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু রূপসনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে ও পাদ সেবন॥

মধ্য—দ্বারিকাপুরীতে কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার।
ঐশী ভক্তি প্রাপ্তি স্থান কহে গ্রন্থকার॥

শেষ—(পাঁচপাতার পর খণ্ডিত।)

১৯৭। সারণবিরাট। সারণ কবি।

আরম্ভ—

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বাদীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে॥
জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পিতামহগণ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহেন লুকাইয়া।
এক সম্বৎসর থাকে অজ্ঞাত হইয়া॥

শেষ—পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
সারদাকে সেবিয়া সারণ করিগান॥
দ্বিবা স্থলে শুনে সব পাপের মোচন।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে উৎকল ব্রাহ্মণ॥

ইতি সারণ বিরাট সমাপ্ত। সন ১২৬৮ সাল তাঃ ৭ আশ্বিন রোজ শুক্রবার। (শ্লোকসংখ্যা ৩০৫০।)

১৯৮। সারাৎসারকারিকা। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—একদিন ভূর্গাশিন একত্রে বসিয়া।
আনন্দে মগ্নলোকে বিহ্বল হইয়া॥

শেষ—নিভৃতে বসিয়া ইহা লেখেন গণেশে।
সেই অনুসারে লেখেন নরোত্তম দাসে॥

ইতি সারাৎসারকারিকা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৬৬ মাহ ৮ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা ১৪০।)

১৯৯। সিদ্ধসার। গোপীনাথ দাস।

আরম্ভ—জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

ভণিতা—এই মোর অভিলাষ। কহে গোপীনাথ দাস॥

শেষ—এই মনোনীত গ্রন্থ হৈল সর্ব্ব সার।
আপনা নিস্তারের কিছু না দেখি উপায়॥
আপন ইচ্ছায় জীব নানাবাঞ্ছা করে।
কার্য্য নাহি সিদ্ধ হয় ভ্রম করি মরে॥

ইতি সিদ্ধসার মনোনীত গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সন ১২৫৫ সাল। তাঃ ২৬ পৌষ রোজ সোমবার। ইতি পঠনার্থে শ্রীগোপাল কলু সাং পীরনিং। (শ্লোকসংখ্যা ১৮০।)

২০০। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা। রামচন্দ্র দাস।

আরম্ভ—বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাকলুষখণ্ডনম্।
ভক্তিপ্রকাশকং দেবং নিজপ্রেমপ্রদায়কং॥
জয় জয় কৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু করুণা-হৃদয়॥
জয় জয় নরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাস।
যাহার চরণে সদা করি মুক্তি আশ॥
ব্রজে কৃষ্ণের নিত্য লীলা গোসাঞি সকল।
লিখিয়াছে স্থানে স্থানে বুঝিতে বিরল॥
একত্র করিয়া বুঝিবারে হৈল মন।
অতএব সেই সব করি উদ্ধারণ॥ তথা।
পূর্ব্বে ভ্রম ভাবুকে আছয়ে লিখন।
অতি গূঢ় লাগি করি এথানে বর্ণন॥

শেষ—সভার চরণ পদ্ম হৃদয়ে অধিকা।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা কহে রামচন্দ্রদাস॥

ইতি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায়াং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীসুত কথনোনাম পঞ্চাধ্যায়ঃ। সন ১০৮২ সাল তাং ১১ মাঘ। (শ্লোকসংখ্যা ২৬০।)

২০১। সিদ্ধিনাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আরম্ভ—জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। ইত্যাদি
সভাকার পূর্ব্বনাম কহি শুনি সাবধানে।
সখাসখী পিতামাতা আর ভক্তগণে॥
শেষ—মদনলালসা সখী কহি তার নাম।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত সেই করিল বিধান॥
এহি ত হইল সব যূথের নিরূপণ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন রহ অনুক্ষণ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত সিদ্ধিনাম সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীপ্রতাপনারায়ণদত্তস্য সাং সোপুরা। শকাব্দা ১৭১৮ সন ১২০৩ সাল তারিখ ১৩ আশ্বিন সোমবার তিথি দশমী। (শ্লোকসংখ্যা ১২০।)

২০২। সীতাহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—(প্রথম শ্লোক অস্পষ্ট।)
সীতার প্রাণ রঘুনাথ জীবের জীবন॥
শেষ—শ্রীরামমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে সীতাহরণ পালা হৈল সায়॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার॥

ইতি সীতাহরণ পালা সংপূর্ণ। ইতি সন ১২১৬ সাল তারিখ ১৬ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা ৮০।)

২০৩। সুদামাচরিত্র। বিপ্র পরশুরাম।

আরম্ভ—সুদামাচরিত লিখ্যতে॥ * ॥
রাজা পরীক্ষিতে যদি ব্রহ্মশাপ হইল।
গঙ্গার তীরেতে গিয়া মঞ্চায় বসিল॥
ভণিতা—এ ভব সংসারে প্রভু মোরে কর পার।
দ্বিজ পরশুরামে গান কৃষ্ণসখা সার॥
শেষ—এতদূরে সুদামাচরিত হইল সায়।
হরি হরি বল সবে অমর সভায়॥ * ॥

অক্ষর মিদং শ্রীবলরাম চৌধুরী পাঠক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সাং মাজুকুরি পরগণা বারহাজারী তথানী শ্রীশ্রী৺ পরিবার॥ ইতি সন ১২৩১ সাল তারিখ ২২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসে সম্পূর্ণ হইল॥ (শ্লোকসংখ্যা ২০০)

২০৪। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র দাস।

আরম্ভ,—(১ম পাত নাই)
শেষ—কেহ না করিহ রোষ, ক্ষমিহ সকল দোষ,
যেন কহি বালকের বশে।
শুন হে সাধক ভাই, স্মরণ-দর্পণ এই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাসে॥

ইতি স্মরণদর্পণ সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮৩ সাল তাং ৪ চৈত্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

২০৫। স্মরণমঙ্গল। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই)
শেষ—শ্রীরূপ চরণপদ্ম করি আরাধন।
সংক্ষেপে কহিনু অষ্টকালের আখ্যান॥
শ্রীরূপ চরণপদ্ম করি সতে আশ।
স্মরণমঙ্গল কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি স্মরণমঙ্গল আখ্যান সমাপ্ত। শকাব্দা ১৯৫০ সন ১১০৬ তারিখ ২৭ মাঘ। সাক্ষর শ্রীআনন্দীরাম দাসকস্য। নিবাস শ্রীনগর। পরগণে বানপুর। রোজ বৃহস্পতিবার।

২০৬। স্মরণমঙ্গলসূত্র। গিরিধর দাস।

আরম্ভ—জয় জয় গুরুদেব চরণারবিন্দ।
নিরবধি ঝরে যাহে কৃপা মকরন্দ॥
মধ্য—প্রাতঃকালে উঠি রাধিকা সখী সঙ্গে।
দন্তধাবন স্নান ভূষণ পরি রঙ্গে॥
শেষ—অতি দীন অতি হীন গিরিধর দাস।
স্মরণ-মঙ্গলসূত্র করিল প্রকাশ॥

২০৭। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীগুরুদেব সিদ্ধি খাহা। মনস্থান মহত্তর বৃন্দাবন। তাহার সিদ্ধি নাম। সার প্রতিজ্ঞা।

নির্ণয় পায়। বিলাতের ন্যায় আনন্দ তত্ত্ব। গন্ধর্বের ন্যায় অঙ্গ-ঢঙ্গ।

শেষ—দ্বিজগণের আজ্ঞা আর্শে রাধাকৃষ্ণলীলা।

মূর্খে গৌড়বাসী লোক তাহা আচরিলা॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।

স্বরূপ বর্ণন এই কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি স্বরূপ-বর্ণন সম্পূর্ণ। সন ১০৮১ সাল তাং ১৩ অগ্রহায়ণ রোজ রবিবার। পুস্তক শ্রীপ্রসাদ দে দক্ষিণপাড়া।

২০৮। হংসদূত। নরসিংহ দাস।

আরম্ভ—প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।

ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ॥

গোপীর বিরহকথা না যায় কথন।

শ্লোক ছন্দে দাস গোসাঞি করিলা রচন॥

শ্লোক ছন্দে কৈলে পুথি বুঝএ সুজনে।

মূর্খে ইহার কিছু না জানে কহনে॥

শ্লোক ছন্দে শুনি লোক হৈল প্রীতি হাস।

হংসদূত কথা কহে নরসিংহ দাস॥

শেষ—প্রধান গোপীর ভাব সভাতে উজ্জ্বল।

ইহাতে বঞ্চিত নরসিংহ যে কেবল॥

ইতি হংসদূত কথা সমাপ্ত। লিখিত শ্রীমথুরামোহন দাস বৈরাগী পাঠক শ্রীজগন্নাথ দে ইতি সন ১২০১ সাল তারিখ ১০ই পৌষ রোজ বুধবার।

২০৯। হংসদূত। দাস গোস্বামী।

আরম্ভ—(১ম পাতা নাই।)

শেষ—ইহার সকল হয় তাহেতে গমন।

হংসদূত ইতিহাস দাস-বিরচন॥

ইতি হংসদূতগোপিকাসংবাদঃ সম্পূর্ণঃ। লিখিতং শ্রীসখোরাম মুন্সী সাকিম জগন্নাথবাটী পরগণে সাহাপুর সরকার মান্দারণ সন ১০৭৫ তারিখ ৩ মাঘ শনিবার গোং কৃষ্ণ দ্বিতীয়া দেড় প্রহরের মধ্যে গ্রন্থ-সমাপন হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০।)

২১০। হরপার্ব্বতী বিবাহ। তিলকচন্দ্র।

আরম্ভ—তারপর নিবেদন করি এ সভাতে।

হরপার্ব্বতীর বিভা হইল যেন মতে॥

শেষ—ভাবি ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মদ্বন্দ্ব।

পুরাণের সূত্র গেয়ে লেখে তিলকচন্দ্র॥

ইতি বিবাহ সমাপ্ত। তারিখ ৩০ আষাঢ় রোজ মঙ্গলবার তিথি একাদশী সন ১১০৭।

২১১। হরিনামকবচ। গোপীকৃষ্ণ দাস।

আরম্ভ—জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

জয় জয় অদ্বৈত জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

চৈতন্য গোসাঞি বোলেন শুন শচীমাতা।

অবধূত নিতাইর আমি বৈস যাইয়া বার্ত্তা॥

শেষ—অবৈষ্ণবারে কদাচিৎ না করিও প্রকাশ।

নিবেদন করিল এ গোপীকৃষ্ণদাস॥

ইতি হরিনামকবচ সমাপ্ত ইতি সন ১১৭৫ সাল মাহ শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা ১৫৪।)

২১২। হরিশ্চন্দ্রের পালা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্বকথন।

কহ কহ কৃষ্ণকথা মুনি করিয়া শ্রবণ॥

শেষ—পাইল কৃষ্ণের পদপল্লব উদয়।

হরিশ্চন্দ্র সম দাতা কেবা কোথা হয়॥

রাজারে উদ্ধারিয়া গেল নিজ স্থানে।

ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে॥

ইতি হরিশ্চন্দ্রের পালা সমাপ্ত। ইতি সন ১২০০ সাল ১৮ মাঘ রোজ বুধবার বেলা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপীতাম্বর দাস গন্ধবণিক সাং পাড়-সাওর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২১৩। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—অতঃপর শুন সবে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।

কেবা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান॥

ভণিতা—সঙ্কটে পড়িয়া কোণে আছে বড় ভয়।

কাতর হইয়া ছন্দে কবিচন্দ্রে কয়॥ (শ্লোক ১৭০।)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ৪ঠা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭।) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল।

অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি), কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাবু শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল—হরিনামের শব্দতত্ত্ব।

(খ) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—খোদিত জৈনলিপি।

(গ) „ রসিকচন্দ্র বসু—মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়।

(ঘ) „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত—সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল।

৪। বিবিধ বিষয়।

কার্য্যারম্ভের সময় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকাতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে) সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইয়ে অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত সভ্য মহাশয়গণ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং নূতন সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।	শ্রীযুক্ত নরদেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
২।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ পণ্ডিত রাধাচরণ গোস্বামী।
৩।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ [illegible] বসু।	„ কালীনাথ দাস।
৪।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৫।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ সতীশচন্দ্র রায় এম এ।
৬।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ।
৭।	„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ কালীময় ঘটক।

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "হরিনাম-শব্দতত্ত্ব" বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইল। পাঠান্তে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ লেখক হরিশব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ে কল্পনা করিয়াছেন। হরিশব্দ প্রাচীন। কলিসন্তরণ-উপনিষদে "হরের্নাম" ইত্যাদি শ্লোক দেখা যায়। লেখক বঙ্কহরণের বিষয় যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝেন নাই।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে ধর্ম্মালোচনা সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, সোমলতা ভারতে কোথাও পাওয়া যায় না। সোম পারসিকদিগের হোম।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে, বীরেশ্বর বাবু যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহার অনুমোদন করেন, এরূপ প্রবন্ধ আলোচিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, হরিনাম-শব্দতত্ত্ব মাত্র আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, বস্ত্রহরণের কথাটা না বলিলে ভাল হইত। তাঁহার মতে প্রবন্ধে শব্দতত্ত্ব মাত্র আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক আভিধানিক বৈয়াকরণের ভাবে গবেষণা সহকারে হরিনামের শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। হরি শব্দ, কালে কত অর্থান্তরিত হইয়া ঈশ্বর-বাচক হইয়াছে

তাহারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মালোচনা নহে। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, অনেকের বিশ্বাস যে, হরিশব্দ অনাদি, অতএব তাঁহার মতে হরিশব্দের তত্ত্বালোচনা সঙ্গত নহে।

স্থির হইল যে, যজ্ঞহবনের প্রসঙ্গ বাদে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, সোম এখন পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে সোমের পরিবর্ত্তে পুঁইশাক ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রদেশে অন্য পদার্থেরও ব্যবহার হয়। পার্সীরাও সোমযাগ করে। তাহারা সোমকে হোম বলে। সোমের এখন তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। Hillebrandt এ বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সোম হয়ত "চা" গুল্ম। "চা"র মত সোমও "ফূর্ত্তি" উৎপন্ন করিত।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বরদার মহারাজের সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতম অধ্যাপক মহাশয়ের মুখে সোম ও পুতিকা বিষয়ক এই শ্রুতিটী শুনিয়াছেন, "যদি সোমং ন বিন্দেত তর্হি পুতিকামালভেয়ম্"।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে যে সোমরসের উল্লেখ আছে, তাহা সোমের মত খাইতে বিস্বাদ।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, সোম "হাড়ভাঙ্গা" জাতীয় উদ্ভিদ।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধে, যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "খোদিত জৈনলিপি" বিষয়ক প্রবন্ধের সারাংশ সভায় বিবৃত করিলেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। তজ্জন্য শাস্ত্রী মহাশয় সভার ধন্যবাদার্হ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার প্রবন্ধ অতি সারগর্ভ হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের উন্নতি কল্পে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাঁহার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন।

স্থির হইল যে প্রবন্ধটী পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

অন্যান্য প্রবন্ধের আলোচনা স্থগিত রহিল।

৪। অতঃপর গ্রন্থরক্ষক মহাশয়, পরিষদকে যাঁহারা গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে গ্রন্থোপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি এ—১ রৈবতক, ২ কুরুক্ষেত্র, ৩ অবকাশ-রঞ্জিনী ১ম ও ২য় খণ্ড, ৪ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ রঙ্গমতী, ৭ খৃষ্ট, ৮ পলাশীর যুদ্ধ, ৯ ক্লিওপেট্রা, ১০ অমিতাভ, ১১ প্রভাস।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১ পঞ্চভূত, ২ কাব্যগ্রন্থাবলী।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল—১ উষা।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঘোষাল—১ প্রবাদ সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ—১ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ।

অতঃপর সভাপতি-মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য সাঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ২৯শে কার্ত্তিক।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৯শে কার্ত্তিক (১৪ই নবেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাণ-চন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ দাস, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত ব্যোম-কেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু—"মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়।"

(খ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত—"ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল।"

৪। ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

৫। প্রাচীন শব্দ সংগ্রহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রস্তাব।

৬। বিবিধ বিষয়।

১। সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তি গুরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
২।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু।	„ কুঞ্জলাল রায়।	„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
৩।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল	„ ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
৪।	„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল।	„ [illegible] রক্ষিত।	„ ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টো।
৫।	„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ দুর্গাদাস দে।

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের "কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়" প্রবন্ধ পঠিত হইল।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় "জগন্নাথ-বিজয়ের" প্রাচীনতা বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন মনে হয় না। কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ নাই বলিয়াই যে কবি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর উড়িয়াভাষায় রচিত বিস্তর জগন্নাথ মাহাত্ম্যগ্রন্থেও তাঁহার নামোল্লেখ নাই অথচ উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব দেবতা বলিয়া পূজিত।

লেখক কবির জাতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বক্তার নিকট জগন্নাথমঙ্গল নামে মুকুন্দরচিত দুইখানি পুঁথি আছে। তাহাতে "দ্বিজ" মুকুন্দের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

লেখক ভাষার প্রমাণে মুকুন্দ কবিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোক স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থির করিবার কারণ যথেষ্ট মনে হয় না। বক্তার নিকট জগন্নাথ-বিজয়ের একখানি ও জগন্নাথ মঙ্গলের যে দুইখানি পুঁথি আছে, ঐ সকল পুঁথির ভাষা রাঢ়দেশীয়, ময়মনসিংহের ভাষা নহে। এরূপ হইবার কারণ এই যে পুঁথি নকল করিবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের পুঁথি-লেখক তত্তৎ প্রদেশের ভাষা ও শব্দের সমাবেশ করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত কৃত্তিবাস ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গলের প্রকাশখণ্ডের সহিত মুকুন্দের পুঁথির অনেক স্থানে অবিকল মিল আছে। জয়ানন্দ যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার তাহা ভাবিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মতে চণ্ডীদাস মুকুন্দের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। চৈতন্যদেবেরও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয় তিনি অন্যত্র প্রমাণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শরীরে লীন হইয়াছিলেন, সেইজন্য বৈষ্ণবেরা জগন্নাথদেবকে মহাপ্রভু বলেন। জগন্নাথবিজয়-গ্রন্থে দেখা যায়, মুকুন্দও জগন্নাথকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবেরা অবতার বলেন না, ভক্তরূপ বলেন।

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, ভাষা অমার্জ্জিত হইলেই যে কাব্য প্রাচীন হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। চণ্ডীদাসের হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে জানা যায় যে, তাঁহার ভাষা প্রবন্ধ-লেখক যতটা মনে করিয়াছেন, ততটা মার্জ্জিত নহে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, অনেকের মতে জগন্নাথ বৌদ্ধাবতার। মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়ের যে পুঁথি Asiatic Societyতে আছে, তাহাতে এই দুই ছত্র দেখা যায়—

"তবে শ্রীজগন্নাথ বৌদ্ধরূপ ধরে। প্রবেশ করিলা হরি দেউল ভিতরে॥
লুকাইয়া যোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি। দেউল গঠিয়া রাজা গেল ব্রহ্মপুরী॥"

আর এক কথা। আমরা জানি যে, ধর্ম্মঠাকুরের বাহন উলুক। ধর্ম্মকে অনাদি বলে। এই গ্রন্থেও উলুকের উল্লেখ আছে। উলুক রাজাকে কূর্ম্মের নিকট পাঠাইল। ধর্ম্ম প্রাচীন অক্ষরে যেরূপ লেখা হইত, তাহাতে অনায়াসে লেখকের হস্তে রূপান্তরিত হইয়া কূর্ম্ম হইতে পারে। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদসহ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, কবি মুকুন্দের উপর চুরি অপরাধ দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, চোর ডাকাতির উল্লেখ হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ আইন আকবরি Alberuniর গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ চুরি। কালিকামঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রাহাজানি করিয়াছেন।

স্থির হইল যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

(খ) অতঃপর সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল প্রবন্ধ পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মতে প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়া উচিত। ইহাতে অনেক নূতন কথা জানিবার আছে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, পঠিত প্রবন্ধে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক

সৃষ্টির কথা আছে। অন্য ধর্ম্মমঙ্গলে—ধর্ম্মকে আদ্য বলিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মকে ব্রহ্মার সহিত এক করা হইয়াছে। তাঁহার শক্তিকে আদ্যা বলা হইয়াছে।

ভারতে নাথ বলিয়া জন কয়েক জন্মাইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ইত্যাদি। ইহাদিগকে বৌদ্ধেরা বৌদ্ধ বলিয়া পূজা করে। হিন্দুরা শৈব বলিয়া পূজা করে। মানাদে একটা "জাত" হয়। সেখানে একজন যোগীরাজ উপস্থিত হয়েন। প্রস্তোক্ত মহানাদ এই মানাদ। যোগীরাজ এই মীননাথ। ভারত ইতিহাসের পক্ষে ঐ নাথদিগের ইতিবৃত্ত বড় আবশ্যক। "কানুপা," "হাড়িপা" বোধ হয় তৈব্বতীয় ভাষা জাত। তিব্বতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্বয়ম্ভূপুরাণে "পা" অন্ত শব্দ আছে।

স্থির হইল যে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

৪। চতুর্থ আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল।

৫। সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রাচীন শব্দ-সমিতি নিয়োগ বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে সমিতির সম্পাদক ও সদস্যগণের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

৬। (ক) গ্রন্থরক্ষক মহাশয় পরিষৎ গ্রন্থালয়ের জন্য গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে গ্রন্থোপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্তগ্রন্থের নাম লিখিত হইল।

১। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "হিন্দুশাস্ত্র" ২য় খণ্ড।

২। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—(১) "বিদ্যাসাগর" জীবনচরিত, (২) ইংরাজের জয়। (৩) শকুন্তলা রহস্য।

৩। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল—(ক) "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" (খ) "জ্ঞানদর্পণ" ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

৪। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—"Dramatic Works I. II.

৫। „ রসময় সাহা—"পুষ্পাঞ্জলি"।

৬। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত—(১) ফুল, (২) পারিজাতমালা, (৩) হেমহার, (৪) মোহনমালা, (৫) একটী চিত্র।

৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

৮। „ কিরণচন্দ্র দত্ত—(১) কবি কাননিকা।

৯। „ বসন্তকুমার মুখোপা[illegible]—(১) পদ্মালয়া।

১০। „ রসিকচন্দ্র বসু—(১) ললিতগাথা।

(খ) সম্পাদক পরিষদের অন্যতম সভ্য কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন গুপ্তের মৃত্যুর উল্লেখ করিলে সভা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

(গ) পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় সভায় গোচর করিলেন যে, অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য স্বয়ং ২০৲ কুড়ি টাকা এবং জয়দেবপুরাধিপতির নিকট হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা অর্থ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পরিষদ্ তাঁহাকে ও জয়দেবপুরাধিপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ১৪ই অগ্রহায়ণ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ (১৮৯৭। ২৮শে নবেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, (সহ-সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক "উপসর্গ-বিচার" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৪। ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ-সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পরে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক	সমর্থকের নাম	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীযুক্ত গৌরেশ্বর পাঁড়ে	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ রায় কবিরত্ন।
২।	" গিরিশচন্দ্র দত্ত	" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	" রামগোপাল সেনগুপ্ত।
৩।	" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	" প্রমথনাথ মিত্র	" বেণীমাধব কাব্যতীর্থ।
৪।	" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	" বিহারীলাল সরকার	" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
৫।	" শরচ্চন্দ্র সরকার	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	" শিবনাথ বসু।
৬।	" শরচ্চন্দ্র সরকার	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	" ত্রৈলোক্যমোহন রায়চৌধুরী।
৭।	" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	" হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ।
৮।	" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	" পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ
৯।	" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	" কুঞ্জবিহারী বসু	" মহেন্দ্রনাথ হালদার।

৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বরচিত "উপসর্গ-বিচার" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় "উপসর্গ-বিচার" উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার [illegible]ছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। চণ্ডীবাবু তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, প্রবন্ধটী পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। শীঘ্র যেন প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, এই তাঁহার অনুরোধ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতীব সুন্দর হইয়াছে। প্রবন্ধটী "শব্দতত্ত্ব" বিষয়ক, কিন্তু ভাষা কাব্যোপযোগী। প্রবন্ধটী অশেষ চিন্তার ফল। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় অতি গভীর তত্ত্ব সকল অতি বিশদ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। প্রবন্ধোক্ত তত্ত্ব সকলে বিশেষ ভাবিবার অনেক কথা আছে। ইহা দ্বারা নূতন শব্দ-প্রণয়নে বিশেষ সুবিধা হইবে। দুই এক স্থলে মতভেদ আছে, অনেক স্থলে উপসর্গের প্রয়োগ স্থলে প্রকৃত অর্থের আশ পাশ দিয়া যাওয়া হইয়াছে। কারণ প্রয়োগ স্থলে লোকে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রয়োগ করেন। বাড়ুয্যে, চাটুয্যে প্রভৃতি শব্দোৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ আছে। পালা হয়ত, পাল্ ধাতু হইতে, পর্য্যায় হইতে হয়ত নহে। "র" র আসা যাওয়া বুঝা ভার। যেমন ক্রোশ ও কোশ। বড়ালের "ল" কোথা হইতে আসিল? বটাচার্য্য হইতে অথবা বটব্যাল হইতে? জ্ঞান ও আনন্দ উভয় প্রবন্ধ হইতে লাভ হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সভাপতি (শাস্ত্রী মহাশয়) বলিলেন যে, প্রবন্ধ লেখক বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে অগ্রণী, পণ্ডিত ও প্রকৃষ্ট বক্তা। প্রবন্ধের সমালোচনায় বলিতে হয়, ধন্য ধন্য ধন্য। উপসর্গ-বিচার এ দেশে কেন ইয়ুরোপেও নূতন। দুর্গাদাসও ঐ ভাবে করেন নাই। এ প্রণালী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। উপসর্গ এককালে স্বতন্ত্র শব্দ ছিল। বেদে ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। উপসর্গের বৈদিক প্রয়োগ দেখিলে উপসর্গ বেশ বুঝা যায়। চাটুয্যে প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতে উৎপন্ন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের ১৫৬ বংশধরের নাম, গ্রামের নাম হইতে উৎপন্ন। ইহাদিগের

১৩০৪।

...যুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন—(ক) মাতৃপদাঞ্জলি, (খ) পঞ্চামৃতম্, (...) চাণক্য-শ্লোক ২ খানি, (ঙ—ছ) ভট্টিকাব্যম্ ১ম ২য় ৩য় ভাগ, (জ ও ঝ) রঘুবংশম্ ১ম ও ২য় ভাগ, (ঞ) রঘুবংশ Vol. V, (ট) হিমালয় দর্শন, (ঠ) শিক্ষাসার (ড—ণ) শিক্ষা ১ম ২য় ৩য় ভাগ, (ত) তারামা, (থ) শান্তিস্তব, (দ) প্রবন্ধসার, (ধ) হিতোপদেশ, (ন) হর্ষচরিত ৫ম অধ্যায়, (প) রঘুবংশ অর্থ পুস্তক, (ফ) দশকুমার চরিত অর্থ পুস্তক।

৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—তিতুমীর-ইতিহাস।

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত বঙ্গের শেষ বীর।

ঐতিহাসিক সমিতির প্রথম অধিবেশন।—১৩০৪ সালে ১৩ই ভাদ্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকা। ৬৬/২ নং বীডন্ ষ্ট্রীটে কেশন একাডেমিতে বর্ত্তমান বর্ষের ঐতিহাসিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ঐতিহাসিক সমিতির সম্পাদক)

হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়, শারীরিক অসুস্থতা হেতু ও পরিজনের পীড়ার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমেই সম্পাদক মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস-লেখকগণের লিখিত মুসলমান বাদশাদিগের নামের বর্ণ যোজনার (বানানের) অনৈক্য সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সংশোধিত তালিকাটী, সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। কুমুদকুমার বাবু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রস্তুতীকৃত, তালিকার সর্ব্বাংশের বিশুদ্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায়, আপাততঃ এই ধার্য্য হইল যে, একটী নূতন